ডাইনীরা কি আজও আছে!

সুভাষ সমাজদার

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৫ : ডিসেম্বর ১৯৫৮

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : শ্রীমতী শক্তি রায় : নিউ শক্তি প্রেস

১/এ, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীমান বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু—

নিবেদন

ডাইনী!

ডাইনী—এই কথাটার ভেতরে যুগযুগান্তরের ভয় আর রহস্য পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ডাইনীবিদ্যা পৃথিবীর প্রাচীনতম বিদ্যা। উইচক্র্যাফট অর্থাৎ ক্র্যাফট অফ দি ওয়াইজ। শোনা যায় খৃষ্টের জন্মেরও তিন হাজার বছর আগে ব্রেজিলের আলমারা গুহার গায়ে আঁকা এক শিংওয়ালা বিচিত্র জন্তুর মূর্তির ভেতরে নৃতত্ত্ববিদরা এই যাদুবিদ্যার আভাস পেয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের মহাকবি হোমারের মহাকাব্যের নায়িকা মিডিয়া, যাদুকরী।

রোমের কবি হোরাস তার এক কাব্যে ডাইনীর ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন—পূর্ণিমার রাত্রে দূরের কোন পাহাড়ের নির্জন উপত্যকায়, কি পরিত্যক্ত বাড়িতে কি নিবিড় জঙ্গলে ডাইনীরা একসঙ্গে মিলিত হয়। তাদের প্রত্যেকের এলো করা চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকে। হাতে থাকে মানুষের হাড়, গাছের শিকড় আর গুটিকয়েক কালো কুচকুচে ভেড়া। একটা ভেড়াকে হত্যা করে তার তাজা টকটকে রক্ত মাখিয়ে নেয় হাড়ে! তারপর দূরের কবর ভূমিতে যায়। মাটির ভেতর থেকে শবদেহ টেনে তুলে তার ওপর বসে সম্মিলিত গলায় মন্ত্র আওড়ায়। আর ঘন অন্ধকারে সঞ্চারমান ছায়ামূর্তির মত প্রেত-লোকের অশরীরীদের আহ্বান করে—সঙ্গে সঙ্গে দূরদিগন্ত কাঁপিয়ে মেঘ ডেকে ওঠে। ঝড় আসে। সেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ বনদেহে প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে। মনে হয় সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যাবে। আর সেই ডাইনীরা শবদেহকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে নাচতে থাকে। এই ভয়াবহ বিবরণ দিয়ে রোমান কবি হোরাস স্পষ্টই বলেছেন, "দি উইমেন হু সেলস দেয়ার সোল টু দি ইভল স্পীরিট আর উইচেস"…শুধু হোরাস নয়, হোমার নয়, পৃথিবীর দেশদেশান্তরের বুদ্ধিজীবি এবং মনীষীরা বলেন, ডাইনীর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। "দি ইভিল অ্যাঞ্জেলস হ্যাড সোন দী সীডস অফ হ্যাট স্ট্রেঞ্জ আর্ট অ্যামং মেন অ্যাণ্ড ইন্ট্রোডিউসড এভরি কাইণ্ড অফ সরসারি অ্যাণ্ড ম্যাজিক অ্যামং দেম"…অর্থাৎ দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বর যাদুবিদ্যা বা ভোজবাজী শিখিয়ে দেয় পৃথিবীর নরনারীকে। ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতা পেয়ে তারা সাধারণ মানুষের ভীষণ সর্বনাশ করে।

ডাইনী বলে কিছু নেই, বলা যায় না। ডাইনীর সৃষ্টি আমাদের মনের কালো অন্ধকারে। অতএব তাকে আবিষ্কার করতে হয় না—তার অস্তিত্ব আছে আমাদের মনে। এখানে Sorccy এবং Witchcrft-এর পার্থক্যটা বলা দরকার—যখন শয়তানকে আহ্বান করা হয় অনিষ্টসাধনের জন্য তখন তাকে বলা হয় সরসারি আর যখন অশুভ শক্তিকে হিংসা চরিতার্থ করার জন্য পূজা করা হয় তখন উইচক্র্যাফট। এই দুটোরই নিপুণ মিশ্রণ হলো নেক্রোম্যাসি (Necromarcy)। নেক্রোম্যাসিতে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করে তাকে দিয়ে ভবিষ্যৎ বলানো হয়। কিন্তু ডাইনীরা বিশ্বাস করে, মৃতদেহ এমন একটা উপাদান শয়তান যাকে জাগিয়ে নানা অশুভ ক্রিয়াকলাপ করতে পারে। তাই এক হিসেবে নেক্রোম্যাসিও উইচক্র্যাফটের পর্যায়ে পড়ে।

আবার নেক্রোম্যাসির আরও একটি ব্যাপক অর্থও আছে—একে ব্ল্যাকম্যাজিকও বলে। তার ভেতরে বহু পাপ, শয়তানী, নানা অভিশাপ এবং নানারকমের অমঙ্গলের বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায় থাকে। আমরা যদি এই ব্যাপক অর্থ ধরি, তাহলে নেক্রোম্যাসির অস্তিত্ব আছে পৃথিবীর সব দেশে সব কালো শয়তান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মুখোস পরে আসে।

উইচক্র্যাফট নিয়ে অনেক কিংবদন্তীর প্রচলন আছে—উইলিয়ম সীব্রুকের উইচক্র্যাফট বইতে আছে, ১৯৪০ সালে ডাইনীরা নরকের বিদেহী আত্মাদের আহ্বান করেছিল হিটলারের নাজী সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করার জন্য। ডাইনীদের জন্য স্প্যানিশ আর্মাডারও ক্ষতি হয়েছিল।

আরও একটি থিয়েটারের পত্রিকায় দেখা যায়—ডাইনীরা নাজী অভিযান বানচাল করছে—তাই নিয়ে সঙ্গীত রচিত হয়েছে।

সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে এসেও বলতে হয়—আজও ডাইনীদের অস্তিত্ব আছে—তবে তার বৈচিত্র বেড়েছে, রকমফের হয়েছে। অতীতের লম্বা খোলাচুল নিয়ে যে ডাইনী মেয়ে নৈশসমাবেশে যাওয়ার আগে 'বেলে ডোনা' অ্যাকোনাইট ড্রাগ খেয়ে তারা স্বপ্নের আবেশে বিভোর হয়ে যায়। মনে করে তারা উড়ে চলেছে স্যাবাথে (নৈশসমাবেশ)। আজকের লম্বাচুলওয়ালা হিপিও উত্তেজক ওষুধ খেয়ে মনে করে সে উপরে উড়ে চলেছে।

'স্যাবাথ' বা নৈশসমাবেশ আজও আছে। সেকালের স্যাবাথে ছিল ধর্মীয় প্রেরণা, ঐকান্তিকভাবে অশুভশক্তিকে আহ্বান, আর এখনকার স্যাবাথ—খানা-পিনা-হল্লা পরস্পরের প্রতি প্রেমনিবেদন, অবাধ যৌনলীলা এবং বেলাল্লা ফূর্তি!

সেকালের ডাইনীরা বিশেষ ভাষায় কথা বলতো তাদের প্রাইভেট ইডিয়াম ছিল তেমনি এযুগের হিপিরাও এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে—সেই ভাষাকে বলা হয়—'হিপিজারগণ'। প্রাচীন যুগের ডাইনীরা যেমন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী তেমনি বিদ্রোহী হিপিরাও আধুনিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাই—

বলা যায় ডাইনীদের বীভৎস কার্যকলাপ দেশে দেশে, কালে কালে নদীর অফুরান স্রোতের মতই প্রবহমান। আধুনিক যুগে তার কিছু বৈচিত্র বেড়েছে। কিন্তু মূলে আছে সেই অশুভশক্তির আরাধনা—সেই বিচিত্র অমানবিক কার্যক্রম, সেই উচ্ছৃঙ্খল, বেলাল্লা জীবনধারা।

এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে আফ্রিকা, ইউরোপ এবং ভারতের ডাইনীদের বীভৎস ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিচিত্র বৃত্তান্ত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আফ্রিকার ডাইনী রাশিনহামা কি পুনের সঙ্গে কোন পার্থক্যই নেই ইউরোপের বার্থার কি এলিজাবেথের। আবার প্যারিসের ব্ল্যাকমাসের (অশুভ শক্তির) পূজারী চতুর্দশ লুইয়ের ঘনিষ্ঠসান্নিধ্যের উঁচুতলার মানুষদের কুৎসিত ও অশ্লীল ক্রিয়াপ্রকরণের সঙ্গে এতটুকু ভিন্নতা নেই ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ডের ছাত্রদের শয়তানের পূজায়। তেমনি সাঁওতাল পরগণার ঝাক্সী কি জংগুরুর সঙ্গে কোন পার্থক্যই নেই বালুরঘাটের ভদ্র গৃহস্থঘরের বধূ মুনি ওরফে মণিদীপা চ্যাটার্জীর। ডাইনীদের বিশেষ দেশকালের ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। পৃথিবীর সবদেশে সবকালে ডাইনীদের বিচিত্র ক্রিয়াপ্রকরণের লীলা চলে আসছে ডাইনীরা যুগে যুগে আছে এবং থাকবে।

এই দুর্মূল্যের বাজারে এই বিপুল কলেবর গ্রন্থখানি প্রকাশের যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন অনুজপ্রতিম প্রবীর মিত্র তা তার সৎসাহিত্যের প্রতি প্রীতির পরিচায়ক। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না। এই বই পড়ে ডাইনীদের ধূসর রহস্যময় জগত সম্বন্ধে যদি কারো উৎসুক্য জাগে তাহলে বিপুল শ্রম সার্থক মনে করবো।

—সুভাষ সমাজদার।

এক

বিষাক্ত সাপের চামড়া আর কুমীরের হৃদপিণ্ডের চূর্ণ মেশানো ডাইনীদের সেই ওষুধ আর বীভৎস সাধনভজনের অর্থ কি ?

রাত গভীর হলেই ওরা আসবে।

টক—টক—টক—দরজায় ঠিক গুনে গুনে তিনটি টোকা দেবে। আমি পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসব। আসতে হবে। কোন উপায় নেই। কিন্তু—

শুধু গেলে-ই হবে না। যেতে হবে ওদের মত করে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। দেহের কোথাও এতটুকু আচ্ছাদনের চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। প্রথম দিন তো লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। আর কেন-ই বা হবে না লজ্জা ?

ওদের দু'জনেরই যৌবন বেলাশেষের সূর্যের মত যাই যাই করছে। কিন্তু আমি—আমি যে সেই স্বপ্ন-দেখা, ঘোর লাগা বয়সের এক মেয়ে। আমার দেহের যৌবন-চিহ্নগুলো এমন উদ্ধত আর দুর্বার যে আমারই কেমন গা শিরশির করে। কিন্তু—

যতই করুক, যত লজ্জাই হোক, যেতে হবে একেবারে নিরাবরণ হয়ে। তা না হলে নাকি যে উদ্দেশে নিশিরাতের কালো অন্ধকারের স্রোত দু'হাতে ঠেলে ঝোপঝাড় জঙ্গল ভেঙে যাওয়া—তা ব্যর্থ হয়ে যাবে !

আমরা তিনজন।

তিন সখী।

তিনটি প্রেতিনীর মত অন্ধকার রাস্তায় নামব। সোজা পথে হুটহাট করে গেলেই তো হবে না। গাছগাছালির নিচে নিকষ কালো অন্ধকারের আড়ালে নিজেকে মিশিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে চলতে হবে।

ঢং—ঢং—ঢং—দূরে। রাত্রে বাড়ি থেকে বাইরে বেরতে নিষেধ করে পুলিশ ফাঁড়ির কারফিউ-এর ঘণ্টার ধাতব শব্দটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যাবে দূর দিগন্তে। শাঁ শাঁ করে বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়বে গাছের পাতায় পাতায়। হঠাৎ—

কাঁ—কহ—কাঁ—রাতদুপুরের সেই ভুতুড়ে স্তব্ধতাকে শিউরে একটা রাতচর পাখি ককিয়ে ডেকে উঠবে। এসব কোনদিকে আমরা ভ্রূক্ষেপই করব না!

ওরা আমাকে নিয়ে যাবে—নিয়ে যাবে কত নাম-নাজানা গ্রাম, কত মাঠ, কত জলাভূমি পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে। আমার শুধু মনে হবে, আমি নিশি-পাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে চলেছি।

রাত যখন শেষ হয়ে আসবে, পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়বে চাঁদ তখন ওরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আমাদের গ্রামে। নিয়ে যাবে আমাকে গাছ দিয়ে ঘেরা পুকুরটার পাড়ে। ঘন কুয়াশা ভারি একটা চাদরের মত ছড়িয়ে থাকবে সেই জলাশয়ে। আর শেষ রাতের হিমেল বাতাসে দুলে দুলে উঠবে সেই পুকুরের মরা শকুনের চোখের মত ঘোলা জল।

দলা দলা কালো অন্ধকারের স্তূপ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো দেখে আর হু হু বাতাসে তাদের পাতায় পাতায় সর্বনাশের করতালের মত একটানা ঝমর ঝমর শব্দ শুনে আমার মনে হবে—এই কালরাত্রে এই দুনিয়ার যত অপদেবতা আর দৈত্যদানব সব যেন এখানে গুটি গুটি জড়ো হয়েছে। এই ঘন জঙ্গলে ভরা জলার ধারে শুরু হয়েছে তাদের আতঙ্ক, ভয় আর সন্ত্রাসের রাজত্ব! আমার শরীরের ভেতরটা শিরশির করে উঠবে!

কোন ভয় নেই—চল আমাদের সঙ্গে, ওরা বলবে। আর সেই পচা জল ভরা পুকুর ছাড়িয়ে ওরা আমাকে নিয়ে যাবে ঝোপঝাড় জঙ্গল পেরিয়ে টিলার মত ছোট পাহাড়টার নিচে। সেখানে তিন দিকে তিনটি বুড়ো বুড়ো ঝাপড়া গাছ। প্রতিটি গাছের নিচে বুনো ঝোপঝাড় আর কালো অন্ধকার জায়গাটাকে ভয়াল করে তুলেছে।

আমরা তিনজন তিনটি গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসব।

এইবার চোখ দুটো বুজে থাক। যতক্ষণ আমরা না বলব খুলবি না কিন্তু—কেমন? তাদের ভেতরে একজন বলবে।

আমি সেই বিষকাঁটারীর জঙ্গলের ভেতরে বসে থাকব চোখ দুটো বুজে। কানের কাছে বেজে যাবে একটানা ঝিঁঝিঁর বাজনা। শুনতে পাব—কাছে, দূরে জঙ্গলের ভেতরে বিষধর সাপের সড়-সড়ানি! আমার হঠাৎ মনে হবে, আমি যেন এক ডাইনী কি পিশাচী—এই শেষ রাতের ছায়া ছায়া অন্ধকারে এই জঙ্গলে বসে আছি—বসে আছি ধূর্ত দুরভিসন্ধির মূর্তির মত।

নে—এইবার চোখ খোল—ওদের ভেতরে যে বয়সে বড়, চোখে-মুখে অনেক ঝড়ঝাপটার ছাপ, সে বলবে।

আমি চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন গোঙানির মত শব্দ করে সে মন্ত্র পড়তে শুরু করবে। আমার বুকের রক্তে ভয়ের শিরশিরানি, হাত-পা কেমন অবশ হয়ে আসবে। তবুও—

তবুও আমি কিছুই বলতে পারব না। উপায় নেই। কোন প্রতিবাদই করতে পারব না। তাই যখন—

সেই বুড়ি একটা সাদা মলম আমার সারা মুখে, নাকের দু'পাশে বেশ রগড়ে রগড়ে লাগিয়ে দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখখানা জ্বলতে থাকবে, ঝিম ঝিম করবে মাথার ভেতরটা আর পেটের ভেতর থেকে পাক দিয়ে ঠেলে উঠে আসতে চাইবে বমি—তখনও কিছু বলতে পারব না।

এইবার—তুইও আমাদের মত ডাইনী হয়ে গেলি! হি—হি—হি—কেমন কুকুরের কান্নার মত শব্দ করে হাসতে থাকবে সেই কদাকার বুড়ি ডাইনী।

চল এইবার আমাদের দেবতাকে প্রণাম করে আসবি, ওরা বলবে।

ওরা আমাকে নিয়ে আসবে সেই পাহাড়ের একটা অন্ধকার গুহায়। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা অন্ধকারে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে কাকে যেন আকুল হয়ে খুঁজতে থাকবে। এদেরই আর কোন অনুচর ঘন জঙ্গলের গাঢ় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে নাকি কে জানে?

কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে ওরা হেঁকে ডাকবে—মা—জি—কা—আ—

রোব্যা—ই—য়ি—ই—

জ্যা—ক—অ—অ—

সেই নির্জন বনভূমি পেরিয়ে দূরের অন্ধকার পাহাড়টার গায়ে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসবে ওদের চিৎকার। কিন্তু ওই ঘুটঘুটি অন্ধকার গুহার ভেতর থেকে কিংবা আশেপাশের ঝোপঝাড় জঙ্গল ভেঙে কেউই বেরিয়ে আসবে না।

ওরা তখন হাঁটু গেড়ে মাটিতে প্রার্থনা করবে—কে জানে কার কাছে। তারপর তিনটি ভুট্টার পিঠে সেখানে রাখবে।

'শোন—আমাদের ডাইনীদের দেবতাদের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হল', বুড়ি ডাইনী আমার মাথায় আলগোছে হাত রেখে বলবে, তোর নামেও সঙ্কল্প করা হয়েছে—

এইবার তুই আমাদের মত পাকাপোক্তভাবে নিশাচর ডাইনী হয়ে গেলি। আর একজন বলবে, প্রত্যেকদিনই রাত্রে যে-ই কারফিউয়ের ঘণ্টা বেজে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসবি এই এঁদো পুকুরের পাড়

দিয়ে পাহাড়ের নিচে এই তিনটি ঝাপড়া গাছের কাছে জমাট অন্ধকারে—এটা আমাদের সাধনভজনের গোপন জায়গা, বুঝলি তো ?

দেখিস—আজ বেরিয়ে আসার সময় যা কাণ্ড করেছিস তা আবার করিস না কিন্তু—ফোকলা দাঁত মেলে বুড়ি খিক খিক করে হাসবে।

'শোন, তাহলে কিন্তু তোর কষ্টই সার হবে, সিদ্ধি পাবি না', আর একজনও আমাকে সতর্ক করে দেবে—একটা কথা মনে রাখিস, তুই আর পাঁচ দশটা মেয়ের চেয়ে আলাদা।

সোজা কথা তো নয়, শনের দড়ির মত চুলগুলো দুলিয়ে দুলিয়ে বুড়ি আবার বলবে, 'তুই যেকোন লোককে তুক করতে পারবি—চাই কি খুনও করতে পারবি তুই—

ডাইনী ! মনে হয় যেন এই কথাগুলোই আভাসে আকারে ইঙ্গিতে কখনো ভাঙা ভাঙা বানটুতে (মধ্য আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের দেশীয় ভাষা), কখনো বা ইংরাজিতে পুলিশকে বলেছিল নেটসেয়ি।

নেটসেয়ি বাইশ তেইশ বছরের যুবতী। তার দীঘল দেহে অটুট স্বাস্থ্য আর যৌবন, বড় বড় উজ্জ্বল দুটো চোখ। উইচক্র্যাফট সাপ্রেশান অ্যাকটের সাত ধারা অনুযায়ী ডাইনী সন্দেহে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

শুধু নেটসেয়ি নয়, আসামী হয়েছে আরও দুজন—

ম্যাজউইটা আর পুনে। এরা তিনজনেই একই গ্রাম কারাঙ্গার বাসিন্দা। পাশাপাশি বাড়ি। মাজউইটার বিয়ে হয়েছে বহুদিন। স্বামী মুকুজোহোর আছে আরও তিন তিনটি বৌ।

পুনে বিধবা। নেটসেয়ির বিয়ে হয়েছে হালে। কিন্তু হঠাৎ এদের ডাইনী সন্দেহে গ্রেপ্তার করল কেন ?

কারাঙ্গার সাবেককালের লোকরা কেউ কেউ ভাসা ভাসা জানত। পুনে তুকতাকের মন্ত্রতন্ত্র জানে। ডাইনীবিদ্যার ক্রিয়াকলাপের খোঁজটোজ রাখে। কিন্তু ম্যাজউইটা আর নেটসেয়িও যে ডাইনী—এমন কথা কেউ কল্পনাও করেনি।

পুনের সঙ্গে আর দুই আসামীর খুবই ভাব ভালবাসা ছিল। নিশিরাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা করেছিল—সেসব বৃত্তান্ত কোনদিনই কেউ জানতে পারত না যদি—

হঠাৎ ম্যাজউইটার স্বামী মুকুজোহো মারা না যেত।

মুকুজোহোর বয়স হয়েছিল। হাড় জিরজিরে দেহটায় নানা রোগ একেবারে জেঁকে বসেছিল। ফুলো ফুলো হাত পা, পেটটাও ফুলে ঢোল হয়ে বেরিয়ে আসছে। গর্তে ঢোকা চোখদুটো সাপের জিভের মত কেমন চিকচিক করে।

ম্যাজউইটা এবং আরও তিন বৌ পালা করে স্বামীর সেবা করে। কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হয় না।

একদিন বুড়ো জেদ ধরে বসল। পাশের গ্রামে তার ছেলে জিম ওরফে সাঙ্গুরায়ির বাড়ি যাবে। বৌরাও আপত্তি করল না। বরং পাঁজাকোল করে বুড়োকে দিয়ে এল।

নিশ্চয়ই গ্রাম্যবধূদের প্রেরণা দিয়েছিল রোডেশিয়ার গ্রামাঞ্চলের যুগযুগান্তরের সেই অন্ধ বিশ্বাস—রোগাক্রান্ত কোন লোক যদি তার গ্রাম ছেড়ে কোন গ্রামান্তরে যায়, তাহলেই সে সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু—

হিতে বিপরীত হল। আরও অসুস্থ হয়ে ফিরে এল। এমন বাড়াবাড়ি হল যে বুড়ো আর উঠতেই পারে না বিছানা থেকে। ঠিক তখুনি তার মনে হল—কোন ডাইনী তাকে কোন তুক করেছে। জিমের মনেও ধরল কথাটা। সে পঞ্চায়েতে নালিশ করল। কিন্তু ঠিক যেদিন সন্ধ্যায় মজলিশ বসবে—সেইদিনই দুপুরে মুকুজোহো মারা গেল।

মাজউইটা গ্রামের পঞ্চায়েতের মজলিশে এবং তদন্তকারী দেশীয় সারজেণ্ট উইলির কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছিল তা এইরকম :

পুনে ডাইনী। মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক জানে। জানে ওষুধবিষুধ। তাই আমি স্বামীর অসুখ বাড়াবাড়ির দিকেই যাচ্ছে দেখে ছুটে গিয়েছিলাম পুনের কাছে। পুনে বলল, তোর কোন চিন্তা নেই। আমি ওষুধ তৈরি করে দেব—সেটা খেলেই তোর স্বামী ভাল হয়ে যাবে—

আমি, পুনে আর নেটসেয়ি পর পর কয়েক রাত্রি বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা গাছের শিকড় জোগাড় করেছিলাম। সেই শিকড় আর পুনে এবং নেটসেয়ি দুজনে দুটো ওষুধ দিয়েছিল। এই তিনটি জিনিস মদের সঙ্গে মিশিয়ে স্বামীকে খাইয়ে দিয়েছিলাম। তার কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই সে মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরে পাক দিয়ে উঠল কান্না—হায় হায়, এ আমি কী করেছি—নিশ্চয়ই ওদের ওষুধে বিষ ছিল!

তুমি কি জানতে তারা কী ওষুধ কিংবা কোন গাছের শিকড় দিয়েছিল? উইলি প্রশ্ন করল।

'না হুজুর—সেসব জানে ওই দুই শয়তান মাগী ম্যাজউইটার দু'চোখে বিষ ঝরতে লাগল।

এবার ইউরোপীয় ইনভেসটিগেটিং সার্জেন্ট উইলি এবং ইন্সপেক্টার ফারাও পরামর্শ করে ঠিক করল, নেটসেয়ির বয়স কম। আর ডাইনীবিদ্যায় তার নতুন হাতেখড়ি। অতএব আবার ওকেই জেরা করা দরকার। তাহলে সব রহস্যই জানা যাবে।

উইলি : তুমি আগে বলো, পর পর কদিন রাত্রে তুমি বাইরে গিয়েছিলে?

নেটসেয়ি : ছ'দিন, হুজুর।

উইলি : প্রথম দিন ওদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় কী এক কাণ্ড করেছিলে বলেছিলে—

এইবার কেন যেন চুপ করে গেল নেটসেয়ি। তার মুখে লজ্জার ছায়া ফুটে উঠল। মাথা নিচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল।

এই তিন ডাইনীর চাঞ্চল্যকর মামলা বিকিতার ছোট আদালত থেকে গড়িয়ে চলে গিয়েছিল একেবারে ফোরট ভিক্টোরিয়ার হাইকোরটে।

২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯। এই মামলার প্রথম শুনানী হয়েছিল। তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী এবং গ্রামপঞ্চায়েতের কাছে নেটসেয়ি যত গোপন করতে চেষ্টা করুক না কেন—সে কিন্তু হাইকোরটে নিজেকে অবারিত করে দিয়েছিল। আর দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল মুকুজোহোর মৃত্যু রহস্য।

এই ঘটনার বীভৎস ও সর্বনাশা বিবরণ শুনে শিউরে উঠেছিল হাইকোরটের বিচারপতি, ব্যারিসটার আর উপস্থিত দর্শকরা। প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন : মানুষের সভ্যতা যখন এত এগিয়ে গিয়েছে; বিংশ শতাব্দীর এই ষাটের দশকে একটা অন্ধসংস্কারকে ভিত্তি করে এতবড় নৃশংস ও জঘন্য অপরাধ কখনো কল্পনাই করা যায় না।

নেটসেয়ি থেমে থেমে সসঙ্কোচে, কখনো বা প্রচণ্ড আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিল তা সংক্ষেপে বলা হল :

অনেকদিন আগে পুনের কাছে ডাইনীবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিল তরুণী মেয়ে নেটসেয়ি। পুনে খুশি হয়েছিল। বলেছিল, সময় হলেই তাকে ডেকে নিয়ে যাবে!

২৮ ডিসেমবর, ১৯৫৮। গভীর রাত্রে পুনে আর ম্যাজউইটা প্রথম এসেছিল তার বাড়ি। স্বামীর অঙ্কশায়িনী হয়ে ঘুমিয়েছিল। তাই পুরোপুরি বিবসনা হয়েই থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু সখীরা যখন এল সে লজ্জা ঢাকবার জন্য বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে এসেছিল। সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছিল, রাতের অন্ধকারে দুই পিশাচীর ঘন কালো ছায়ামূর্তি। সম্পূর্ণ উলঙ্গ বলেই আরও কুৎসিত ও বীভৎস মনে হয়েছিল। পুনে বুঝিয়ে বলেছিল, দেহের কোথাও বস্ত্রের আচ্ছাদন থাকলে তাদের (ডাইনীদের) দেবতা প্রসন্ন হবেন না। কখনো ডাইনীবিদ্যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে না।

নিশিরাতে বুনো জঙ্গলে আচ্ছন্ন পথে আদিম মানবীর মত যেতে হয়েছিল। সেই পাহাড়ের নিচে তিনটি বুড়ো বুড়ো ঝাপড়া গাছের জমাট অন্ধকারে দাঁড়াতেই পুনে তার চোখেমুখে মলমের মত কী একটা ওষুধের প্রলেপ দিয়ে বলেছিল—এটা হল ডাইনীদের নিশীথ অভিযানে ভয়-ভীতির প্রতিষেধক। এই ওষুধ মাখানো থাকলে কখনো-ই ভয় তার ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না—

সেই তিনটি ঝাপড়া গাছের মাঝখানে তিন কোণে তিনটি মশাল জ্বালল বৃদ্ধা ডাইনী পুনে। বাতাসে মশালের আলোর ছায়া কাঁপতে লাগল। সেই আলোয় পরিস্ফুট হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য—

পরিষ্কার তকতকে করে নিকানো মাটিতে তিনটি কাঁটা দিয়ে আটকানো চৌকোণা ব্যাঘ্রচর্ম। ঠিক তার সামনে একটি কালো বিড়ালের মুণ্ডু। কালো কুচকুচে মরা একটা বাদুড। আর তার ডানদিকে সযত্নে সাজানো রয়েছে একটি করোটি কঙ্কাল। বৃদ্ধা ডাইনী সেখানে বসে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর নেটসেয়িকে নিয়ে পুনে এল সেই পাহাড়ের গুহায়। কিন্তু কেন যেন ম্যাজউইটাকে ডাকল না। সে গাছের নিচেই বসে রইল। পুনে নেটসেয়িকে দিল কী একটা গাছের শিকড়। আর দিল দুই রকমের পাউডারের মত সাদা সাদা গুঁড়ো। বলল, শোন, এই গুঁড়োর একটা হচ্ছে বিষাক্ত সাপের চামড়া আর একটা কুমীরের হৃদপিণ্ডের চূর্ণ। তার ঘোলাটে দুটো চোখে জ্বলজ্বল করছিল জিঘাংসা।

ম্যাজউইটার কানে কানে বলেছিল, এই শিকড়টা বেটে তার সঙ্গে এই দুটো পাউডার মিশিয়ে খাইয়ে দিতে হবে ম্যাজউইটার স্বামী মুকুজোহোকে। একটু থেমে আবার বলেছিল, শিকড় বাটা খাওয়ানো তো কঠিন—তাই মদের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। তাহলে ভাল হয়ে যাবে ?

ম্যাজউইটার কাছে এসে পুনে ফোকলা দাঁত বের করে হেসে বলেছিল—চল—ওষুধ পেয়ে গিয়েছি—

খাইয়ে দিলেই সুস্থ হয়ে যাবে ?

হবে রে হবে—কেমন অস্পষ্ট শোনাল পুনের কথাগুলো।

ম্যাজউইটাকে নিয়ে পুনে আর নেটসেয়ি এল মুকুজোহোর বাড়ি।

মাটির মেঝেতে খড়ের বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে মুকুজোহো। ম্যাজউইটা একটা কৌটোর ঢাকনার ওপরে নিল মদ। পুনে সেই ছুটো ওষুধ মিশিয়ে দিল।

ডানদিকে কাত হয়ে শুয়েছিল মুকুজোহো। পুনে আর নেটসেয়ি তাঁকে ঘুরিয়ে চিত করে শুইয়ে দিল। আর ম্যাজউইটা তার মুখে ঢেলে দিল সেই ওষুধ !

পরদিন মুকোজোহো মারা গেল।

ফোর্ট ভিক্টোরিয়ার হাইকোরট থেকে বেরিয়ে গেল চাঞ্চল্যকর সেই ডাইনী মামলার রায়—ম্যাজউইটা, পুনে আর নেটসেয়ি তিনজনেরই বেকসুর মুক্তি !

কী ব্যাপার—কেমন করে হল ? তীব্র বিস্ময়ে ছটফট করে উঠল দেশবাসী। তাহলে কি তারা মুকুজোহোকে বিষ খাওয়ায়নি ? আর নেটসেয়ির সেই দীর্ঘ জবানবন্দী—একটা মিথ্যা অবাস্তব রোমাঞ্চকর গল্প ?

পোস্টমর্টমে মুকুজোহোর দেহে বিষপ্রয়োগের কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না। আরও আশ্চর্য, ইনভেসটিগেটিং সারজেনট উইলি এবং ইন্সপেকটার ফারাও তিন আসামীকে নিয়ে পাহাড়ের সেই গুহায় গিয়েছিল। সেখানে সাপের চামড়া কি কুমীরের হৃদপিণ্ডের চূর্ণজাতীয় কিছু পাওয়া যায় নি।

আর পুনে যে গাছের শিকড় সংগ্রহ করেছিল—উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে তার নাম টারম্মাস ল্যাবিয়ালিস—নেহাতই একটি বুনো গাছ। মোটেই বিষাক্ত নয় ! আর সেই গুঁড়ো দুটো ভুট্টার ছাতুর সঙ্গে মেশানো একটি গাছের মূল—'টিউবারাস রুটডোলিচেসা' ! কেমিক্যাল এগজামিনেশন রিপোরটেও জানা গেল—অল আর হারমলেস অর্থাৎ কোন গাছগাছড়াই ক্ষতিকারক নয়। মুকুজোহোর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল—!

তাহলে বৃদ্ধা ডাইনী পুনের সেই নিশীথ অভিযান, মশাল জ্বালিয়ে সেই কালো বিড়ালের মাথা আর করোটি কঙ্কাল নিয়ে সেই বীভৎস সাধনভজন—সবই কি কুট-কুটিল রহস্যময় রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা ? এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে এবং ডাইনীবিদ্যার ভেতরে কতটুকু সত্য আর কতটুকুই বা অলৌকিক, এই তথ্যটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে উত্তর ভিক্টোরিয়ার আর একটি ডাইনীর চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানীতে।

দুই

শবদেহের মাংস আর বুনোগাছের শিকড় দিয়ে কি ওষুধ দিয়েছিল ডাইনী টটসাভানি

২ আগস্ট, ১৯৬০ সাল।

উত্তর ভিক্টোরিয়া থানায় এল এক যুবতী ডিঙ্গেলা। কালো পাথরের ভেনাস। কোন নিপুণ শিল্পী যেন এক খণ্ড কালো পাথর কুঁদে কুঁদে তৈরি করেছে আশ্চর্য সুন্দর এই রমণীমূর্তি।

তার কালো কুচকুচে দুটো হাতে হাতকড়া। বড় বড় চোখ দুটোর রং জবাফুলের মত লাল। এক মাথা কালো ঝাঁকড়া চুল ছোট ছোট কেউটের মত দুলছে পিঠের ওপরে!

থানার সেপাই সান্ত্রীরা তার আশপাশে অকারণে ঘুর ঘুর করছে। হোক খুনের মামলার আসামী। যুবতী তো! তার অটুট স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য আর উদগ্র যৌবনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাদের চোখে দগদগে ঘায়ের মত লোভের আভা জ্বলতে লাগল।

'এই, হাঁ করে কী দেখছিস রে হারামজাদারা?' যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে তেমনি করে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ডিঙ্গেলা। সেপাইরা হকচকিয়ে গেল।

কিন্তু এক বুড়ো বহুদর্শী সান্ত্রীর মর্যাদায় আঘাত লাগে। সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ধমকে বলে, 'এই মাগী, চুপ কর—ফের চিল্লাবি তো একেবারে গারদে ভরে দেব—'

কোন কথা বলে না ডিঙ্গেলা।

কনসটেবলের ধমকানিতে ভ্রূক্ষেপও করে না। অস্ফুট স্বরে আপনমনেই বলে, আমি তো কবুল করেছি—আমি—আমিই টটসাভানির মরদকে খুন করেছি—

আর একটা কথাও বলল না ডিঙ্গেলা। শান্ত মেয়ের মত মাথা নিচু করে বসে রইল। কিন্তু তার কাঁধের ঝোলার ভেতর থেকে তার পোষা বিড়াল হঠাৎ ডেকে উঠল—মিউ—মি—ই—উ—

'এই, তোর বিড়াল ঝুলিতে বন্ধ করে রাখ'—চিৎকার করে উঠল প্রহরীরা—শিগগির বন্ধ কর—তুই—ডাইনী।

হো—হো—হো—হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ডিঙ্গেলা। টেনে টেনে

বলল, হ্যাঁ—আমি ডাইনী—আমি ডাইনী। বলতে বলতে তার রক্তাভ দুটো চোখে তীব্র আক্রোশের দৃষ্টি ফুটে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বিষাক্ত গলায় বলল, 'আমি যদি ডাইনী হই, তাহলে টটসাভানি, মুহালভা, চিনম্বা কী? সেই বিচার আগে হোক—'

খুনের মামলার আসামী এই তরুণী ডিঙ্গেলার থানায় পুলিশ অফিসারের কাছে এবং আদালতের বিবৃতি তার জবানীতেই বলা হল—

'আমি রেভান্দিকে ভালবাসতাম। আমাদেরই গ্রামে পাশের বাড়ির ছেলে। ছেলেবেলার ভাবভালবাসা। তাই দুজনই দুজনকে না দেখে পারতাম না। রেভান্দির কথাই ভাবতে ভাবতে আমার চোখে ঘুম নেমে আসত! স্বপ্ন দেখতাম। ঘর বর ভালবাসার স্বপ্ন। কিন্তু—

'বিয়েতে বাধা ছিল অনেক। প্রথম বাধা—আমার কাকা। আমার বাবা নেই। কাকাই অভিভাবক। আমাকে নিয়ে কাকা ব্যবসা করার ধান্দা করছিল। সাড়ে চারশো টাকা কন্যাপণ না পেলে বিয়ে দেবে না বলে গোঁ ধরে বসেছিল।

রেভান্দি বেচারী আর কী করবে? এত টাকা কোথায় পাবে? ভিক্টোরিয়া শহর থেকে কিছু দূরে জঙ্গলে কাঠ কেটে বিক্রি করে সে খেয়ে না খেয়ে টাকা জমিয়ে চলেছিল। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যায়। কিছুতেই আর হয়ে ওঠে না প্রয়োজনীয় অঙ্কটা। আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, কোন অশুভ শক্তির প্রভাবেই তার জীবনে এই অভিশাপ ঘনিয়ে এসেছে।

আমি গেলাম টটসাভানির কাছে।

টটসাভানির বিয়ে হয়েছে বছর দশেক। ছেলেপুলে হয় নি। বাঁজা। সে খোলাখুলি বলে, সে মা হতে পারে নি—সে দোষ তার নয়। সব দোষ তার মরদের। সারারাত তাকে শুধু এখানে সেখানে বাচ্চা ছেলের মত খাবলায়। কিন্তু আসল কাজের বেলায় নেতিয়ে পড়ে।—কি—কি করবে সে? একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো—তাই সে মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাকের চর্চা করে—

টটসাভানি ডাইনীবিদ্যা জানে। টোটকা ওষুধ, তুকতাক—সেসব ছিল তার নখদর্পণে। সে আমার সব বৃত্তান্ত শুনে বলল, আজ রাত্রে একলা আমার কাছে আসবি—

'নিশিরাত থমথম করছে। আমি ঘুটঘুটি অন্ধকারে চলেছি একটি প্রেতিনীর মত। সেই অবস্থাতেও আমার মনের ভেতরে ভাসছিল রেভান্দির মুখখানা! যেমন করে হোক ওকে অশুভ প্রভাব থেকে উদ্ধার করতে হবে—

'তুই এসেছিস! খুব খুশি হয়ে বলল টটসাভানি। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলল, আয়, তোকে আগে মন্ত্রপূত করি, বলেই আমার ব্লাউজটা খুলে ডানদিকের স্তনের নিচে সামান্য একটু চিরে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম।

টটসাভানি কিছু বলল না। আমার ক্ষতস্থানে সাদা সাদা গুঁড়ো লাগিয়ে দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করল। হঠাৎ আমার কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'তোকে দীক্ষা না দিলে, তোকে যে ওষুধ দেব—তাতে কোন ফল হবে না রে—'

এইবার টটসাভানি আমাকে নিয়ে চলল আমাদের গ্রামের ছোট নদী পেরিয়ে গোরস্থানের দিকে। আমরা দুজনে দুটো কালো হায়নার পিঠে চড়ে গিয়েছিলাম। হায়না দুটো ঘোড়ার মত টগবগিয়ে ছুটে চলেছিল।

আমরা নদীর ওপারে বুড়ো ঝাপড়া গাছপালা দিয়ে ঘেরা ভয়ঙ্কর নির্জন এক সমাধিভূমিতে পৌঁছে গেলাম। ফিসফিস করে বলল টটসাভানি, ভয় পাবি না কিন্তু—একটু থেমে বলল আবার, এমন ওষুধ দেব, তোর কাকার মন পাল্টে যাবে, নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে রেভান্দির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে—

সত্যি বলছ! আমি আনন্দে টটসাভানিকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

কিন্তু আমি একটু এগিয়ে যেতেই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। দেখলাম—টটসাভানির মত আরও দুইজন ডাইনী একটি শবদেহের মাংস কেটে টুকরো টুকরো করছে। সেই মাংস আর একটি বুনো গাছের শিকড় জল দিয়ে সেদ্ধ করে আমাকে বোতলে ভরে দিল টটসাভানি। বলল, একটু মদের সঙ্গে মিশিয়ে এই ওষুধ খাওয়ালেই দেখবি কোথা থেকে যে কী হবে—সব বাধা কেটে যাবে—

পরদিন দুপুরে সেই ওষুধ খাওয়ানোর আধঘণ্টা পরেই রাভেন্দি মারা গেল। আমি শোকে পাথর হয়ে গেলাম। আমার মনে হল, টটসাভানিই চক্রান্ত করে খুন করেছে রাভেন্দিকে।

'প্রতিহিংসায় জ্বলে যেতে লাগলাম। সেদিন দুপুরে গেলাম টটসাভানির বাড়ি। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলাম। অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার মরদ গারিকাই।

টটসাভানি বাড়িতে ছিল না। এরকম সুযোগ আর পাব না।

কিন্তু গারিকাইয়ের দোষ কী—ওর বৌ আমার সর্বনাশ করেছে। আমার মাথায় খুন চেপে গেল।

ঘরের কোণে একটা লোহার রড দেখতে পেলাম। সেই রড দিয়ে

গারিকাইয়ের মাথায় খুব জোরে আঘাত করলাম। আর্তনাদ করে উঠতেই আরও কয়েক ঘা মেরে একেবারে থেঁতলে দিলাম মাথাটা—তীব্র উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল ডিঙ্গেলা। একটু থেমে বলল, 'আমি বদলা নিয়েছি হুজুর—আমি বদলা নিয়েছি—'

টটসাভানির বাড়ি তল্লাশি করেও পাওয়া গিয়েছিল মড়ার মাথার খুলি, সাপের চামড়া, সেই গাছের শিকড় এবং সাধনভজনের আরও বিবিধ উপকরণ।

আশ্চর্য ! সেই পুনে-নেটসেয়ি-ম্যাজউইটার কেসের মত এই শিকড়ও বিষাক্ত নয়, ক্ষতিকারকও নয়। শুধু শবদেহের মাংস দেওয়ার জন্যই টটসাভানির সাজা হয়েছিল।

'উইচক্র্যাফট অ্যাণ্ড সরসারি ইন রোডেশিয়ার' গ্রন্থটিতে এইসব রোমাঞ্চকর ঘটনা বলে লেখক ক্রফোর্ড জানিয়েছেন—রোডেশিয়া তথা দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র কঙ্গো প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ডাইনীবিদ্যার ওপরে অগাধ বিশ্বাস-ই এই কেসগুলোর মূল কারণ।

আর এই মামলার ইউরোপীয় বিচারক বলেছিলেন—এই স্ত্রীলোকরা তাদের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করেছিল। উইচ বা ডাইনীদের সম্বন্ধে রোডেশিয়া বা সারা দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—বিবাহিত জীবনে সুখী ও পরিতৃপ্ত কোন স্ত্রীলোক কখনো বীভৎস সাধনভজনে পরিকীর্ণ ডাইনীবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় না—গভীর কোন হতাশা তাদের প্রেরণা দেয় নাটকীয় উত্তেজনাকর কিছু করতে।

আগের কেসের পুনে বিধবা এবং অবাঞ্ছিত এক বৃদ্ধা। আর দ্বিতীয় মামলার নায়িকা টটসাভানি বন্ধ্যা। তার স্বামী পুরুষত্বহীন। তাদের অনুগামিনীদের জীবনেও আছে কোন শূন্যতা। তারা ডাইনীবিদ্যার অনুশীলন করে, ডাইনী হয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাকে উন্নত করতে চায়।

তিন

দক্ষিণ রোডেশিয়ার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের আছে এক বিচিত্র বিশ্বাস—নরমাংস ভক্ষণ না করলে ডাইনী হওয়া যায় না।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডাইনী সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার রোমাঞ্চকর বিবরণ পড়তে পড়তে সারা দেহ শিউরে ওঠে। কল্পনা করা যায় না জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত বর্তমান এই শতকে এই পৃথিবীর-ই এক ভূখণ্ডে এত বীভৎস ও নারকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে।

এই ডাইনী হতে গিয়ে আরও কত যে বীভৎস কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়, তা বিশ্বাস-ই করা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ রোডেশিয়া অঞ্চলের কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের আছে এক বিচিত্র বিশ্বাস—প্রকৃত ডাইনী নরমাংস ভক্ষণ করে। 'উইচ ক্র্যাফট অ্যানড সরসারি ইন রোডেশিয়া' গ্রন্থের বিদগ্ধ লেখক জানিয়েছেন: হাইকোরটের নথিপত্রে আছে Cannibalism and use of human flesh অর্থাৎ ডাইনীবিদ্যা সাধনার একটি পর্যায় বা অঙ্গ হিসেবে ডাইনীদের নরমাংস খাওয়ার বহু বিস্ময়কর ঘটনা।

এখানে দেওয়া হল তারই একটি ঘটনার বিবরণ—

ইনফ্যানটিসাইড বা নবজাত শিশুহত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে থানায় আসে এক অবিবাহিত তরুণী—জ্যালেপি!

সত্যি সত্যি হত্যা করেছে কি না তদন্ত করতে পুলিশ গেল তার গ্রামে। খুঁজতে খুঁজতে গোরস্থানের কাছে একটা গাছের নিচে পাওয়া গেল শিশুর লাশ।

আশ্চর্য, তার দেহের নিম্নাংশ শুধু আছে। উধাও হয়ে গিয়েছে উপরের অংশ। আরও তদন্তে জানা গেল, তার দেহের ওপরের অংশ খেয়ে নিয়েছে ডাইনী নামে কুখ্যাত দুই স্ত্রীলোক মিডিঙ্গিলা আর নিউয়া!

সরকারপক্ষের অ্যাটরনি জেনারেল জ্যালেপির তীব্র অস্থিরতা এবং অসংলগ্ন কথাবার্তার জন্য তার জবানবন্দী গ্রহণ করেন নি। নরমাংস ভক্ষণের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল আদালতে মিডিঙ্গিলার বিবৃতিতে।

গোয়া রিজারভ ফরেসটের কাছে ম্যাজিনি গ্রামে মিডিঙ্গিলার বাড়ি। সে ডাইনী। মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক জানে। গতবার চাষের সময় আসামী জ্যালেপি তার কাছে এসে বসেছিল: যে ছেলেটিকে সে ভালবেসেছিল, সেই ছেলে স্ফূর্তি

লুটে তার সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে। তার মায়াশরবত* চাই। মায়াশরবত খাইয়ে তাকে বশ করতে হবে।

শোন—তুই যখন ঋতুমতী হবি—তখনকার রক্ত চাই সেই শরবতে, মিডিঙ্গিলা বলেছিল। আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করে আরও বলেছিল, তোর যদি বাচ্চা পেটে এসে থাকে—তাহলে সেই বাচ্চার রক্ত হলেও চলতে পারে—

গতকাল রাত্রেই তার বাচ্চা হয়েছে, আসামী বলেছিল, তাকে মাটিতে পুঁতে রেখেছে—

সঙ্গে সঙ্গে মিডিঙ্গিলা আর তার ছোট বোন নিউয়া চলে এসেছিল জ্যালেপির বাড়ি। মাটি খুঁড়ে তুলেছিল শিশুর মৃতদেহ। শিশুটিকে ঠিক অর্ধেক করে কেটে নিম্নাংশটা আবার সেইখানেই গর্ত খুঁড়ে রেখে ওপরের দিকটা নিয়ে চলে এসেছিল মিডিঙ্গিলা! আসার আগে—সেই মরা বাচ্চাটার একটু রক্ত নিয়ে কাফরি কমলার খোলার ভেতরে রেখেছিল সে। তার সঙ্গে একটা শিকড় বেটে দিয়ে মায়াশরবত তৈরি করে খাইয়ে দিয়েছিল মিডিঙ্গিলা আসামীকে।

তাহলে সেই শিশুর দেহের ওপর দিকের অংশ নিয়ে কি করেছিল ডাইনীরা?

মিডিঙ্গিলা আর নিউয়া সেই শিশুর দেহের ওপরের অংশ টুকরো টুকরো করে কেটেছিল। মশলা দিয়ে সুন্দর করে রান্না করে খেয়েছিল তারা। বলেছিল হাড় ও মাংস খুব নরম। তারা খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিল।

—তুমি তো মায়াশরবত দিয়েছিলে, উকিল জেরা করেছিল মিডিঙ্গিলাকে তার পরে নরমাংস খেলে কেন?

বলেন কী হুজুর, মানুষের মাংস না খেলে যে আমরা 'এনগানা' (ওঝা বা উইচ ডকটর) হতে পারব না—সরল বিশ্বাসের আলোয় তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল!

এই মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারক বলেছিলেন—এই কেসটির একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে—এখানে সাক্ষী শুধু নিজেকে ডাইনীই বলেনি, মায়াশরবতে সেই মৃত শিশুর রক্ত ব্যবহার করেছে এবং শিশুর মাংস খেয়েছে শুধু নিজেকে সুদক্ষ ডাইনী ও ওঝা বা ডক্টর ডিভিনার প্রমাণ করার জন্যই।

১৯৪৮ সালের এই বীভৎস ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে সাময়িক পত্রিকা

*মন্ত্রপূত শরবত। যে পান করে সে পরিবেশক বা পরিবেশিকার প্রেমে আসক্ত বা বশীভূত হয়। ইংরেজিতে বলে Love potion.

'আফ্রিকা টু-ডে' মন্তব্য করেছিল—আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই ধরনের বিক্ষিপ্ত আরও অনেক ঘটনার সংবাদ আসে এখনও খবরের কাগজে।

এই মামলার আসামী জ্যালেপি প্রেমিকের সন্তান গর্ভে ধারণ করেও প্রেমে ব্যর্থ, তেমনি ডিঙ্গেলাও তার ভালবাসার পুরুষ রেভান্দিকে পেতে চেয়েছিল বলেই মায়াশরবতের খোঁজে গিয়েছিল মিডিঙ্গীর কাছে আর প্রথম কেসটির আসামী সন্দেহে ধৃত যুবতী নেটসেয়ি—প্রতিটি মামলার সঙ্গে জড়িত রমণীদের সাদৃশ্য আছে একটি সূত্রে—যৌন অতৃপ্তি। একেই উইচ ক্র্যাফট অ্যাণ্ড সরসারি ইন রোডেশিয়া গ্রন্থের বহুদর্শী লেখক ক্রফোর্ড বলেছেন Sex antagonism!

ডাইনীবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে জড়িত থাকে যে তীব্র কামবাসনা তারই আরও একটি মামলার বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হলো—

অতৃপ্ত কামনাবাসনার অন্ধকার বিবর থেকেও
বেরিয়ে আসে হিংস্র ডাইনী।

চার

গোড়াতেই বলে রাখা দরকার এই মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারক মন্তব্য করেছেন Sexual antagonism can be a source of Wizardly allegations অর্থাৎ অবদমিত যৌনবাসনাও ডাইনী সন্দেহের সূত্র হতে পারে।

এই কেসটির নাম আর বনাম এনডমেনি জেমস। আর অর্থাৎ রিগা নামে কোন তরুণী হয়তো। মামলার শুনানীতে জানা যায় আসামী এনডমেনি জেমস রোডেশিয়ার রাজধানী সালিসবারির বাসিন্দা। সে ব্যবসায়ী। কাঠ চালান দেওয়ার জমজমাট কারবার তার। জেমস তার ব্যবসার সূত্রেই গিয়েছিল সালিসবারি থেকে কিছুদূরে হার্টলেতে। সেখানকার এক হোটেলের মালিকের মেয়ে রিগার সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় থেকে ভাবভালবাসা হতেও দেরী হয় না।

রিগা জেমসকে দেহ মন উজাড় করে ভালবেসেছিল। আর বাসবেই না বা কেন? এনডমেনি সুপুরুষ সুদর্শন। কারবারী পয়সাওয়ালা মানুষ। কোন অবিবাহিত মেয়ের তো তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু—

আশ্চর্য মানুষ এই জেমস। যাকে ভালবেসেছিল যার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত দু এক রাত্রিযাপনও করেছিল তাকে-ই—সেই মেয়েকেই ডাইনী বলে প্রচণ্ড অত্যাচার করেছিল কেন?

রিগার জবানবন্দী—

আসামী এনডমেনি জেমসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল হার্টলেতে আমাদের হোটেলে। হার্টলে রোডেশিয়ার একটি ব্যবসাকেন্দ্র। পিতৃদেব আমার জন্মের কয়েক বছর আগেই এই হোটেলের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। মা রান্নাবান্নার দিকটা দেখাশুনা করতেন। আর আমার ওপরে ভার ছিল বোর্ডারদের কার কি অসুবিধা হচ্ছে তার তদ্বির তদারক করা। শুধু ক্যাশ সামলাতেন বাবা।

কয়েক বছর আগে এক শীতের সকালে নজরে পড়ল এক সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক হোটেলের অফিস ঘরে বসে বাবার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছেন আর

খুব দামী চুরুট টানছেন। বাবা-ই আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বলেছিল, আমাদের এগারো নম্বর ঘরের নতুন বোর্ডার—এনড্মেনি জেমস। জেমস—সালিসবারি থেকে এসেছেন—টিম্বার মার্চেন্ট—

আমি কিছুই বললাম না। শুধু ইংরেজী কায়দায় স্যালুট করে বললাম, গুড মর্ণিং স্যার—বলেই তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।

না, ভয়ে নয়। অস্বস্তিতে। ভদ্রলোকের বড় বড় চোখদুটোর দৃষ্টি আমাকে যেন গিলে খেতে চাইছিল। কিন্তু—

সেইদিন-ই সন্ধ্যায় বাবা বললেন, এগারো নম্বরে গিয়ে জেনে এস—বালিশ বিছানা কি উনি নিয়ে এসেছেন—না আমাদের দিতে হবে—একটু থেমে বাবা আমার সঙ্কুচিত মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, আমাদের দিতে হলে তোষক এবং বালিশের চার্জ আলাদা আলাদা করে বলতে ভুলো না যেন—

যাবো না—যাবো না করেও যেতেই হলো। কি করবো হোটেল যে আমাদের পারিবারিক ব্যবসা। রুজি রোজগারের একমাত্র উপায়।

আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন আসামী। অনুযোগ করে বললেন, আপনি আমাকে এড়িয়ে যান কেন বলুন তো, অথচ প্রত্যেক বোর্ডারের ঘরে যাচ্ছেন—দিব্যি হাসিগল্প করছেন।

আমি কোন কথাই বললাম না। সদ্য পরিচিত ভদ্রলোককে কি-ই বা বলা যায়। আসামী অভিমান করে বলল, টাকা রোজগার করে কি হবে বলুন তো? একা একা বাস করা যায়—জীবন কেমন বিস্বাদ লাগে—

কেন বিয়ে করেন নি?

বিয়ে! হেসে বলল আসামী বিয়ে করার সময় পেলাম কই—সারাটা জীবন তো বনে বাদাড়ে কাঠের খোঁজে-ই কেটে গেল—

আসামী কথাগুলো বলল নিতান্ত আপনার জনের মত। আমার কেমন মায়া হলো। বাবার কাছে জেনেছিলাম, আসামী শুধু আফ্রিকান নয়—আমাদের-ই সোনা সম্প্রদায়ের লোক! জাম্বিয়াতে-ই আদি বাড়ি। অতএব আমাদের ভেতরে আত্মীয়তা গড়ে উঠতে দেরী হলো না।

আমি আসামীকে বিশ্বাস করেছিলাম। ভালবেসেছিলাম। প্রায়ই আমরা লেকে বেড়াতে যেতাম। মাঝে মাঝে আসামী আমাকে যেখানে তার কাঠ কাটার কাজ চলছিল, সেই রিজার্ভ ফরেষ্টে নিয়ে যেত। এমন অবস্থা হলো আমার, জেমসকে দুদণ্ড না দেখলে থাকতে পারতাম না!

কখনো নির্জন দুপুরে কখনো বা গভীর রাত্রে যখন সব বোর্ডাররা এবং

বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়তো আমি যেতাম আসামীর ঘরে। না যেয়ে কোন উপায় ছিল না। আমার তেইশ বছরের বুভুক্ষু জীবনে যে বিচিত্র একটা স্বাদ এনে দিয়েছে আসামী। আমি বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেয়ে গেলাম। আমার পৃথিবী রঙীন হয়ে উঠল।

আমাদের ঘনিষ্ঠতায় বাবা-মা খুব খুশি। এক সম্প্রদায়ের লোক। অবস্থাপন্ন মার্চেন্ট। সালিসবারিতে নিজের বাড়ি। এইরকম জামাই পেলে কোন বাবা-মা সুখী না হয়!

আপনাকে বিয়ে করবে এই প্রতিশ্রুতি কি দিয়েছিল আসামী?

পাবলিক প্রসিকিউটার প্রশ্ন করলেন?

হ্যাঁ—হুজুর—

তারপর?

তারপর আর কি? সালিসবারি থেকে দুএকদিনের ভেতরে ফিরে আসবো বলে সেই যে চলে গেল আর ফিরে এল না! আমি ভেঙ্গে পড়লাম।

বাবা সালিসবারিতে লোক পাঠালেন আসামীর খোঁজখবর করতে। আমি রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে শুরু করলাম। আমার শুধু মনে হয় জেমস আমাকে কখনো ঠকাবে না—ঠকাতে পারে না। আমি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে—সমস্ত সত্তা ঢেলে দিয়ে ভালবেসেছি—

আমার মনের আয়নায় নিশিদিন একটি মুখের ছবিই ফুটে উঠতে লাগল। আবার মনের ভেতরে বিষধর সাপের মত ফুঁসে উঠল একটি অদ্ভুত আশঙ্কা—যদি আমাকে প্রবঞ্চনা করে, যদি আমাদের লোক গিয়ে জানতে পারে, জেমস ম্যারেড! ছেলেপুলে আছে—তাহলে?

না—না—ও ক্রায়েস্ট—তা যেন কিছুতেই না হয়, আমার বুকের ভেতর থেকে একটা নিশব্দ আর্তনাদ ডুকরে উঠেই থেমে গেল।

না। তাহলেও আমি জেমসের ওপরে কখনো নিষ্ঠুর বা হিংস্র হতে পারবো না। হতে পারি আমি আফ্রিকার আদিবাসী মেয়ে। কিন্তু একটু আধটু লেখাপড়া শিখেছি। আমার মনের গঠনটা হয়ে গিয়েছে অন্যরকম। আমি বেশ অনুভব করতে পারি। যাকে একবার গভীরভাবে ভালবাসা যায়, কখনো তার ওপরে আক্রোশে ক্ষিপ্ত হওয়া যায় না—স্টপ—স্টপ—হঠাৎ ইউরোপীয় বিচারক হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। রাগী শিপাঞ্জীর মত দাঁত কিড়মিড় করে কি যেন বললেন তার আফ্রিকান পেশকার কে।

পেশকার আবার উত্তর রোডেশিয়ার মুজেজুরু সম্প্রদায়ের লোক। মুজেজুরু

উপজাতিরা কোনদিনই আমাদের সহ্য করতে পারে না। তাই পেশকার ক্ষিপ্ত সিংহের মত গর্জন করে বলল, এই মাগী তোর প্রেম ভালবাসার ন্যাকামি বিতং করে বলার জায়গা কোর্ট নয়—তুই বল, তোকে আসামী ডাইনী সন্দেহ করল কেন?—কি করেছিলি তুই?

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলাম। ইউরোপীয় জজকে বললাম, মাই লর্ড আমি নেটিব হলেও একজন ভদ্রমহিলা—আপনার ক্লার্ককে ভদ্রভাষায় সংযত হয়ে কথা বলতে বলুন—

হুম। জজসাহেব শুধু গর্জন করে উঠলেন। বললেন, জাস্ট প্রসিড—

সালিসবারি থেকে আমাদের লোক ফিরে এসে জানালো—এনডমেনি জেমস কাঠের মার্চেন্ট টার্চেন্ট ওসব কিছু না। কয়লাখনিতে কুলী সাপ্লাই করে—আর সামান্য জমিজমা আছে। গ্রামেগঞ্জে ঘুরে কুলী জোগাড় করে মোটা কমিশন পায়—সেই টাকা দিয়েই সালিসবারিতে দোতলা বাড়ি হাঁকিয়েছে আর—

জেমস ম্যারেড!

তবে স্ত্রী থাকে না সালিসবারিতে। তাকে গ্রামের বাড়িতে ফেলে রেখে শহরে বাজারের নিত্যি নতুন মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি লুটে বেড়ানো নাকি তার স্বভাব।

ব্যস—তাহলে তো ফুরিয়ে গেল পাবলিক প্রসিকিউটার হেসে বললেন ধান খেয়ে তো মুরগী সাধারণত পালিয়েই যায়। কেউ তো আবার উল্টে এসে কোর্টে নালিশ করে না।

বাবা কেস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বাধা দিয়েছিলাম। বলেছি তো যাকে একবার ভালবাসা যায়, তার কোন অনিষ্ট কখনো করা যায় না। আমি আসামীকে ভুলে যেতে চেষ্টা করেছিলাম। প্রায় ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু—

কয়েকদিন আগে হঠাৎ এল সালিসবারি থেকে একটা চিঠি—জেমস নিজেই লিখেছে—তুমি হয়তো এতদিনে সব শুনেছ—আমাকে তুমি কখনো ক্ষমা করবে না জানি। কোন মেয়ে-ই কখনো করে না। কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি তোমাকে আমার ভালবাসার ভেতরে কখনো ফাঁকি ছিল না—আজও প্রতি মুহূর্তে-ই তোমার কথা মনে হয়—

আমি অসুস্থ। এমন একটা বিশ্রী অসুখ হয়েছে যে কাউকে বলতেও পারি না। তুমি কি একবার সালিসবারিতে আসবে? তুমি এলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠবো। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো—

সঙ্গে সঙ্গে আমি রওনা হলাম। সালিসবারিতে পৌছে তার বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র লম্বা কালো কাঁকলাসের মত একটি স্ত্রীলোক চিৎকার করে বলল, এই যে ডাইনী এসেছে—ডাইনী—

আমি উৎসুক হয়ে চারিদিকে তাকালাম। কোথাও জেমসকে দেখতে পেলাম না। আমি মহিলাটিকে বললাম—আপনি কাকে—কি বলছেন।— জেমস কোথায় ?

কোন কথা বলল না সেই স্ত্রীলোক।

শুধু আমার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে কি দেখতে লাগল।

কি দেখছেন ? জেমস কোথায়—আমি আস্তে আস্তে বললাম, সে নাকি অসুস্থ—কোন ঘরে আছে সে—

এখন তার খোঁজ করে কি হবে, হিংস্র বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠল সেই স্ত্রীলোক—তার তো সর্বস্ব খেয়ে বসে আছো—

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভ্যাবলার মত মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম—

এমন সময় দোতলা থেকে নেমে এল জেমস—এস—এস—রিগা—তুমি এসে গেছ!

আমার সামনে হাসি হাসি মুখ নিয়ে দাঁড়ালো আমার বন্ধু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন—আমার প্রথম প্রেম—কিন্তু—

কোথায় অসুখ। দুধে ঘিয়ে বেশ তেল চকচকে চেহারা। বললাম—তুমি নাকি খুব—অসুস্থ—

হ্যাঁ-হ্যাঁ—সে আর বলো না—কী যে লজ্জার সেই অসুখ! জেমস আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে নিচু গলায় বলল, তুমি আমার সঙ্গে ছাদে চলো—এখানে তোমাকে বলতে পারবো না—

আমি আসামীর সঙ্গে ছাদে পা দেওয়া মাত্র কতবড় বিপদে পড়েছিলাম এবং আমার জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, সেসব তো আমার দরখাস্তে আছে হুজুর—

আপনি কি ডাইনীবিদ্যা বা জড়িবুটি মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে কখনো চর্চা করেন নি? পাবলিক প্রসিকিউটার প্রশ্ন করলেন।

ডাইনীবিদ্যা বলে কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না স্যার, আফ্রিকার মেয়ে রিগা বেশ স্পষ্ট করেই বলল, ওসব গাঁয়েগঞ্জের অশিক্ষিত লোকের বিশেষ করে বিধবা বুড়িথুড়িদের কারবার—আমি দস্তুর মত কনভেণ্টে পড়া মেয়ে—

কি ছিল রিগার দরখাস্তে ?

তার আগে দেখা যাক আসামী জেমসের বিবৃতি—

আমি হার্টেলে থেকে সালিসবারিতে ফিরে এসেই গ্রাম থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এলাম। বেশ শান্ত, ভদ্র, সুস্থ সংযত জীবনযাপন করবো। আর কোন মেয়ের সর্বনাশ কখনো করবো না। হয়তো আমার এই পাপের ফলে ঈশ্বরের কাছে আমাকে শাস্তি পেতে হবে—

কিন্তু আমার শাস্তি এত তাড়াতাড়ি একেবারে হাতে হাতে পেতে হবে তা আমি জানতাম না।

আমার ধারনা ছিল রতিক্রিয়ায় আমি অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ। যে-কোন মেয়েকে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা আমার আছে। যেসব মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করেছি তাদের কারো কারো মুখেও শুনেছি—দীর্ঘ সময়ব্যাপী রমণে আমার না কি বুনো ঘোড়ার মত শক্তি—বলাবাহুল্য এসব কথা—যত অল্পদিনই থাক আমার কাছে—আমার স্ত্রী জানতো।

গ্রাম থেকে যেদিন সে এল, সেইদিন রাতে বিছানায় এসেই মত্ত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। বহুদিনের উপোসী বাঘিনী যেমন তার শিকার নিয়ে তীব্র আনন্দে লোফালুফি করে ঠিক তেমনি করে আমাকে কখনো পাগলের মত চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে ফেলে কখনো বা আমার বুকের ভেতরে মাথা ঘসতে থাকে। বিড় বিড় করে বলে—উঃ তোমাকে কতদিন কাছে পাই নি—কামনার জ্বালায় তার চোখ দুটো দু'খণ্ড আগুনের মত জলজল করতে থাকে। তবুও—

তবুও আমি পাথরের মত ঠাণ্ডা আর নির্বিকার। সে অন্ধকার ঘরে ঘা-খাওয়া জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল, কোন মেয়ে তোমার মন ভজিয়েছে—আমাকে তোমার ভাল লাগছে না—এতদিন পরে তোমার কাছে এলাম, নির্জন ঘরে তার কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনালো।

আমি চুপ।

আমি কিছুই বললাম না।

সে আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদিনীর মত টান দিয়ে ফর ফর করে খুলে ফেলল ব্লাউজ। অবারিত করল তার বুকের শোভা, খুলল স্কার্ট। টেনে খুলে ফেলল অন্তর্বাস। সম্পূর্ণ নগ্ন নিরাবরণ আদিম মানবীর মত আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তীব্র উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত ঘসে বলল দেখ—দেখ—অন্য মেয়ের যা আছে—আমারও তাই আছে—

আমি ওর বিবসনা মূর্তির দিকে ওর নগ্ন সৌন্দর্যের দিকে, তাকাতে পারলাম না। ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে লাগল।

তোমার—কি—হয়েছে বলো তো, এইবার স্ত্রী স্থানকাল ভুলে চিৎকার করে উঠল, আমার গলা দুহাতে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে বলল, আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন—

আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না। কি বলবো—কেমন করে ওকে বোঝাবো এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতরে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জলছে। সেই আগুনকে প্রশমন করার উপকরণ আমার সামনে। কিন্তু—

আমার শক্তি নেই। কে জানে কোথায় গেল বুনো ঘোড়ার মত সেই রতিক্রিয়ার শক্তি। অনেক চেষ্টা করেও এতটুকু উত্তেজনা আসছে না। বুঝলাম আমারই পাপে—আমি—

পুরুষত্বহীন হয়ে গিয়েছি—

আশ্চর্য আমার স্ত্রী একটা কথাও বলল না। দ্রুত হাতে বেশবাস পরে চলে যেতে যেতে তীব্র ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বলল, ছিঃ তোমার মত পুরুষের কাছে আর কখনো আসবো না—

কেমন করে এমন হলো যে, কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি একটা নিতান্ত বেকুবের মত বিড় বিড় করে বলতেই বাইরে থেকে ঝাঁঝিয়ে উঠল আমার স্ত্রী—বোঝাবুঝির আবার কি আছে—নিশ্চয়ই কোন বদমায়েস, তুকতাক জানা ডাইনী মাগীর সঙ্গে ইয়ে করতে গিয়েছিলে দিয়েছে একেবারে খতম করে—

রাত ফুরিয়ে দিন এল।

আমার কানের কাছে পুরানো মেশিনের কর্কশ ধ্বনির মত বেজে যেতে লাগল আমার স্ত্রীর শেষের কথাগুলো—তুকতাক জানা কোন ডাইনী স্ত্রীলোক—কে?—কে হতে পারে?

দিন কাটে। রাতে ঘুমোতে পারি না। আমার স্ত্রী আর আমার ঘরে আসে না। আমার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলে না। আমার মনে হল—আমার স্ত্রী পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ—সে তুকতাক বা ডাইনীবিদ্যার কথা ভাবতে পারে—সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু—সত্যিই কি মন্ত্রপ্রয়োগ করে কারো ক্ষতি করা যায়? লেখাপড়া জানা লোকরা তো বলে বুজরুকি—ওসব চালাকি। আবার মনে হল, ডাইনীবিদ্যা যদি অনিষ্ঠ নাই করতে পারবে, তাহলে আমার এই দারুণ সর্বনাশ কেমন করে হলো? শুনেছি খুব ভারী অসুখ বিসুখ না

করলে কখনো পুরুষত্বহানি হতে পারে না—গেলাম সালিসবাড়ির বিখ্যাত ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললেন, টেমপোর‍্যারি এক্সসাইটমেণ্টের জন্য অনেক ওষুধ বিষুদ আছে—কিন্তু ইমপোটেনসিতে স্থায়ী কোন কাজ হয় না—

তবুও বেশ স্পষ্ট মনে আছে, আমি মরিয়া হয়ে বলেছিলাম, তাহলে তাহলে ডাক্তারবাবু এই রোগের কোন ওষুধ নেই আপনাদের।

ডাক্তারবাবু কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন আগামীকাল আসবেন তো ভেবে দেখবো—

পরের দিন গিয়েছিলাম। দিন তিনেক ধরে কিসের একটা ইনজেকশান দিয়েছিল। কিন্তু কিছুই হলো না। প্রতিদিনই রাত্রে স্ত্রীকে ডাকি। আসে না। রাগে ফোঁস ফোঁস করে। দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকে। জীবন সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে গেলাম।

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু পরামর্শ দিলেন, মন্ত্রতন্ত্র জানে তুকতাক বা ডাইনী-বিদ্যা জানে এমন একজন ওঝাকে ডেকে নিয়ে এস—এনগানা! উইচ ডক্টর! ডাইনীবিদ্যায় যারা সুদক্ষ! কথাটা মনে ধরল।

বুড়ো এক এনগানা এল। ছোট ছোট কুতকুতে দুটো চোখ। সাদা ধবধবে দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুখের আদল খুঁজে পাওয়া কঠিন। যথারীতি ওঝার হাতে সেই মড়ার মাথার খুলি। যাদুদণ্ড। ঝোলার ভেতরে নিশ্চয়ই নানা পশুপাখির চামড়া আর শিকড়বাকড়।

এমনিতে কোনকালেই আমার মন্ত্রেতন্ত্রে বিশ্বাস নেই।

ওঝা হঠাৎ করল কি, কোন ভূমিকা না করে আজেবাজে একটা কথা না বলে, স্পষ্ট বলল, তোমার বাড়ির চারিদিক আমি ঘেরে ফেলেছি—আর কোন শালী আসতে পারবে না—

কি বলছেন আপনি?

কি আবার বলবো, তোর যে ক্ষতি করেছে আমি তার কথা বলছি—আকাশের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল।

কে আমার ক্ষতি করেছে?

কেন তোর সঙ্গে হার্টলের যে মেয়েটির খুব ভাবসাব হয়েছিল সে আসলে ডাইনী—সে-ই তোর এই সর্বনাশ করেছে—

রিগা—ডাইনী?

মুহূর্তে আমার স্ত্রীর কথাগুলো আমার কানের কাছে বাজতে লাগল নিশ্চয়ই ো মেয়ের সঙ্গে বদমায়েসী করতে গিয়েছিলে—

সেই মেয়ে তোমার—

ডাইনীবিদ্যা কি তুকতাক যদি রিগা নাই করে থাকে তবুও যে দিনের পর দিন আমার অঙ্কশায়িনী হয়েছে, মন উজাড় করে ভালবেসেছে সেই তাকেই তো আমি ঠকিয়েছি। তার অভিশাপেও আমার এই সর্বনাশ হতে পারে—

ওঝার পরামর্শে রিগাকে ডেকে পাঠালাম। চিঠি পাঠানোর পরদিনই রিগা এল। আসবে, জানতাম। সে যে আমাকে ভালবেসেছিল।

আমাকে দিব্যি সুস্থ দেখে আশ্চর্য হলো। বলল, বিয়ে থা করে ঘর সংসার করছো, এখন আমাকে কিসের দরকার পড়ল?

আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

কেমন করে বলবো, সে ডাইনী—আমাকে তুক করে দারুণ সর্বনাশ করেছে!

আসামী এনডমেনি জেমসের বিবৃতিতে আর কিছু জানা যায় নি। আফ্রিকার ডাইনীসংক্রান্ত বিচিত্র কার্যক্রমের গবেষক ক্রফোর্ডসাহেব জানিয়েছেন, সালিসবারি কোর্টের নথিপত্রের ভেতরে রিগা বনাম এনডমেনি মেসের মামলা সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি আর কোন তথ্য বহু খুঁজেও পান নি। কেসের প্রসিডিংসে শুধু আছে—

রিগা সরল বিশ্বাসে জেমসের বাড়িতে আসার পরই ওঝা বা এনগান জেমসকে বলেছিল, এই মেয়েই তোর ক্ষতি করেছে, বলেই রিগার চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে শুরু করে।

রিগা আশ্চর্য হয়ে বলে জেমসকে, এসব কি জেমস—আমি তোমার ক্ষতি করতে পারি? জেমসও না কি বলে, হ্যাঁ তোমারই জন্য আমি পুরুষত্বহীন হয়ে গিয়েছি। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই এনগানা তার লাঠি দিয়ে রিগাকে বেধড়ক মারতে শুরু করে। যন্ত্রণায় যত আর্তনাদ করে রিগা তত গর্জন করতে থাকে এনগানা, চুপ কর মাগী, তোর মন্ত্র ফিরিয়ে নে—বল জেমসকে কি খাইয়েছিস?

তুমি বিশ্বাস করো জেমসের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ে রিগা, —তুমি বিশ্বাস করো, কোনদিন একমুহূর্তের জন্য তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিনি—

খবরদার বিশ্বাস করো না ডাইনীর কথা, এনগানা চিৎকার করে সতর্ক করে দেয় জেমসকে, ওরা অনেক ছলনা জানে।

রিগা জেমসের পা দুটো বুকের ভেতরে আঁকড়ে ধরে বলে তোমার বিশ্বাস না হয়, আমাকে মাবতুকায় নিয়ে চল। সেখানে আমার ছোট ভাই আছে—আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি—আমি মন্ত্রতন্ত্র বা ডাইনীবিদ্যা জানলে—সে কথা

আমার ছোট ভাই নিশ্চয়ই জানবে—

রিগার কথাটা বিশ্বাস করল জেমস। এনগানাকে থেমে যেতে বলল। এনগানা অত্যন্ত রুষ্ট হলো। জেমসের দারুণ সর্বনাশ হবে বলে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল।

জেমস নিজেই রিগাকে নিয়ে এল মাবভুকায়।

ক্রফোর্ড শেষে শুধু বলেছেন—She (Riga) persuaded the accused to take her to him (Brother). Brother reported the matter to the police.

অর্থাৎ রিগা অপরাধীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করিয়েছিল তার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যেতে। ভাই ব্যাপারটা পুলিশকে জানায়। মনে করা যেতে পারে রিগা চালাকি করে তার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যেতে বলেছিল জেমসকে। আর জেমস তাকে আজও ভালবাসে বলেই ওঝার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রিগার কথায় রাজি হয়েছিল। কিন্তু—

কিন্তু পুলিশকে জানানোর পর পুলিশ কি স্টেপ নিয়েছিল তার কোন উল্লেখ নেই। আবার এমন হতে পারে, হতাশা এবং তৃপ্ত তীব্র কামনার জ্বালাই তাকে 'ডাইনী' আখ্যা দিতে প্রেরণা দিয়েছিল জেমসকে—এই সত্যটি রিগা স্ত্রীসুলভ সহজাত উপলব্ধি দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিল বলেই প্রণয়ীকে ক্ষমা করে সে আপোষে কেস মিটিয়ে নিয়েছিল—

ডাইনীবিদ্যায় নিবিড় বিশ্বাসের জন্য-ই কত ভয়ানক বীভাগ ঘটনা ঘটে যেতে পারে—

পাঁচ

—"হ্যাঁ বলছি তো মুহালভার বাচ্চাকে আমি খুন করেছি—আমি তো নিজেই মুহালভাকে বলেছি। আমি তার বাচ্চা সানিকে খুন করেছি—বদলা নিয়েছি, মুহালভা কেন আমার বাচ্চাটাকে আমার চোখের সামনে আছড়ে মেরে ফেলল। ব্যস সব শেষ। শোধবোধ হয়ে গিয়েছে—কেউ কাউকে আর দোষ দিতে পারবে না—এই জবানবন্দীটুকু মধ্য আফ্রিকার এক রমণীর। তার নাম 'ডয়া'। ২রা আগষ্ট ১৯৬০ সালে ফোর্ট ভিক্টোরিয়ার হাইকোর্টের মামলায় সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।

২৫শে মার্চ, ১৯৬০, মুয়ানেটসি গ্রামে এই বীভৎস ঘটনার তদন্ত এবং এই মামলার প্রস্তুতিপর্বের রেকর্ডের ভিত্তিতে দেওয়া হলো নিচের এই বিবরণ।

ডয়া তেইশ চব্বিশ বছরের এক তরুণী। সে বিবাহিত এবং তিন মাসের একটি শিশুর মা। ডয়ার দৃঢ় বিশ্বাস তার বাচ্চাটিকে ডাইনী মুহালভা খুন করেছে। যদিও সেই শিশুর দেহে পোষ্টমর্টেম একজামিনেশানে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

এই ক্রাইমের অর্থাৎ অপরাধের একটি মাত্র মোটিভ—প্রতিহিংসা, রিভেনজ। নিচে আসামীর দীর্ঘ জবানবন্দী থেকে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল এই নারকীয় ও অমানবিক ঘটনা শিশুহত্যা—

ডয়ার জবানবন্দী—

আমি গর্ভবতী হয়েছিলাম, যেমন আর পাঁচদশটা মেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়। তাদের স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের পরে তেমনি করে আমিও হয়েছিলাম। না, সেখানে কোন ফাঁকি বা ভেজাল ছিল না। কিন্তু—

আমার সেই প্রথম সন্তান—আমার বুকের নাড়ি ছেঁড়া ধনকে হত্যা করেছে ডাইনী মুহালভা! কেমন করে এবং কেন আমার বাচ্চাকে সে খুন করেছিল—সেই বৃত্তান্ত এবার বলছি—

আমার বাচ্চাটি তার জন্মের পর থেকেই লক্ষ্য করলাম বুকের দুধ মোটেই টানতে পারছে না। সর্বনাশ বুকের দুধ খেতে না পারলে বাঁচবে কি করে? আমি দারুণ সমস্যায় পড়ে গেলাম। কি করি কার কাছে যাই—

মনে পড়ল মায়ের কথা। বাচ্চা নিয়ে ছুটলাম বাপের বাড়ি। মা নানা-রকম টোটকা ওষুধ-বিষুদ খাওয়ালো, কত চেষ্টা করল কিন্তু—

কিছুই হলো না। বাচ্চা দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগলো। চিঁ চিঁ করে কাঁদে। কিন্তু দুধ টানতে পারে না। মা আমার সমস্যাটা পাড়ার কয়েকজন বৃদ্ধাকে গোপনে জানালো। তারা গুজ গুজ করে কি সব বলে চলে গেল। মা-র মুখখানা কেন যেন গম্ভীর আর কঠোর হয়ে উঠল।

মা আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, বাচ্চা পেটে আসার আগে কোন কোন ছেলের সঙ্গে কি করেছিস বল—

যাদের সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল সেইসব বয়ফ্রেণ্ডদের নাম বললাম। মা বোধহয় কোন ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার স্বামী এসে আমাকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এল। তখনও আবার বাচ্চার সেই একই অবস্থা। শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গিয়েছে।

আমি পাগলের মত হয়ে উঠলাম। যেমন করে হোক বাচ্চাকে বাঁচাতে হবে। আমি সব খোলাখুলি বললাম আমার মাসউরিরা (শাশুড়ি) কে। বলেছিলাম, ছেলেকে বাঁচানোর যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন—

শাশুড়ি মানুষ খারাপ নন। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য কিছুই বললেন না। গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, তুমি বাপু—ও পাড়ার মুহালভার কাছে যাও—মুহালভা ডাইনীবিদ্যা জানে—

মুহালভার সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। সে আমার বাচ্চাকে দেখেশুনে বলল, তুই বোকার মত তোর বয়ফ্রেণ্ডদের কথা শাশুড়িকে বা তোর মাকে বলতে গেলি কেন? একটুক্ষণ কি ভেবে গম্ভীর হয়ে বলল, মুহালভা, এটা তোর প্রথম বাচ্চা—না? যাদের সঙ্গে তুই বদমায়েসি করেছিস তাদের নাম কখনো বলতে আছে—তাহলে তোর বাচ্চা জারুয়া (জারজ) হয়ে গেল না? আর কখনো তোর নাগরদের নাম বলবি না। বাচ্চার দুশ্চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে-দিদি, আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিলাম।

কোন চিন্তা করিস না—আজ রাত্রে তোর বাচ্চাকে নিয়ে চলে আসিস আমার ঘরে—রাত্রে আমার সঙ্গে ঘুমোবি, বলেছিল মুহালভা. বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।

একটা ধারালো খুর নিয়ে এসে কুচ করে আমার ডানদিকের স্তনের নিচের একটু জায়গা চিরে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে দিল। চাপা গলায় সতর্ক করে বলল, খবরদার আমার নাম কিন্তু কাউকে বলবি না—এসব

আমি তোর মঙ্গলের জন্য করছি। আর শোন তোর প্রথম সন্তানকে বলি দিতেই হবে। তাতে তোর ভালই হবে।

আমি কোন কথা বললাম না।

সন্ধ্যার পর আমি আমার ছেলেকে নিয়ে এলাম মুহালভার বাড়িতে। রাত যত বাড়ে ততই আমার ভয় করে—আমার প্রথম সন্তানকে বলি দিতে হবে? কেন--তাতে কি লাভ হবে?

আমাকে চিন্তার ভেতরে ডুবে থাকতে দেখে মুহালভা বলল, অত ভাবছিস কেন? আমারও তো প্রথমটা নেই—ডাইনীবিদ্যার ফল পেতে হলে কিছুতেই প্রথম বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না—

না-না-আমি ডাইনীবিদ্যার কোন ফল চাই না—আমার দরকার নেই—আমার বাচ্চাকে আমি খুন করতে পারবো না, এই কথাগুলো-ই আমি বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মুহালভার কুটিল মুখখানার দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারলাম না। যদি আমার বাচ্চাকে খুন করে আবার মন্ত্রের প্রভাবে বাঁচিয়ে দিতে পারে—তাহলে তো সে সুস্থ হবে।

তাই কিছুই বললাম না--

প্রহরে প্রহরে রাত গভীর হলো। বাচ্চাকে বুকের ভেতরে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইলাম। মাঝখানে উনানে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে-ঘর গরম রাখার উপকরণ। উনানের ওপাশে খড়ের বিছানার ওপরে চাদর পেতে শুয়ে রয়েছে মুহালভা, তার পাশেই তার এক বছরের শিশুপুত্র—সানি তারপরেই তার ছেলেমেয়ে ওয়ানি আর মুসিও—

বাইরে হু হু শীতের উত্তরে বাতাস আছড়ে পড়ছে বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি দরজায়। মট্‌মট্‌ শব্দ উঠছে বাঁশের খুটিতে।

কাঁ-কাঁ—করে কোন নাম না জানা নিশাচর পাখি কর্কশ চিৎকার করে ডেকে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে চলে গেল অন্ধকার দিগন্তে।

মিউ-মিউ—একটা বিড়াল ঠিক ঘরের পেছনে কেঁদে কেঁদে ডেকে চলেছে সেই তখন থেকে।

দুরুদুরু কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা। বিড়াল—কুকুরের কান্না ভয়ানক কোন অমঙ্গলের সংকেত বহন করে নিয়ে আসে। বাচ্চাটা তাহলে বাঁচবে না! বুকের ভেতরে কান্নার ঢেউ পাক দিয়ে উঠল। এত দুঃখের ভেতরেও কেমন করে যেন ঘুমের ঝুল এসেছিল আর গভীর ঘুমে তলিয়েও যেতে দেরি হয় নি।

এই—শোন—শুনছিস, আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে, ডেকে তুলল মুহালভা,

তোর বাচ্চাটা মারা গেছে—আমি—গ্রামের নেসরুকে (মোড়ল) খবর দিতে যাচ্ছি—বলেই চোখের পলকে শেষরাতের ফিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। মারা গেছে! কোথায় তার লাশ? নজরে পড়ল, মুহালভার তিন ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। উনান থেকে তুলে নিলাম একটা কাঠ। সেটা দিয়ে মুহালভার ছোট ছেলে সানির মাথায় মারলাম। একবার মাত্র ককিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল বাচ্চাটা। সঙ্গে সঙ্গে আরও মেরে মেরে মাথাটা একেবারে থেঁতলে দিলাম।

বাচ্চাটা এবার স্থির হয়ে গেল। তার জ্ঞানহীন দেহটা পড়ে রইল। আর দুটো ছেলেমেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ভয়ে উত্তেজনায় ছুটে চলে গেল ধানের মাঠে।

আমি বেরিয়ে এলাম উদভ্রান্তের মত।

আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস মুহালভাই আপনার শিশুটিকে খুন করেছে? সরকারী উকিল জেরা করল আসামীকে।

বিশ্বাস কি বলছেন, উকিলবাবু? ধক করে জ্বলে উঠল আসামীর চোখ দুটো। এতক্ষণ আপনাদের সব কথা বলি নি। ভোর রাত্রে নেসরুর কাছে যাওয়ার অনেক আগেই মুহালভা আমার বাচ্চাকে আমার সামনে খুন করেছিল হুজুর—

কি রকম? এই মাত্র তুমি বললে তুমি তাকে বুকের কাছে নিয়ে রাত্রে শুয়েছিলে?

হাঁ হুজুর, ঠিকই বলেছি—

তাহলে মুহালভা খুন করল কেমন করে?

মা-র চোখের সামনে তার সন্তানকে হত্যা। অতএব এবারে বলাবাহুল্য ডয়ার বিবৃতি যেমন দীর্ঘ তেমনি অসংলগ্ন। কখনো চিৎকার করে, কখনো বা শূন্যে হাত তুলে উত্তেজিত হয়ে সে যা বলেছিল তার সারাংশ এখানে দেওয়া হলো—

মুহালভার বাড়ি নয়। চারিদিকে ধু ধু ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ছোট একটা কুঁড়েঘর। বাঁশের বাখারির ওপরে মাটি দিয়ে লেপা দেওয়াল। ঘরের চারিদিকে মাঠে মাঠে থৈ থৈ করছে গমের গাছ। এই ফসল পাহারা দেওয়ার কাজ করছিল মুহালভা তখন। তাই গ্রাম থেকে অনেকদূরে জমির মালিকের তৈরি সেই পাহারা দেওয়ার ঘরে তখন সে দিন তিনেক থেকে বাস করছিল।

খুন-জখম—বীভৎস হত্যা ইত্যাদি ভয়ঙ্করজনক কাজ করার উপযুক্ত জায়গা

বলেই মুহালভা আসামীকে সেখানে যেতে বলেছিল বলে আসামীর বিশ্বাস।

রাত একটু গভীর হতেই মুহালভা হঠাৎ ডয়ার কোলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল তার ছেলেকে। ডয়া চিৎকার করে উঠল—কি করছ—করছ দিদি—বলেই হিংস্র বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুহালভার ওপরে; প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও ছেলেকে কিছুতেই মুহালভার কাছ থেকে নিতে পারল না।

আঃ তুই কি করছিস, বল তো? তোকে তো বলেছি, ওকে বলি দিয়েই সুস্থ করে তুলতে হবে—বলতে বলতেই বাচ্চাটার পাদুটো ধরে ঝুলিয়ে মাটিতে তার মাথাটা বার কয়েক আছড়ে দিল মুহালভা। বাচ্চাটা একেবারে নিথর হয়ে গেল। রেকর্ডে লেখা আছে—She (Muhalva) held it by the legs and struck its head once against the ground—আর মুহালভা যখন তাকে খুন করছিল তখনও ডয়ার শিশু জীবন্ত ছিল।

শিশুটির প্রাণহীন দেহটার দিকে ইঙ্গিত করে মুহালভা আরও বলেছিল ডয়াকে—তার প্রথম সন্তান নেই, ডয়ারও থাকা উচিত নয়। একেবারে প্রথমটা বেঁচে থাকলে ডাইনীবিদ্যার কোন সুফল পাওয়া যায় না।

তারপরেই বদ্ধ একটা উন্মাদিনীর চিৎকার করে বলেছিল ডয়া, তাই আমি মুহালভার ছেলেকে খুন করেছি হুজুর—বদলা নিয়েছি কেউ কাউকে আর দোষ দিতে পারবে না।

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক তথ্য (সত্য মিথ্যা বলা যায় না) উদ্‌ঘাটিত হলো মুহালভার দীর্ঘ বিবৃতি—

আমি বিশ্বাস করি না এবং আসামীকে কখনো বলিও নি প্রথম সন্তানকে খুন না করলে ডাইনীবিদ্যার কোন ফল পাওয়া যায় না। আর আমার প্রথম বাচ্চাটা নেই ঠিকই। তবে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। খুন করি নি আমার স্বামীর ঔরসেই আমার ছয়টি সন্তান হয়েছিল। শেষেরটি সানি যাকে আসামী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তিনজন মাত্র এখন আছে। বড়টা আর মেজ ছেলেটা অসুখে ভুগেই মারা গিয়েছিল।

আমার স্বামীর নাম—চিন্দাভা। আমি চিন্দাভার তিন নম্বর স্ত্রী। আমি আসামীকে চিনি। সে আমারই সতীনের মেয়ে, আমার স্বামীর দ্বিতীয়া স্ত্রীর কন্যা।

আসামী আমার কাছে এসেছিল তার অসুস্থ বাচ্চাটিকে নিয়ে। আমি বাচ্চাটিকে বাড়িতে রেখে আসামীকে নিয়ে গিয়েছিলাম ফাঁকা মাঠে। সেখানে গমের গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওর নিতম্বের খানিকটা মাংস কেটে নিই।

আর সেই কাটা জায়গায় সাদা সাদা পাউডারের মত গুঁড়ো ওষুধ ছিটিয়ে দিই। এই ওষুধই ডাইনী টটসাভানি দিয়েছিল আমাকে এবং আসামীকে কয়েকবছর আগে। তখন আসামীর বিয়ে হয় নি। সে তখন মাত্র চোদ্দ পনের বছরের মেয়ে। ওর বাবা-মা-র কাছেই থাকতো—কুমারী মেয়েরা যেমন থাকে। আসামী বিয়ের আগে আমার কাছে ডাইনীবিদ্যা শিখতে এসেছিল। টটসাভানি সেদিন আসামীকে এই ওষুধটা দিয়েই বলেছিল তাকে এখন থেকে তুই (ডয়া) ডাইনী।

বাধ্য হয়েই একটু পুরানো প্রসঙ্গ বলতে হচ্ছে। আমার যেমন, তেমনি আসামীরও ঝোঁক ছিল এই রহস্যময় ডাইনীবিদ্যার ওপরে। আগে আমার কথা বলি—

আমি ঋতুমতী হওয়ার আগে থেকেই নিয়মিত যেতাম টটসাভানির কাছে। যেতাম আর কোন কারণে নয়। উঠতি বয়সে মেয়েদের প্রবল আকর্ষণ থাকে স্ত্রী-পুরুষের মৈথুন এবং সন্তান প্রসবের জটিল ও বিস্ময়কর রহস্যের প্রতি। এসবই শুনতে যেতাম টটসাভানির কাছে। টটসাভানিও বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতো আর আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম। এইভাবে মাসখানেক কেটে গিয়েছিল। প্রতিদিনই টটসাভানি আমাকে কি একটা উত্তেজক পানীয় খেতে দিত। খেলেই মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম ঝিম করতো।

একদিন সে আমাকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিল। ঝুলির ভেতর থেকে একটা ছোট মাটির হাঁড়ি বের করল। শুকনো পাতা জোগাড় করে টটসাভানি গামলায় কি যেন সেদ্ধ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একটা পিঠের মত তৈরি করে আমাকে কালো পাথরের বাক্সের ভেতরে পুরে সেই পুডিং দিয়ে বলল, সবসময় কাছে রাখবি—এখন যে-কোন লোককে তুই তুক করতে পারবি—তুই এখন ডাইনী—

সেদিন রাত্রে আর বাড়িতে ফিরে আসি নি। টটসাভানির কাছেই ঘুমিয়েছিলাম। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। লক্ষ্য করলাম—দরজার বাইরে আলোর ক্ষীণ রেখা। কৌতূহলী হয়ে বাইরে এসে দেখেছিলাম, দুটো আশ্চর্য জিনিস। কিন্তু কি সেই জিনিস দুটো তা আমি বলতে পারবো না—আর আমি জানিও না।

পরদিনই আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। টটসাভানি বলল, তুই ডাইনী হতে চলেছিস। এই সময় অসুখবিসুখ করে। অসুস্থ হওয়া মানেই জানবি যার ওপরে ডাইনীবিদ্যা প্রয়োগ করবি তার মৃত্যু অনিবার্য—

এই ডাইনীতে দীক্ষিত হওয়ার কয়েকমাস পর আমি চিন্দাভাকে বিয়ে করেছিলাম। দেড় বছর পরই আমার একটি ছেলে হলো। নাম রাখলাম—মাচাঞ্জা। ছয়মাস বয়স হতে না হতেই মাচাঞ্জার অসুখ হলো। দিনরাত কাঁদতো চিলের মত চিৎকার করে। একদিন মরে গেল। টটসাভানির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম। টটসাভানি অনেক ভেবে চিন্তে বলল, কোন ডাইনী তোর ছেলের ওপর নজর দিয়েছিল।

আমি কিছুই বললাম না। বোধহয় ডাইনী হওয়ার আনন্দে উত্তেজনায় ছেলের শোক ভুলে গিয়েছিলাম।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল অনেকগুলো বছর। ছয় ছেলেমেয়ের মা হলাম। ডাইনীবিদ্যায় যেমন দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম তেমনি আসামী ডয়াকেও তুকতাকের মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়ে তাকেও ডাইনী তৈরি করেছিলাম।

টটসাভানি।

ডয়া।

আমি।

গভীর রাতের ঘন কালো অন্ধকারে আমরা তিন ডাইনী—তিন প্রেতিনীর মত প্রায়ই নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়তাম। আমরা যেতাম হায়েনার পিঠে চড়ে। উদ্দেশ্য একটাই—ডাইনীবিদ্যা প্রয়োগ করে মানুষের ক্ষতি করা আর ডয়াকে আরও ভালো করে ট্রেনিং দেওয়া।

সেদিন আমাদের লক্ষ্য ছিল—আমার স্বামী—চিন্দাভা। বুড়ো বিয়ের পর বিয়ে করে চলেছে। আমিই তিন নম্বর। তারপরেও আছে আরও তিনজন। শোনা যাচ্ছে, বুড়ো না কি আবার সাতনম্বর নিয়ে আসার তোড়জোড় করছে। আরও কত মেয়ের সর্বনাশ করবে কে জানে—অতএব ওই বুড়ো শয়তানকে সাবাড় করতে হবে—

আমরা পা টিপে টিপে বুড়োর ঘরের পিছনে দাঁড়ালাম। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে চিন্দাভা চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। একটু ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। আসামী আমার স্বামীর মাথাটা ঠেসে ধরেছিল। আমি পাদুটো আর টটসাভানি তার মুখের ভেতরে ঢেলে দিয়েছিল মাহেও (মিষ্টি ঝাঁঝালো মদ) তার ভেতরেই মন্ত্রপূত ওষুধ ছিল। সেই ওষুধ মেশানো মাহেও আরও খানিকটা চিন্দাভার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম।

তিনদিন পর চিন্দাভা মারা গেল।

গাঁয়ের লোক জানল, বুড়োর হাঁফানী ছিল। সেই অসুখেই মারা গিয়েছে।

মাটি খুঁড়ে কবর দিয়ে চলে গেল প্রতিবেশীরা।

রাত্রি যেই নিশুতি হয়ে গেল, অমনি আমরা তিন ডাইনী, ডয়া বা এই মামলার আসামী, আমি আর টটসাভানি—চলে এলাম গোরস্থানে। কবর খুঁড়ে চিন্দাভার মৃতদেহ বের করলাম। তার গায়ের ধুলোমাটি ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করলাম। তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে তার দেহের কয়েক টুকরো মাংস কেটে নিলাম। লাশ আবার কবরের ভেতরে যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে রেখে আমরা যে যার বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম।

পরদিন টটসাভানির বাড়িতে সেই মাংস রান্না করে খেয়েছিলাম আমরা। খেতে খুব সুস্বাদু। At the hut we cooked the meat and ate it, it was good··

এই ঘটনার পর হঠাৎ আসামী আর আমার বাড়িতে এল না। আমার খুব দুশ্চিন্তা হলো। শরীরটরির খারাপ হয় নি তো?

প্রথমে গেলাম তার শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে নেই ডয়া। তারা বলল, আমার সতীন, অর্থাৎ ডয়ার মা কয়াসির কাছে আছে ডয়া! কয়াসি তখন তার বাপের বাড়ি মেরেন্দায়।

মেরেন্দায় গেলাম ডয়াকে দেখতে। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল ডয়া—দেখ তো আমার বাচ্চার কি হলো কিছুতেই বুকের দুধ টানতে পারছে না—

আমার মাঠের ডেরায় যাস বাচ্চাকে নিয়ে। চেষ্টা করে দেখবো, কিছু করতে পারি কি না। এই বলে আমি চলে এসেছিলাম। আসার আগে আমার দিদি, কয়াসি আমাকে মিষ্টি মদ খেতে দিয়েছিল। কিন্তু কেন যেন কোন কথা বলল না। আমি জানি—ডয়ার এবং আমার এই ডাইনীবিদ্যার চর্চা কখনো ভাল নজরে দেখতে পারে না কয়াসি। যাইহোক—

ডয়া কিন্তু বাচ্চা নিয়ে এল না আমার কাছে। আমার মনে হলো ওর মা-ই আসতে দেয় নি। যাক—যা খুশি করুক।

একদিন মাঠের কাজ শেষ করে ফিরে এসে দেখি, আসামী এবং তার মা, কয়াসি চুপ করে বসে আছে আমার ঘরের দাওয়ায়। কয়াসির কোলে তার নাতি চিৎকার করে কাঁদছে—

আমাকে দেখেই নাতিকে মেয়ের কোলে দিয়ে চলে গেল কয়াসি। আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না।

আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে তো? আমার হাত দুটো ধরে কান্নায়

ভেঙে পড়ল ডয়া।

কাঁদিস না আজ রাত্রে থাক তো আমার কাছে, আমি বললাম, দেখি কি করতে পারি—

রাত্রি গভীর হলো। ডয়া কোলের কাছে বাচ্চা নিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমার পাশে আমার তিন ছেলে সানি, ওয়ানি আর মুজিওয়া। পলে পলে রাত যত নিশুতি হতে লাগল, ততই নিশাচরী ডাইনীদের সেই নৈশ অভিযানের নেশা আমার চেতনার ভেতরে তীব্র একটা জ্বালা ছড়িয়ে দিতে শুরু করল।

নিশি পাওয়া মানুষের মত উঠে এলাম। মাতালের মত টলতে টলতে এলাম ঘুমন্ত আসামীর কাছে। বাচ্চার গায়ে দুধ দুধ গন্ধ। উঃ কতদিন যে বাচ্চা ছেলের মাংস খাই নি। আর এই ছেলের ওপরে তো ডাইনীর নজর পড়েছে—ওকে তো খুন করতেই হবে।

আমি খুব আস্তে ছেলেটাকে টেনে তুললাম। ডয়া জেগে উঠেই ছিনিয়ে নিল ছেলেকে। আমি ধরলাম ছেলেটার পা দুটো। ডয়া ধরল হাত। শুরু হলো ধ্বস্তাধ্বস্তি। সেই ঘরের ঘুটঘুটি অন্ধকারে দুই হিংস্র বাঘিনীর মত কতক্ষণ লড়াই করেছিলাম, বলতে পারবো না। কেন—এসব করেছিলাম, তাও বলতে পারবো না। এখন মনে হয় কোন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্নের মত হয়ে হয়তো এসব করেছিলাম। আবার এমনও হতে পারে আসামীও আমার মত ডাইনী বলেই নিশ্চয়ই জানে, তার বাচ্চাকে ডাইনীর প্রভাব থেকে মুক্ত করে সুস্থ করে তুলতে হলে, এই বাচ্চার দেহের খানিকটা মাংস কেটে যে ডাইনী ওর চিকিৎসা করবে তাকে খেতে হবে। তাই হয়তো আমার মত সেও বাচ্চাকে চেয়েছিল।

শিশু—হোক না আসামীর নিজের পেটের ছেলে, কচি ছেলের মাংসের প্রতি লোভও থাকতে পারে—এই মামলার তদন্তের রেকর্ডে লিখছে, মুহালভা স্পষ্টই বলেছিল, We faught for the child. We wanted to bewitch the child, so it would die, we wanted to eat it……

আরও বলেছিল মুহালভা, যাইহোক সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল স্বপ্নের মত। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে টানাহ্যাঁচড়ার সময় কিন্তু আসামীর ছেলে একবারও মাটিতে পড়ে যায় নি। আসামীর সঙ্গে আমি পারলাম না। ডয়া তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে রইল আমার দরজার গোড়ায়। ছেলের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছিল।

কিন্তু বেচারী ডয়া বুঝতেই পারে নি তার ছেলে মারা গেছে।

আমার সামনেই ওর ছেলের বুকের ধুকধুকি থেমে গিয়েছিল।

মরা ছেলেকেই আদর করছিস! আসামীর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলেছিলাম।

কিছুই বলল না ডয়া। কেমন উদভ্রান্তের মত আমার দিকে তাকিয়ে আবার ছেলের বুকের ভেতরে মুখ গুঁজে রইল। তখন ভোর হয়ে এসেছে। কাক ডাকছে কা—কা—করে।

শোন ডয়া, মরা ছেলে তো বাড়িতে রাখা যাবে না, আসামীর মাথায় হাত রেখে আমি বলেছিলাম, তুই থাক—আমি নেম্বুরোকে খবর দিতে যাচ্ছি—বলেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

ফিরে এসে দেখি, বাড়ির সামনে ডুকরে কাঁদছে আমার ছেলে দুটো। আমি চিৎকার করে বললাম—কি—কি হয়েছে তোদের—

ওরা আঙ্গুল দিয়ে ঘরের দিকে ইসারা করল। ছুটে ঘরে যেয়ে দেখি, তাল তাল জমাট কালো রক্তের ভেতরে পড়ে আছে আমার ছোট ছেলে সানি। মাথাটা থেঁতলে গিয়েছে! কয়েকটা আরশোলা চেটে চেটে খাচ্ছে সেই রক্ত।

আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সত্যি সত্যিই সানি মারা গিয়েছে কি না। এখনও তার প্রাণটা ধুকধুক করছে কি না—কাছে গিয়ে দেখতে আর পা উঠল না। আমার সারা শরীর যেন অসাড় হয়ে গেল।

মনে হল, ডয়া তো ডাইনী—সে আমার ছেলেকে তো অনায়াসেই মন্ত্রতন্ত্র করে তুক করতে পারতো—ভারি কাঠ দিয়ে অমন করে পশুর মত ওর মাথাটা থেঁতলে দিল কেন? আমি তো ওর ছেলেকে খুন করি নি—

এই মামলাটিরও পরিণতি জানা যায় না।

এই যে কচি ছেলের তথা নরমাংস ভক্ষণ, হায়েনার পিঠে সওয়ার হয়ে নৈশ অভিযান, বিষাক্ত সাপের চামড়া, কুমীরের হৃদপিণ্ড ইত্যাদি দিয়ে মন্ত্রপূত ওষুধ তৈরি করা—ডাইনীদের এই বীভৎস ও অকল্পনীয় কার্যক্রমের বিচিত্র এক একটি জবানবন্দীর কতটুকু সত্য—এ প্রশ্ন সকলের মনে ঘনিয়ে আসবেই। তাই এ-পর্যন্ত বর্ণিত প্রতিটি ডাইনী সংক্রান্ত মামলার রোমাঞ্চকর কাহিনী যে-গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে—সেই "উইচক্র্যাফট অ্যাণ্ড সরসারি ইন রোডেশিয়া"—বইটির বিদগ্ধ লেখক জে. এ. ক্রফোর্ড সাহেব কি বলেছেন, সেটা তাঁর জবানীতেই বলা দরকার—In this work, I have attended to the study beliefs in Wizardly and also the part played in African Soceity in Rodesia by the allegation of Wizardly during the

years 1956 to 1962 অর্থাৎ এই গ্রন্থে আমি—ডাইনীবিদ্যার প্রতি অপরিমেয় বিশ্বাস এবং সেই নিবিড় ও অন্ধবিশ্বাস আফ্রিকার রোডেশিয়া সমাজে কি ভূমিকা পালন করে চলেছে, তারই বর্ণনা দিয়েছি। ডাইনী সন্দেহে অভিযোগের এই মামলাগুলির সময়কাল ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২।

'উইজার্ডরি' বলতে আমি—আরও বলেছেন ক্রফোর্ড, বোঝাতে চেয়েছি, ডাইনীবিদ্যা বা যাদুকরী কিংবা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা। আর এইসব মামলার বিচিত্র এক একটি ঘটনার 'সোরস' বা উৎস হলো, রোডেশিয়ার অ্যাটর্ণি জেনারেলের দপ্তরের জুডিশিয়াল বা বিচারবিভাগীয় নথিপত্র। অতএব—

বিভিন্ন কেসের ডাইনীদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার দীর্ঘ এক একটি জবানবন্দীর এক বর্ণও মিথ্যা বা কল্পিত নয়। আর এইসব মামলার বাদীবিবাদী অর্থাৎ কুশীলব—নেটসেয়ি, পুনে, ম্যাজউইটা, টটসাভানি, মিডিজিলা, নিউম্না প্রমুখরা কারা? সে সম্বন্ধেও বলেছেন ক্রফোর্ড—

এরা প্রত্যেকে দক্ষিণ আফ্রিকার তথা দক্ষিণ কঙ্গোপ্রদেশের রোডেশিয়ার সোনা, এনডেবলেফ এবং কালাঙ্গা ইত্যাদি বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসী। এ পর্যন্ত বর্ণিত প্রতিটি রমণী—উপজাতি সোনা শ্রেণীর। সোনারা ইউরোপীয় প্রশাসনের কাছাকাছি এবং সভ্য, ভদ্র সমাজের নাগালের ভেতরে বাস করে বলেই এদের অন্ধকুসংস্কার থেকে উদ্ভূত আদিম কার্যকলাপের বৃত্তান্ত জানা যায়। কিন্তু এনডেবলেফ, কালাঙ্গা এবং জেজারু প্রভৃতি আদিবাসীরা অরণ্যসমাচ্ছন্ন প্রদেশের এত নিভৃতে বাস করে যে এদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। গভীর অরণ্যের কালো অন্ধকারে তারা নিশ্চয়ই যাপন করছে, প্রাথমিক জীবন! এবং আরও বীভৎস—আরও আদিম আরও ভয়ঙ্কর জীবনধারার ভেতরেই তলিয়ে আছে—তাদের খবর কেউ জানতে পারে নি! কে জানে—

জানা যাবে কি না?

সোনারা আজকাল একটু লেখাপড়া শিখছে। শহরে এসে রেলে, স্টিমারে, বাসে কিংবা বাড়িতে বিভিন্ন জীবিকায় লিপ্ত আছে। কিন্তু—

তবুও শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগ-যুগান্তর ধরে সোনাদের যাদু-ইন্দ্রজাল-ডাইনীতত্ত্ব ইত্যাদিতে এমন নিবিড় বিশ্বাস, যে সোনা শ্রেণীর মানুষ লেখাপড়া জানলেই বা কি আর চাকরিবাকরি করলেই বা কি? তাদের আজও সন্দেহ করা হয় 'উইচ' বলে। এই প্রসঙ্গেই একটি ঘটনা এখানে বলা হলো—

ছয়

শহুরে শ্রমিক নেতারা ও মালিকপক্ষও ডাইনীবিদ্যার প্রতি অন্ধবিশ্বাসটাকে কাজে লাগিয়েছিল।

রাত নেমেছে ঘন হয়ে।

নিশুতি রাতের নিথর স্তব্ধতার ভেতরে তলিয়ে গেছে কয়লার খনি অঞ্চলের ছোট শহর—ওয়ানকি। দূরে—বহুদূরে খনির আলোগুলো ঘন অন্ধকারে আগুনের ফুলের মত ফুটে রয়েছে। আর কয়লাখনির বিপরীত দিকে শহরের আর একপ্রান্তে রোডেশিয়া রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের বিশাল প্রাঙ্গণ অন্ধকারে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। কম্পাউণ্ডের চারিদিকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন ইলেকট্রিকের আলোগুলো শকুনের ঘোলা চোখের মত জ্বলছে।

কম্পাউণ্ডের বাঁ দিকে রেলওয়ে ইয়ার্ড। সেখানে ইঞ্জিনসেডে অকেজো ইঞ্জিনগুলো অন্ধকারে এক একটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাত্রির হৃদপিণ্ডের মত ঘুস ঘুস ধ্বনি তুলে নিঃসঙ্গ একটা ইঞ্জিন সান্টিং করে চলেছে।

খট্-খট্-খট্ ভারী বুটজুতোর কর্কশ আওয়াজ তুলে টহল দিচ্ছে অ্যাসিসট্যাণ্ট হেড পুলিশ কনস্টেবল সোয়ানি। সে রেলইয়ার্ড ছাড়িয়ে ইউরোপীয় অফিসারদের কোয়ার্টারগুলো পেরিয়ে চলে এল কয়লার ঘেস দেওয়া চওড়া রাস্তাটার ওপরে। সেখানে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে খরচোখে তাকিয়ে রইল রাস্তার ওপারে বস্তির ঝুপড়ি ঘরগুলোর দিকে।

হ্যাঁ। ঠিক যা ভেবেছে তাই! বস্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তিনটি ছায়াদেহ। তিনসঙ্গী। গায়ে গা দিয়ে তারা এগিয়ে চলল রেলপুলিশের ব্যারাকের দিকে। তাদের ছোট স্কার্ট, পাতলা জামার আড়ালে পরিস্ফুট উগ্র যৌবনের পসরায় আমন্ত্রণের হাতছানি।

সোয়ানির মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের ভেতরে বদমায়েস মাগীরা রীতিমত ব্যবসা শুরু করেছে। দ্রুত পায়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগল আফ্রিকার প্রাচীন মৃত্তিকার কৃষ্ণকায় সন্তান—সোয়ানি—

এই—একজন আসছে রে।

দেখ—আবার পকেট ফুটো কি না—বলেই খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ে আবার হাসির রেশ টেনে বলল, আমার কাছে বাবা ওটি হচ্ছে না—ফেল কড়ি মাখো তেল—

যা, না—হাত ধরে টেনে মিনসেকে নিয়ে যেয়ে ঘরে তোল। তারপরেই দেখবি বিছানা খুঁজবে, আবার হাসির ঝরণা কলকল করে উঠল।

বাতাসে ভাসছে রাত্রির অপ্সরীদের দেহের সুগন্ধ। সোয়ানির মনে হল, সে যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্নের ঘোরে চলেছে—

এই কি করছো—কি করছো, একটা লোকের চাপাগলার চিৎকারে আচ্ছন্নতা কেটে গেল সোয়ানির। তাকিয়ে দেখে—অদ্ভুত দৃশ্য! বেশ্যাদের একজন পথচারী লোকটার বুকের ওপরে মাকড়সার মত ঝুলছে। আর ফিসফিস করে বলছে দোহাই—তোমার—তুমি আপত্তি করো না। চল—যতক্ষণ খুশি থাকবে, মেয়েটির কথাগুলোর ভেতরে কেমন করুণ হাহাকার ফুটে উঠল।

এই—ও—কি হচ্ছে এসব, বাজখাই গলায় চিৎকার করে উঠল রোডেশিয়া রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের অ্যাসিসট্যান্ট হেড পুলিশ কনস্টেবল সোয়ানি।

মুহূর্তে ভানুমতীর কুহকের মত অন্ধকারে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল তিন দেহজীবিনী। আর লোকটা একবার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অতিকায় দৈত্যের মত সোয়ানির দিকে তাকিয়েই দৌড়ে পালিয়ে গেল।

রেলের সীমানার ভেতরে এসব কী যে কাজ কারবার চলছে আজকাল, নিজের মনেই গজ গজ করতে লাগল সোয়ানি। আবার মনে হল—হবে না হবেই তো এসব, সাদা চামড়ার সাহেবরা যে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

খট্-খট্-খট্—আবার বুটজুতোয় শব্দ তুলে পেট্রোল দিতে শুরু করল সোয়ানি। চকিতে তার মনে হল, মেয়েটি যাকে জাপটে ধরেছিল সে লোকটা কে! তার দিকে একবার তাকিয়েই অমন দৌড়ে পালিয়ে গেল কেন? নষ্ট মেয়েগুলোর আশেপাশে যখন ঘুরঘুর করছিল তখন বুঝতে হবে লোকটা সুবিধের নয়—

ব্যাটা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

উপরি পয়সা একটা ছোঁবে না। আরে বাপু, তোর না হয়—না নিলে চলে কিন্তু আমাদের—

পুলিশব্যারাকে সোয়ানির আড়ালে আবডালে কথা হয়। কিন্তু সোয়ানির কানে এসব কথা এক আধটু যে যায় না—তা নয়। সে এসব কথায় ভ্রূক্ষেপই করে না।

আরো একদিন। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল। সোয়ানি বর্ষাতি গায়ে চড়িয়ে টহল দিচ্ছে। বিষ্টি-বাদলার রাত। আটটা বাজতে না বাজতে চারিদিক

নিশুতি হয়ে গিয়েছে।

খট্‌-খট্‌-খট্‌ কংক্রীটে বাঁধানো রোডেশিয়া রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের বিশাল উঠানে বুটজুতোর আওয়াজ উঠছে। বিশ্রী শব্দটা তার নিজের কাছেই অস্বস্তিকর লাগছিল।

দূরে সাহেব বা ইউরোপীয় অফিসারদের কোয়ার্টারের বিশাল বাড়িটা অন্ধকারে আকাশের গায়ে আঁকা ঘন ছবির মত মনে হচ্ছে। ঘরে ঘরে জানালা বন্ধ। কোন দরজা কি জানালা দিয়ে এক চিলতি আলোর রেখাও দেখা যাচ্ছে না। সাহেবসুবো মানুষ। আরামের শরীর। সকাল সকাল ডিনার সেরে শুয়ে পড়েছে! সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে রক্তচোষা ভ্যাম্প্যায়ারের জাত ওই ইংরেজরা এসেছে তাদের দেশটাকে শোষণ করতে। আর—

শুধুই কি শোষণ? এক একটা সাহেব কূটবুদ্ধির ডিপো। তাদের এই ওয়ানকি ব্র্যাঞ্চের রোডেশিয়া রেলওয়েজ আফ্রিকান ওয়ার্কারস ইউনিয়নে তাদের স্বদেশীয় শ্রমিকদের যত রেশারেশি আর হিংসা বিদ্বেষের মূলে ওই সাহেবরা। কখনো জাম্বিয়ার মিউজিজুরদের (আফ্রিকার জাম্বিয়াপ্রদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়) আবার কখনো বা অ্যাঙ্গোলার সোনাদের কানে মন্ত্র দিয়ে শ্রমিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছে। আর শালা তাদের দেশের মানুষগুলো এমন বুদ্ধু সাহেবদের এই কুটিল বুদ্ধির মারপ্যাচ একেবারেই বুঝতে পারে না। হয়তো বুঝতে চায়ও না—

এই—ও—কে—কারা ওখানে? বাজখাই গলায় চিৎকার করে উঠল সোয়ানি তার যেন মনে হল, দূরে রেলইয়ার্ডের একেবারে শেষের দিকে মালগাড়ির দলছুট বগীটার নিচে কালো কালো ছায়ার মত কারা যেন ঘোরাফেরা করছে, নিশ্চয়ই শালারা হয় কোন ওয়াগন ভাঙার মতলব করছে—না হয় মদ চোলাই করার তোড়জোড় করছে। সঙ্গে সঙ্গে তীরের মত ছুটল সোয়ানি। কিন্তু—

কোন লাভ হলো না। তার পায়ের বুটজুতোর শব্দ শুনেই অন্ধকারে ছায়াবাজির মত মিলিয়ে গেল চোলাইদাররা। চোলাইয়ের হাড়িকুঁড়ি আর অ্যালুমিনিয়ামের জারের ভেতরে রাখা পাঁচ গ্যালন বেআইনী মদ সিজ করে নিয়ে এল থানায়।

আবার একদিন রোডেশিয়া রেলের কয়েকজন কর্মী কোন চায়ের দোকানের পিছনে বসে নাকি ফ্ল্যাস বা জুয়া খেলছিল। তাদের নামে থানায় রিপোর্ট করে দিল সোয়ানি। একবার মুহূর্তের জন্য চিন্তাও করল না, তারা তার সহকর্মী।

সেইদিনই রাত্রে রোডেশিয়া রেলওয়েজের আফ্রিকান ওয়ার্কারস ইউনিয়নের অফিসে গোপন জরুরী মিটিং বসল। এখানে বলা দরকার, রেলকর্মীরা তাদের ইউনিয়নের কমিটিতে রোডেশিয়া রেলে কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের সভ্য নির্বাচিত করে কিন্তু চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হবেন দুইজন ইউরোপীয় তথা ইংরেজ। অবশ্য কমিটিতে সাধারণ সভ্যও থাকতে পারে শ্বেতকায়রা। ইউনিয়নের কমিটিতে নির্বাচিত সভ্যরাই ওয়ানকির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলে গণ্য হয়ে থাকে।

তাহলে মিটিং শুরু করা যাক, গম্ভীর হয়ে বললেন চেয়ারম্যান অ্যাবনার ফিরি। তিনি ইংরেজ এবং শ্বেতকায় বলেই প্রচণ্ড দাম্ভিক। ঘৃণা করেন কৃষ্ণকায়দের। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে আবার রাগে গর গর করতে করতে বললেন—ওই ব্ল্যাকি ডগ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড পুলিশ কনস্টেবলটা খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে—সেই ব্যাপারেই তো এই মিটিং—তাই না—

ইয়েশ স্যার—বললেন ভাইস-চেয়ারম্যান মরিসন কামানগা, এই প্রসঙ্গে লেবারার নগুলুম্বি কিছু বলতে চায় স্যার—

অলরাইট—বলতে বলুন—

স্যার আমি কচেনজেলা হেড পুলিশবয় এবং আরো দুইজন বসে তাস খেলছিলাম। হঠাৎ সোয়ানি কোথা থেকে ঝড়ের মত ছুটে এসে আমরা রেলকমপাউণ্ডের চৌহদ্দীর ভেতরে ফ্ল্যাস খেলছি বলে থানায় রিপোর্ট করে দিল—একটু থেমে আবার বলল সিমন নগুলুম্বি থানায় আমাদের খুবই হ্যারাস করছে স্যার—

কি! বাঘের হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন অ্যাবনার, রেলকমপাউণ্ডের অথরিটি আমরা—আমাদের না বলে সোয়ানি পুলিশে রিপোর্ট করে কেমন করে—হঠাৎ থেমে গেলেন চেয়ারম্যান। ভাইস-চেয়ারম্যান মরিসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গুজগুজ করে বলল কতগুলো কথা। মরিসনের মুখখানা কঠোর হয়ে উঠল। নিচু গলায় বলল, লিকার ডেন বন্ধ করে দিয়েছে—তাড়িয়ে দিয়েছে প্রসটিটিউট গার্লদের। আমাদের মানথলি মোটা রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে—একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় স্যার—

ডোণ্ট বি ইমপেশাণ্ট মিঃ মরিসন। অ্যাবনার চোখের কোণা দিয়ে তাকালেন মরিসনের দিকে। উঁচু গলায় সভাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ব্ল্যাকি ডগ সম্বন্ধে আর কেউ কিছু বলবেন?

কোসাকা উঠে দাঁড়ালো। সে রোডেশিয়া রেলে সিনিয়র ক্লার্ক এবং

ইউনিয়নের এক সাধারণ সভ্য। কোসাকা জাম্বিয়ার অধিবাসী। মোটামুটি শিক্ষিত হলেও দৈত্যদানব ভূতপ্রেত মন্ত্রতন্ত্রে সহজাত পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস তার রক্তে রক্তে প্রবহমান।

ইয়েস—মিঃ কোসাকা—বলে ফেলুন, চেয়ারম্যান অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

স্যার আমি দেখেছি, হার্টলের ওই মেজিজুরটা (সোনিয়া যে সম্প্রদায়ের আদিবাসী) গভীর অন্ধকার রাত্রে রেলওয়ের কমপাউণ্ডের শানবাঁধানো উঠানে পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়ায়। কোসাকা থেমে যায়। মাথা নিচু করে নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে আবার আস্তে আস্তে বলে, ছুটতে ছুটতে বিড়বিড় করে বকে—

আপনারই তো দেশওয়ালী ভাই। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন চেয়ারম্যান, কেন ওরকম করে সে সম্বন্ধে কখনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাকে?

হ্যাঁ স্যার, উদ্দীপ্ত হয়ে বলে কোসাকা, একবার নয়—অনেকবার। সোয়ানি বলে সে কমপাউণ্ডে ঘুরে ঘুরে কুকুর তাড়াচ্ছে—

স্ট্রেঞ্জ। অস্ফুটস্বরে বলেন অ্যাবনার, কুকুর বলতে কি মীন করছে ওই ব্ল্যাকিটা?

স্যার, খুশিতে গদগদ হয়ে বলে আর এক কৃষ্ণকায় মানুষ কোসাকা, স্যার সোয়ানি হার্টলের মিউজিজুর ট্রাইবের লোক—ওরা অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে—উইচক্র্যাফট—

হোয়াট—উইচ! তীব্র উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রোডেশিয়া রেলওয়েজ আফ্রিকান ওয়ার্কারস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অ্যাবনার। যে কোন কারণেই হোক ব্ল্যাক নিগারটা বিপজ্জনক—ওকে যেমন করে হোক ওয়ানকি থেকে সরিয়ে দিতে হবে—কিন্তু—কেমন করে?

মিঃ কোসাকা, চেঁচিয়ে বললেন ভাইস-চেয়ারম্যান মরিসন। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন—সোয়ানি উইচ!

কোন কথা বলল না কোসাকা। কুকুরের কান্নার মত ঘেঙিয়ে হেসে বলল, একটু সবুর করুন স্যার—হাতে নাতে প্রমাণ পেয়ে যাবেন—

বেশি দিন দেরি করতে হলো না।

এই জরুরী গোপন মিটিং-এর পর তিনমাস যেতে না যেতে রোডেশিয়ার দৈনিক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো একটি চাঞ্চল্যকর খবর—

On 30enth May, 1957 Kachenjela, a senior police-boy of Wanki branch of Rhodesia Railways died mysteriously. অর্থাৎ ৩০শে, মে ১৯৫৭, রোডেশিয়া রেলওয়েজের ওয়ানকি শাখার সঙ্গে যুক্ত সিনিয়র পুলিশবয় কাচেনজেলার রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। খবরে আরও জানিয়েছে—রেলের ইউরোপীয় অফিসারদের কোয়ার্টারগুলো ছাড়িয়ে কয়লার ঘেস বিছানো রাস্তাটার ওপরে বস্তির ঝুপড়ী ঘরগুলোর পিছনে একটা নর্দমার ভেতরে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। তার দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় নি! ময়নাতদন্তের জন্য তার মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে—

আলোড়িত হয়ে উঠল ওয়ানকির রেল কলোনী। চায়ের দোকানে, পথেঘাটে লোকের মুখে মুখে গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল—

—বস্তি থেকে পুলিশ ব্যারাক খুব দূরে নয়। কিন্তু নিশিরাত্রে ওখানে কি করতে এসেছিল কাচেনজেলা?

—নিশির ডাকেই ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে আসে নি তো?

দু'একদিন পরেই পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেল। আর সেই রিপোর্ট পেয়ে আরও চঞ্চল—আরও উত্তেজিত ও ভীত হয়ে উঠল রেলকম্পাউণ্ডের বাসিন্দারা। রিপোর্টে লিখেছে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে কাচেনজেলাকে—

—গলা টিপেই যদি হত্যা করা হয়ে থাকে—গলায় হাতের ছাপ কোথায়?

—সারা রাত কম্পাউণ্ডে আর্মড নাইটগার্ড থাকে—খুন হয় কি করে? তাহলে আর রেলকম্পাউণ্ডে বাস করার নিরাপত্তা কোথায়।

মৃত্যুটা রহস্যই থেকে গেল। কটা হত্যাকাণ্ডের রহস্যেরই বা কিনারা হয়? আর অত্যন্ত কর্মব্যস্ত চলমান জীবন খুনের আড়ালে অজানা কার্যকারণ নিয়ে বেশিদিন মাথাও ঘামায় না। এখানেও তাই হলো।

যথারীতি মর্গ থেকে লাশ এল। রেলকর্মীরা মৌন শোভাযাত্রা করে মৃতদেহ নিয়ে এল কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সমাধিভূমি বা আফ্রিকান সিমেট্রিতে। কাচেনজেলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন চলছে। পাদ্রীসাহেব এসেছেন। কবরের মাটি খোঁড়া হচ্ছে। আর দূরে বাঁশঝোপের নিচে একটা পাথুরে মূর্তির মত বসে আছে সোয়ানি। মনের গহনে নেমে আতিপাতি করে খুঁজছে—কে বা কারা খুন করতে পারে কাচেনজেলাকে—

গুটি গুটি এগিয়ে এল তার দিকে কোসাকা। সোয়ানির দিকে তীক্ষ্ণ আর জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, তুমি—তুমিই গুণমন্তর কিছু করে কাচেনজেলাকে খুন করেছ—তুমি—তুমি উইচ—

এসব কি বলছেন আপনারা—আমি—আমি ডাইনীবিদ্যার কিছু—কিছুই জানি না—আরও কত কথাই বলতে চেষ্টা করল সোয়ানি। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। কোসাকার প্রায় পিছু পিছুই এল ইউনিয়নের বিশিষ্ট আর এক কর্মী নাজাম্বানি। এল আরও অনেক—অনেক লোক। তারা সোয়ানিকে ঘেরাও করে একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল—তুমি উইচ—উইচ—হার্টলের মিউজিজুরুরা তুকতাক জানে—

সোয়ানি ছুটে পালিয়ে গেল।

৩রা জুন ১৯৫৭। ওয়ার্কারস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অ্যাবনার ফিরি মিটিং ডাকলেন। প্রকাশ্য সভা। অ্যাবনার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বেশি কিছু বলার নেই—আপনারা জানেন, কাচেনজেলার মৃত্যুর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমার ধারনা হার্টলের মিউজিজুরটা—সেই সোয়ানি—কোন গুণমন্তর—

হ্যাঁ-হ্যাঁ—সোয়ানি উইচ উইচ—সমবেতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল জনতা।

শুনুন ভাইসব, উঠে দাঁড়ালো মরিশন, একটা কাগজ উঁচিয়ে বলল, আশা করি চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে আপনারা এক মত। সোয়ানি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমরা মারা পড়বো। He will finish us—অতএব—আপনারা এই দরখাস্তে (যেখানে সোয়ানিকে ট্রান্সফারের আবেদন করা হয়েছে) সই করুন—

কে আগে সই করবে বলে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সেইদিনই সন্ধ্যায় এরিয়া কন্ট্রোলারের অফিসে (ইউরোপীয় পরিচালিত রোডেশিয়া রেলওয়েজের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ) জয়েন্ট পিটিশন পাঠানো হলো।

দুদিন পর।

এল সোয়ানির ট্রান্সফার অর্ডার। তাকে বদলী করা হলো উমটালিতে।

তল্পিতল্পা নিয়ে স্টেশনের দিকে চলে যেতে যেতে রেলকম্পাউণ্ডের সেই শানবাঁধানো মাঠে এসে কেন যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সোয়ানি। দূরে ইউরোপীয় অফিসার কোয়ার্টারের পরে ঝুপড়ী বস্তির ছোট ছোট ঘরগুলোর দিকে চোখদুটোর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। তার মনে হলো সেদিন রাত্রে বেশ্যা মেয়েগুলোর সঙ্গে যাকে দেখেছিল সেই লোকটা কাচেনজেলার মতই লম্বা চাঙ্গা! ওই নষ্ট মেয়েগুলো আর কোন খদ্দের কি তাদের দালালও কাচেনজেলাকে খুন করতে পারে। তাছাড়া কাচেনজেলা ছিল পয়লা নম্বরের মাতাল এবং জুয়াড়ী। অন্ধকারের জগতে যাদের আনাগোনা তাদের শত্রুর অভাব হয় না। তাকে মিছিমিছি 'উইচ' বলে তার ঘাড়ে সব দোষ না চাপিয়ে

দিয়ে কাঁচেনজেলার পঙ্কিল জীবনের কথা একবারও কেউ ভাবল না? আসলে এসব কিছু নয়। এসব তাকে এখান থেকে বদলী করার ছুতো। সে বন্ধ করে দিয়েছিল মদচোলাই, জুয়াখেলা, মেয়েদের দেহব্যবসা, রেল কম্পাউণ্ডের এলাকায় সব সমাজবিরোধী কাজকারবার। তাই সে কর্তাদের এবং সহকর্মীদেরও চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যই তাকে চলে যেতে হচ্ছে—

এই ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে পাশ্চাত্যের ডাইনীবিছার বিশেষজ্ঞ রবার্ট ব্লক বলেছেন—It is a case of economic competition and raciaal indiscrimation—এটা ডাইনীবিছার মামলাই নয়—আর্থিক প্রতিযোগীতা (ইউরোপীয় অর্থাৎ শ্বেতকায় অফিসারদের অসাধু উপায়ে অর্থরোজগার) এবং বর্ণবৈষম্যের মামলা। আরও বলেছেন—বিনাদোষে ওয়ানকি থেকে বদলী হয়ে যেতে যেতে কংক্রীটে বাঁধানো কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে সোয়ানির বেদনার্ত মনের ভাবনার উপরোক্ত কথাগুলোই সে 'উইচ' বলে মিথ্যা চার্জের বিরুদ্ধে তার জবানবন্দীতে বলেছিল আফ্রিকান ওয়ার্কস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অ্যাবনারকে। কিন্তু—

কোন লাভ হয় নি। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক! এসব বলে সবশেষে ব্লকসাহেব মন্তব্য করেছেন—Here the express purpose of acusation of Wizardly was to secure the removal of Shoniwa···সোনিয়াকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই উদ্দেশ্যমূলক ছিল মিথ্যা সেই অভিযোগ—ডাইনী—উইচ।

সোয়ানির প্রসঙ্গেই ডাইনীবিছার গবেষক মিঃ রবার্ট ব্লক আরও পরিবেশন করেছেন এমন একটি তথ্য—যা ডাইনীবিছার আলোচনায় একান্ত উল্লেখযোগ্য। বলেছেন—ডাইনী হলো অশুভ বা অমঙ্গলের প্রতীক—এবং—

Evil (Witch) is our particular province, our dark domain of *interest*. অর্থাৎ আমাদের যে মন অত্যন্ত কুটিল এবং কালো কুৎসিত অশুভ কিম্বা অমঙ্গলের মূর্ত প্রতীক ডাইনীর জন্ম সেইখানে।

সাত

শুধু আফ্রিকায় নয়—স্মরণাতীতকাল থেকে ইউরোপের দেশে দেশেও চলতো ডাইনীবিত্থার অনুশীলন।

কিন্তু ডাইনীবিত্থার চর্চার ভেতরে যে শুধুই নিরবচ্ছিন্ন অনাচার আর অবাধ যৌনলীলা ছিল—তা নয়, ইউরোপের কোন কোন জায়গায় প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল ডাইনীদের মানুষের অনিষ্টসাধনের বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতাও।

ম্যানচেস্টার থেকে মাত্র চার মাইল দূরে এক বনভূমি। পিনডলবেরি রিজারভ ফরেস্ট। আজ তার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যায় দেশদেশান্তরের ট্যুরিস্টরা।

একশো বছর আগেও এই গভীর জঙ্গল ছিল সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত এবং ডাইনীদের পাপাচারের স্বর্গ। ল্যাঙ্কাশায়ারে বদলি হয়ে এল এক ছোকরা ম্যাজিস্ট্রেট। রজার নোয়েল। সে বিশাল ও সশস্ত্র এক পুলিশবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই বনে। ধরা পড়ল সতেরজন কুখ্যাত ডাইনী। তার ভেতরে একজন—এলিজাবেথ ডেমডাইক। আশি বছরের বৃদ্ধা, গুটিসুতোর মত রেখা আঁকা শুকনো সুঁচালো মুখ। ছোট ছোট দুটো রক্তাভ চোখে কুটিল দৃষ্টি।

সে তার মেয়ে এলিজাবেথ ডিভাইস এবং দুই নাতিনাতনি জেমস আর জেনেটকে নাকি মানুষের চরম সর্বনাশ করার অর্থাৎ ব্ল্যাক আর্টের কলাকৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল।

বুড়ি ডেমডাইকের কাছে শহর থেকে গোপনে নানারকমের লোকজন আসত। যার সঙ্গে শত্রুতা আছে তার কোন মারাত্মক ক্ষতি করতে অনুরোধ করে প্রচুর টাকা পয়সাও দিত।

ডেমডাইকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে গিয়ে আরও বলেছিল জেমস—দিদিমা বেরিয়ে যেতেন নিশিরাতে। সঙ্গে থাকত তার পোষা কুকুর। কালো কুচকুচে তার গায়ের রঙ। বাঘের মত বড়সড়। আমি গোপনে অনুসরণ করে দেখেছি—দিদিমা যার ক্ষতি করতে হবে—তার নাম করে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়ত। আর কুকুরটার লেজে চুমু খেত। বার বার প্রণাম করত। কয়েকদিন পরেই আমরা শুনতে পেতাম সেই শত্রুর পক্ষাঘাত হয়েছে কিংবা কোন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে।

এই সর্বনাশা বিত্থা অত্যন্ত ভাল আয়ত্ত করেছিল তার মেয়ে এলিজাবেথ

ডিভাইস। শুধু দুরারোগ্য ব্যাধি নয়, সে ভবলীলাও সাঙ্গ করে দিতে পারত। তার বিপক্ষে সাক্ষী দিতে কাঠগড়ায় উঠেছিল তারই মেয়ে—জেনেট। মাত্র বার বছর বয়স।

এই খবরদার—কিছু বলবি না মুখপুড়ী। বলবি তো তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। আসামীর খাঁচার ভেতর থেকে ককিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল এলিজাবেথ ডিভাইস। বড় বড় চোখ দুটো দুখণ্ড আগুনের মত চক চক করছিল।

মা-কে সরিয়ে নিয়ে যান—ভয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠেছিল জেনেট, মা এখানে থাকলে আমি একটা কথাও বলতে পারব না।

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আসামীকে।

বলতে শুরু করল জেনেট—মা কিন্তু দিদিমার মত বাইরে কোথাও যেত না। বাড়ির পিছনে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেত সেই কালো কুকুরটাকে। কুকুরটির চারটে পা জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ একটানা মন্ত্র পড়ত মা। মন্ত্র বলা শেষ হলে, কুকুরটি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিত—যার ক্ষতি করতে হবে, তার একটি মাটির মূর্তি তৈরি করতে। মা ভাল ভাল মাটি এনে ওস্তাদ কারিগরের মত অবিকল সেই মানুষটার মূর্তি তৈরি করত।

আশ্চর্য! মা যতক্ষণ ধরে আঙুলে আঙুল খেলিয়ে মূর্তি গড়ত, ততক্ষণ মা-কে কেমন ভূতে-পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন মনে হত; কেমন ঘোর-লাগা দুটো চোখ। গম্ভীর আর কঠিন মুখ। ঠোঁট দুটোও নড়ত। হয়ত মন্ত্র বলত। কিন্তু এত আস্তে বলত, আমরা পাশে দাঁড়িয়ে থেকেও শুনতে পেতাম না।

কুকুরটাও মা-র সামনে ঠায় বসে থাকত। তরমুজের বিচির মতো দুটো খুদে খুদে চোখ জ্বলজ্বল করত—

আশ্চর্য!—তারপর? সরকার পক্ষের উকিল শেষ পরিণতি জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

জেনেট কথা বলে না। মাথা নিচু করে। অস্ফুট স্বরে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, তারপর যে কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যেত, আবার থেমে গেল জেনেট। তীব্র যন্ত্রণার আভাস ফুটে উঠল তার দুটো বড়ো বড়ো আর ভাসা ভাসা নীল চোখে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর আর বীভৎস ঘটনা!

তাড়াতাড়ি বলে ফেল—বিচারক গম্ভীর হয়ে বললেন।

যেই মূর্তি তৈরি শেষ হত, জেনেট বলল, অমনি সেই কুকুরটা ইঙ্গিত করত, মূর্তিটা ভেঙে চুরমার করতে—মা সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটাকে দিত একটা আছাড়।

ভেঙে কুটি কুটি হয়ে যেত মূর্তিটা। মাকে তখন কেমন খুনী খুনী মনে হত। কুকুরটাও ফূর্তিতে লেজ নাড়ত—হঠাৎ থেমে গেল জেনেট। মাথা নিচু করে অস্ফুটস্বরে বলল, কয়েক দিন পরেই আমরা জানতে পারতাম—যার মূর্তি ভেঙে ফেলা হত, সে হঠাৎ হয় মুখ দিয়ে রক্ত উঠে, না হয়, ডুম করে আছড়ে পড়ে মারা গিয়েছে—বলেই চুপ করে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ দু'হাতে বুক চেপে ধরে ককিয়ে চিৎকার করে বলল—ওই কালো কুকুরটাই ডেভিল!—শয়তান কুকুরের রূপ ধরে দিদিমাকে-মাকে চালাত।

স্তব্ধ হয়ে গেল আদালত কক্ষ! এসব ১৮৯০ সালের ঘটনা।

ল্যাঙ্কাশায়ার কোরটের নথিপত্রে আছে এই বিচিত্র মামলার বিশদ বিবরণ। তাতে জানা যায়, এই ডাইনীদের অলৌকিক প্রক্রিয়ায় জনৈক জন রবিনসন এবং আরও দশজন খুন হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার উইচ কেসের রায় দিতে গিয়ে বিচারক বলেছিলেন—ভাই এবং বোন দু'জনেই শপথ করে বলেছিল, শয়তান যখন কুকুরের রূপ ধরে আসত, তখন তারা সেখানে উপস্থিত থাকত!

আরও বলেছিলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত একটা ধূসর রহস্যময় অজানা জগৎ আছে—যেখানকার অনেক অলৌকিক ঘটনার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আট

মধ্যযুগে যেমন তেমনি আজও কোন নির্জন স্থানে গভীর রাত্রে ডাইনী সমাবেশ হয়—সেখানে চলে নারী-পুরুষের অবাধ মিলন।

তাহলে কি ডাইনীবিদ্যার, মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটির কোন অস্তিত্বই নেই? ডাইনীবিদ্যায় অবিশ্বাস এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস একই কথা, জানালেন—'উইচক্র্যাফট প্রোভেন' গ্রন্থের লেখক বহুদর্শী, বৃদ্ধ বিশপ জন বেল।

চারলস রিজ, স্যার আরথার এডিংটন, হেনরি অলকট, মাদাম ব্ল্যাভেটস্কি প্রমুখ অধ্যাত্মবাদীরা প্রত্যক্ষ করেছেন, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন ধারার অস্তিত্ব। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন পরলোকের সূক্ষ্মদেহধারীদের। এবং তাদের বিদেহী আত্মাকে। আত্মার অস্তিত্ব না থাকলে, মৃত্যুরও অস্তিত্ব থাকত না—থাকত না স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য এবং ঈশ্বরের কল্পনা। অধ্যাত্মবাদী বা যোগীরা যেমন পারে মৃত মানুষের ছায়ামূর্তি উপস্থিত করতে, পারে স্থূল-শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীরে চলে যেতে, পারে মুহূর্তে চলে যেতে এক জায়গা থেকে বহু দূরবর্তী কোন কোন জায়গায়, তেমনি পারে অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী ডাইনীরা এবং অনিষ্টকর জাদুবিদ্যা অর্থাৎ ব্ল্যাক আরটের কুশীলবরা! ভারতীয় তান্ত্রিকদের শবসাধনার মতই ডাইনীবিদ্যার সাধনা। কিন্তু সেই বীভৎস আচার প্রক্রিয়ার সুড়ঙ্গ পথেই অনুপ্রবেশ করে বহু পাপ।

এক ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী দ্য ফিলাসট্রিহেয়ারসিবাস ডাইনীবিদ্যার সাধনা নিয়ে অনেক গবেষণা করে বলেছেন—ডাইনী বা অনিষ্টকারী এই যাদুকরীদের নিশীথকালীন সমাবেশে অবারিত ব্যভিচারে ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন!

প্রাচীন রোমে ব্যাকাসের (আসব বা মদ্যের দেবতা) পুজোর নামে ডাইনীরা যে নারকীয় কাণ্ড করতো তার বিবরণ দিয়েছেন ফিলাষট্রি।

ভোঁ-ও-ও-ও—মধ্যরাত্রে শিঙা বেজে উঠল। শিঙার সেই দূরাগত শব্দ চারিদিকের অন্ধকারকে ফালা ফালা করে দিয়ে বাতাসে কাঁপতে, কাঁপতে মিলিয়ে গেল দূরে। সেই সঙ্কেত পেয়েই শহরের যত নষ্টচরিত্রের মহিলা এসে জড়ো

হলো টাইবার নদীর পাড়ে সিমিলার নিবিড় অরণ্যে। তারা বনের ভেতরে ব্যাকাসের মন্দিরের ভূগর্ভস্থ একটি বিশাল কক্ষে এল। প্রধান পুরোহিত ইঙ্গিত করতেই বেজে উঠল ড্রাম, বেজে উঠল বিউগল। বাজনার আওয়াজ পেয়ে পিল পিল করে চলে এল পুরুষের দল। তাদের প্রচুর পরিমাণে উত্তেজক ওষুধ এবং সুগন্ধী মদ পরিবেশন করা হলো।

বেশবাস খুলে ফেলল মেয়েরা। যৌবনসম্ভার অবারিত করে দিয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে শুরু করল তারা। কামনার জ্বালায় পুরুষদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগল। কখন আর কতক্ষণ পরে আলো নেভাতে বলবে, অসহ্য অস্থিরতায় তাদের হাত নিসপিস করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই প্রধান পুরোহিত এলেন মঞ্চে। থেমে গেল বাজনা। স্তব্ধ হল নগ্ন যৌবনবতীদের উদ্দাম নৃত্য! পুরোহিত ব্যাকাসের কাছে নতজানু হয়ে শুরু করলেন প্রার্থনা।

একসময়ে প্রার্থনা শেষ হলো। দপ করে নিভে গেল সমস্ত আলো। ঘন অন্ধকারে শুরু হলো অবারিত এবং নিরবচ্ছিন্ন কামলীলা। আরও জানিয়েছেন ফিলাসট্রি, ধর্মের নামে এই ব্যভিচার ইটালি তথা রোম থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ ফ্রানসে, ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের আরও অনেক দেশে।

শুধু পৌত্তলিক, ধর্মান্ধ পুরোহিতরাই নয়, গোড়ার দিকের খ্রীস্টান ধর্মযাজকরাও জড়িবুটি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন কোন সম্প্রদায়কে প্রশ্রয় দিত এই অনাচারে। তারা সান্ধ্য প্রার্থনা শেষ হলেই আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘন অন্ধকারে হয়ে উঠত আদিম। মত্ত হয়ে উঠত অবাধ কামকেলিতে। ইউরোপের দেশে দেশে এই ব্যভিচার অব্যাহত ছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

কিন্তু অশুভ শক্তির পূজারী ডাইনীদের এই নিশীথকালীন সমাবেশ বা 'স্যাবাথ' অর্থাৎ পবিত্র ও পুণ্যদিনের সম্মানিত উৎসব (খ্রীস্টানদের সপ্তাহের প্রথম দিন আর ইহুদীদের সপ্তাহের শেষ দিন) বা বিশ্রামকাল এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আবরণে তাদের অবারিত পাপলীলার উৎস কোথায়? এবং কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

উইচক্র্যাফট বা ডাইনীবিদ্যার বিখ্যাত গবেষক অধ্যাপক সি. ডবলিউ. অলিভার (C. W. Oliver) জানিয়েছেন—Sabbath existed continuously from the remotest antiquity to the present times: অর্থাৎ সুদূরতম অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত ডাইনীদের এই সমাবেশের অস্তিত্ব আছে পৃথিবীর দেশে দেশে।

প্রফেসার অলিভার আদালতের রেকর্ডে বর্ণিত কয়েকজন ডাইনীর স্বীকারোক্তিকে ভিত্তি করে দিয়েছেন মধ্যযুগীয় এক স্যাবাথের এই রোমাঞ্চকর বিবরণ—

গভীর রাত্রি তার রহস্যময় কালো অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছে গ্রামের চারিদিকে। আকাশের চাঁদ যেন কোন যাদুমন্ত্রে ভুতুড়ে এক একটা ছায়াদেহের মত ছুটন্ত মেঘগুলোকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। আর ঘনকুয়াশা দূরে জলাভূমির ওপরে ভারী চাদরের মত ছড়িয়ে রয়েছে।

আজ এই কালরাত্রিতে এই পৃথিবীর সব অপদেবতা এবং দৈত্যদানব যেন এই জঙ্গলাকীর্ণ গণ্ডগ্রামে এসে জড়ো হয়েছে। এই গ্রামেই আজ আতঙ্ক, ভয় আর সন্ত্রাসের রাজত্ব। আর যত দুর্বৃত্ত আর শয়তানদের বিদেহী আত্মা যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। নিশিরাতের এই কাজলকালো অন্ধকারে তাদের শয়তানী চক্রান্ত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। কাছে দূরে নিবিড় অন্ধকারে আরো এক ছোপ নিকষ কালো টুকরো টুকরো ছায়ার মত নিঃশব্দে ঘুরছে রক্তচোষা বাদুড়—ভ্যামপায়ারের দল—তারা অসতর্ক পাখিদের রক্ত পান করার নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় গাছের ডালের আড়ালে আবডালে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। হতভাগ্য নিহত পাখিদের দেহের নির্যাস থেকে এক্ষুণি তৈরি হবে ডাইনীদের মারণ ওষুধ।

গভীর রাত্রির ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন কবরভূমিতে এল তিনটি ছায়াদেহ। তিন বুড়ি। তিন ডাইনী। তারা চুল এলো করে উল্লাসে নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতেই তীব্র উত্তেজনায় হঠাৎ তারা কবর খুঁড়ে হিমশীতল শবদেহ বের করে কখনো পরম আদরে আলিঙ্গন করছে আবার কখনো বা যে শিশুদের ভুলিয়ে সমাধিভূমিতে এনেছে তাদের গলা টিপে মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তচিৎকার স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ঠিক সেই সময়—

সেই সময় কবরভূমির অদূরে পাহাড়ের ওপরে সবুজ শ্যাওলার আস্তরণপড়া ভাঙা একটি বাড়ির শক্ত করে বন্ধ করা খড়খড়ির ফাঁক দিয়েও ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল। বাইরে শাঁ-শাঁ বাতাসের শব্দ শুনে মনে হয় যেন হাজার হাজার ডাইনী মর্মান্তিক আক্ষেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সেই ঝড়ো বাতাসের সওয়ার হয়ে সমাধিভূমি থেকে এল সেই তিন বুড়ি তাদের সাধনভজনের গোপন জায়গা—সেই পোড়ো বাড়ির ঘরে।

সেখানে উনানে একটা বিশাল কড়াইতে কি যেন সেদ্ধ হচ্ছিল। সেই তিনজনের ভেতরে যে ডাইনী সবচেয়ে কুৎসিত এবং বয়োবৃদ্ধা সে কবরভূমি

থেকে নিয়ে আসা মৃতদেহের কয়েকটুকরো মাংস সেই কড়াইতে ফেলে দিল। মানুষের চর্বি দিয়ে তৈরি তিনটি মোমবাতির ছায়াকাঁপা আলো ঘরের দেওয়ালে নৃত্য করছে প্রেতচ্ছায়ার মত। আর সেই ম্লান আলোয় দেখা যায়—ঘরের কোণের গাঢ় অন্ধকারে দুই যুবতীর শুভ্র নিরাবরণ দেহ বিজুরীরেখার মত ঝকমক করছে। তারা দুইজনই চুল্লীর গনগনে আগুনের দিকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু—কেন যেন তাদের নগ্ন দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তীব্র কামোদ্দীপনা।

সেই ঘরের আর এক কোণে আর একটি চুল্লীতে কয়েকটি শিকড় পোড়ানো হচ্ছে। তার উৎকট কটু গন্ধভরা কালো ধোঁয়া ঘন কালো মেঘের মত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে। সেই উনানের গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে একটানা গোঙানির মত শব্দে ডাইনীরা মন্ত্রপাঠ করতে লাগল। ধীরে ধীরে সেই মন্ত্রধ্বনি যত জোরালো হয়ে উঠতে লাগল ততই চুল্লীর সেই চাপা ধিকি ধিকি আগুন সহস্র শিখায় জ্বলে উঠল। বাইরে প্রহরে প্রহরে রাত গড়িয়ে আরও গভীব আরও নিশুতি হতে লাগল।

একসময় নিভে গেল আগুন। শেষ হল মন্ত্রপাঠ। এইবার শুরু হলো ক্রিয়ানুষ্ঠান। সেই বয়স্কা ডাইনী কালো কলসী থেকে তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত তেল নিয়ে সেই নগ্না দুই তরুণীর সারা দেহে বেশ রগড়ে রগড়ে মাখিয়ে দিল। সেই উগ্র দুর্গন্ধ ভরা কটু তেল মালিশের পরেই দুই যুবতীর নিরাবরণ দেহে তীব্র যৌনউত্তেজনার আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। দৃঢ় ও কঠিন হয়ে উঠল তাদের উদ্ধত স্তনভাণ্ড। কামনার জ্বালায় তাদের সারা দেহ দুমড়ে দুমড়ে উঠছে। শেষপর্যন্ত তারা তাদের নিটোল সুপুষ্ট উরুর ভেতরে চেপে ধরে রাখল পুরুষাঙ্গের প্রতীক দীর্ঘ বাঁকানো একটা লাঠি। আর—

আর যেই সেই নরকসদৃশ ঘরের চিমনী দিয়ে ঝড়ো বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়ল অমনি সেই দুই তরুণী দুই প্রেতিণীর মত রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল—গেল মাথার ওপরে কালো কালো মেঘের সঙ্গী হয়ে দূরে ভুতুড়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ জলাভূমির দিকে। জলাভূমি ছাড়িয়ে বনবাদাড় জঙ্গল মাড়িয়ে তারা এল সেইখানে যেখানে প্রেতচ্ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই মত উত্তেজিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত কয়েকটি যুবতী। বলাবাহুল্য তারাও সম্পূর্ণ নগ্ন। কে জানে, কিসের মর্মান্তিক আক্ষেপে তাদের কেউ কেউ পাথরে মাথা কুটছে। কেউ তীব্র যন্ত্রণায় কাঁদছে। আবার কিছুক্ষণ পরেই কি মনে হলো কে জানে? তারা দল বেঁধে চলতে শুরু করল।

ক্রমশঃ তারা সেই নির্জন আরণ্যক পরিবেশে প্রগাঢ় স্তব্ধতার ভেতরে যেখানে কোন সুদূর বিস্মৃতকালের ভক্তদের মন্ত্রপূত পাথরগুলো দ্রুত ধাবমান মেঘের নিচে কালো ছায়াশরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পাশ দিয়ে তারা চলে এল; চলে এল সেইখানে যেখানে ধ্বংসজীর্ণ প্রাচীন গীর্জা ঝুলিয়ে দিয়েছে তার বন্যলজ্জাগুল্মে আচ্ছন্ন একটা খিলান। এই খিলানের নিচে এসে তারা দাঁড়ালো আর—

সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই জঙ্গলাকীর্ণ পোড়োজমি মুখরিত হয়ে উঠল। চারিদিকে ঘনজঙ্গল, আর অন্ধকার ফুঁড়ে যেন চলে এল কয়েকটি অশ্বারোহীর ছায়ামূর্তি। তারা প্রত্যেকে সুপুরুষ এবং স্বাস্থ্যে প্রখর যৌবনের আভাস। অন্ধকার থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে এল সুযৌবনা সেই ডাইনীরা। উল্লসিত হয়ে উঠল অশ্বারূঢ় পুরুষের দল। ডাইনীরা তাদের চক্রাকারে ঘিরে নাচতে লাগল। সেই সঙ্গে শুরু করল তাদের (ডাইনীদের) বিচিত্র ভয়াল গান। নাচে গানে আর মেয়ে-পুরুষের সমবেত কলোরোলে মুখর হয়ে উঠল বনভূমি।

ওদিকে সেই পাহাড়ের ওপরে পোড়ো বাড়ির ভাঙ্গা ঘরে বর্ষীয়ান ডাইনীরা বিশাল সেই লোহার কড়াইতে ব্যাঙ, বিষাক্ত সাপ, মরামানুষের মাংস এবং শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সেদ্ধ করে তৈরি করছে ভয়াবহ ও তীব্র বিষাক্ত ওষুধ। সেখানে চলছে সুপরিকল্পিত অপরাধের প্রস্তুতি। ডাইনীদের সেই জ্বলন্ত উনানের ওপরে মারণ ওষুধের কড়াই যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছে—শত্রুরা সতর্ক হও—আগামী কাল ভোর হতে না হতে গ্রামে গঞ্জে শুরু হয়ে যাবে সাংঘাতিক ব্যাধি—শুরু হবে গোমড়ক। পশুপাখি মানুষকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবে কবরে।

আর সেই গভীর অরণ্যে উত্তরোল হয়ে উঠল ডাইনীদের সমাবেশের নাচ-গান। উত্তেজক ওষুধের প্রভাবে সেই যুবতী ডাইনীরা কামনার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল। আরও তীব্র—আরও উদ্দামবেগে নাচতে শুরু করল। এতগুলো নগ্ন নারীমূর্তির কবোষ্ণ সান্নিধ্য মাতাল করে দিয়েছে পুরুষদের। তীব্র লালসায় তাদের চোখগুলো জ্বলছে দগদগে ঘায়ের মত। নাচতে নাচতেই মেয়ে-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। সেখানে চলতে লাগল অবারিত যৌনলীলা। যে পুরুষ যত বেশি বিকারগ্রস্ত যত বেশি দৈত্যের মত তার সঙ্গিনীই পরম পরিতৃপ্তিতে তত আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সেই অবাধ আর ব্যাপক যৌনমিলন চলল যতক্ষণ না পূবের আকাশে ভোরের রেখা জেগে ওঠে।

বলা দরকার ডাইনীদের এই নৈশসমাবেশ এবং যৌনগন্ধী বীভৎস ক্রিয়াকলাপের একটি শব্দও কাল্পনিক নয়।

ডাইনীদের এবং তাদের পুরুষসঙ্গীদের মিলনস্থানের যে বিবরণ ওপরে দেওয়া হয়েছে—সেই স্থানটি হল রোমের উপকণ্ঠে জঙ্গলাকীর্ণ একটি প্রাচীন গ্রাম। আর কাল মধ্যযুগ দশম বা একাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী। মিডিয়াভ্যাল স্যাবাথের (ডাইনীদের সভা) এই বিবরণ দিয়েছেন প্রফেসার অলিভার। কিন্তু—

ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, ডাইনীদের এই সভা—এই বিচিত্র উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা কিন্তু শুধু নয়শো বছর আগে রোমে নয়—শুধু ইতালিতে নয়—স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতভূখণ্ডের মতই ইউরোপে এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নদীর স্রোতের মত বয়ে চলেছিল যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। ডাইনীবিদ্যার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, শয়তানের শক্তির প্রতি অগাধ বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে রোমের ডাইনীরা যেমন মরা ব্যাঙ, বিষাক্ত সাপের চামড়া, শবদেহের মাংস দিয়ে মারণ ওষুধ (ওপরে বর্ণিত) তৈরি করেছে, তেমনি তার সাতশো বছর পরে ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের সুন্দরী সুযৌবনা প্রনয়িণীরা (সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য বা তাঁর অঙ্কশায়িণী হওয়ার আশায়) ব্ল্যাক আর্ট বা ডাইনীবিদ্যার সাহায্য নিয়ে কী বীভৎস কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছিল; তার তিনশো বছর পরে ইংল্যাণ্ডের ধনী অভিজাত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ও বশীকরণ তুকতাক বা গুপ্তবিদ্যার চর্চায় মত্ত হয়ে উঠে কী নাটকীয় কাণ্ড করেছিল এমন কি একেবারে এই বর্তমান শতাব্দীতেই বিদ্যা ও সংস্কৃতির ভুবনবিখ্যাত পীঠস্থান কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করে ব্ল্যাক আর্ট কিংবা শয়তানের পূজার (Devil worphip অশুভশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য পূজা) প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেসব যথাস্থানে বলা হবে। কিন্তু—

মনে ঘনিয়ে আসে একটি প্রশ্ন—মধ্যযুগের অন্ধ কুসংস্কারের গভীর অন্ধকার থেকে পরপর অনেকগুলো শতাব্দী পাড়ি দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত এই আধুনিক কালে ডাইনীবিদ্যার পুনরুত্থান কি করে এবং কেন ঘটল?

সে আলোচনা ডাইনী বিদ্যার এই গ্রন্থের শেষে করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তার আগে বলা দরকার ডাইনীদের রাত্রিকালীন এই গোপন সমাবেশ এবং স্ত্রী-পুরুষের বাধাবন্ধনহীন অবারিত যৌনলীলার 'অরিজিন' বা সূত্র কি—এই প্রসঙ্গে উইচক্র্যাফটের বিখ্যাত গবেষক জেরাল্ড গার্ডেনার তাঁর উইচক্র্যাফট টু ডে গ্রন্থে জানিয়েছেন—ডাইনীবিদ্যার কুশীলবদের (মেয়ে ও পুরুষ) তীব্র

আবেগের নির্লজ্জ প্রকাশ থাকে তাদের সাধনায়, তাদের ধ্যান-ধারনায়। ডাইনী যাকে ভালবাসে, যাকে পেতে চায়, তার জন্য সে রাতের অন্ধকারে ওষধি বা বন্য লতাগুল্ম খুঁজে তাব সঙ্গে মানুষের মাংস মিশিয়ে তৈরি করে মায়াশরবত। যাকে ঘৃণা করে তার জন্য তৈরি করে কুমীরের হৃদপিণ্ড। বিষাক্ত সাপের চামড়া, শিশুর শবদেহের মাংস দিয়ে তীব্র ও অনিবার্য মারণ ওষুধ। তাদের প্রেমপ্রীতি এবং বিদ্বেষের মতই তীব্র তাদের যৌনকামনা। তাই নিজেদের দেহমনকে আরও উত্তেজিত আরও মাতাল করার জন্যই নিশিরাতের গুপ্ত সমাবেশে ডাইনী মেয়েপুরুষ পরস্পর পিঠে পিঠ দিয়ে চক্রাকারে উদ্দাম বেগে নৃত্য করতে থাকে। একসময় আসে সেই চরম পুলকানুভূতির শুভক্ষণ—যৌন মিলন। সেই মিলনের অপার আনন্দে তাদের চেতনা, তাদের সমস্ত অনুভূতি আবিষ্ট হয়ে যায়। আর তখন নাকি অলৌকিকভাবে তাদের দৃষ্টি যেমন দুর্নীরিক্ষ্য অজানা ভবিষ্যৎ তেমনি সুদূরকালের বিস্মৃত অতীতের দিকে প্রসারিত হয়ে যায়। তখন ভূতভবিষ্যৎ দেখতে পায়। এই শক্তিকে আরো কেন্দ্রীভূত আরো তীব্র জোরালো করার জন্যই ডাইনীরা দীর্ঘসময়ব্যাপী রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় এবং ঘাসের চাপড়ার ওপরে আঁকজোক কেটে তন্ত্রমন্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড করে।

শেষে আবও বলেছেন গার্ডেনার, ডাইনীবিদ্যার প্রতি তরুণীদের আকৃষ্ট করার জন্যেও কিছুটা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ কামকেলীর আয়োজন থাকে। প্রথম প্রথম অনভিজ্ঞ অল্পবয়সী মেয়েরা অর্থাৎ নতুন দীক্ষিত ডাইনীরা মনের ভেতরের নিরন্তন কামবাসনার জ্বালাকে চরিতার্থ করার জন্য এই বাধাবন্ধহীন মিলনের ঢালাও ব্যবস্থাকে কৌতুককর মজার খেলা (Game for fun) বলে মনে করে। কিন্তু—

আবার আধুনিককালের ইউরোপীয় ডাইনী সমাবেশ বা কভেনের (Coven) যৌনলীলার ব্যাখ্যা আর এক রকম। সম্পূর্ণ ভিন্ন তার দর্শন। শুধু এইটুকুই বলেছেন একালের ডাইনীবিদ্যার প্রধান ঋত্বিক ডক্টর গার্ডেনার Coven allowed full play to the stronger human emotions অর্থাৎ মনের ভেতরের তীব্র ভাবাবেগকে চরিতার্থ করার জন্যে কভেন সব ব্যবস্থাই করে। তাই বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের ব্রিটেনের ডাইনীদেরও বাধ্য হয়েই—নির্জন আরণ্যক অঞ্চলে গোপনে মিলিত হতে হয়—Witches met secrettly in Wooded Country.

আর কি করে—কি ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের ডাইনীরা, কত বীভৎস এবং ন্যক্কারজনক ও অকল্পনীয় ক্রিয়াকাণ্ডে মত্ত হয়ে ওঠে, ফ্রান্সের ব্ল্যাক আর্টের (গুপ্তবিদ্যার) কুশীলবরা কেমন করে লণ্ডনের শিক্ষিত অভিজাত সমাজকে ব্ল্যাক আর্টের বিধ্বংসী নেশা জর্জরিত করেছিল—এবং আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি—

নয়

ডাইনীদের রীতিমত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতই দীক্ষা দেওয়া হতো।

শুধু ল্যাংকাশায়ার তথা ইংলণ্ডেই নয়।

মধ্যযুগে ডাইনীবিদ্যা বা অশুভশক্তির (Black Art) প্রবল অনুশীলন চলতো ফ্রান্সেরও দিকে দিকে। ষোড়শ শতাব্দীতে রীতিমত বিভিন্ন ধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষার মত ডাইনীদেরও দীক্ষিত করা হতো নানা ক্রিয়াপ্রকরণ সহযোগে।

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাইনীবিদ্যায় দীক্ষিত এক রমণীর জবানীতেই শুনুন—দীক্ষার সেই বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ। কিন্তু তার আগে বলা দরকার—ফ্রান্সের পুলিশ ব্ল্যাক আর্টে দীক্ষিত কয়েকজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশের জেরার উত্তরে এই জবানবন্দী—

আমার নাম জেনী হারভিলীয়ার। ক্যাম্পেনের কাছে ভারবেরি গ্রামে আমার বাড়ি এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে গিয়েছিল জেনী। সুডৌল ধারালো মুখখানা কান্নার আভাসে করুণ হয়ে উঠেছিল। কি করবো বলুন—আমার কি দোষ? জ্ঞান হওয়ার পরই জানতে পেরেছিলাম আমি ডাইনী—

কি রকম? ক্যাম্পেনের পুলিশের অফিসার ইনচারজ বিস্মিত হয়েছিল।

জেনী কখনো আবেগে উত্তেজিত হয়ে, কখনো তার এই দুরাবস্থার জন্য আক্রোশে বিক্ষুব্ধ হয়ে ডাইনীতে দীক্ষা দেওয়ার যে ক্রিয়াপ্রকরণের দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর বৃত্তান্ত বলেছিল এখানে তা সংক্ষেপে বলা হলো—

জেনীকে কোলে করে তার ডাইনী মা গিয়েছিল তাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে ঘনজঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের নিচে পোড়ো বাড়িতে। সে বাড়ির উঠোনে দাউ দাউ করে মশাল জ্বলছিল। সেখানে তখন ডাইনীদের ত্রৈমাসিক সমাবেশ বা স্যাবাথ চলছিল। উঠোনের ঠিক মাঝখানে ডাইনীদের দেবতা 'আনিজা' বা রবিন।*

তার মাথার দুদিকে দুটো শিং। আর দুই শিং-এর মাঝখানে জ্বলছে একটা মোমবাতি। দেবতা রবিনের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে উল্লাসে নাচছে অশুভশক্তির পসারিণী যুবতীর দল। তাদের ভেতরে আবার কোন কোন তরুণী পুরুষ উইনদের পিঠে পিঠ দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় নেচে চলেছে।

এখানে বলা দরকার, ষোড়শ শতাব্দীর দুই পরমাসুন্দরী ফরাসী ডাইনী আদালতে বলেছিল, হুজুর ধর্মাবতার, আপনাদের কি করে বোঝাবো—ডাইনীদের এই স্যাবাথ হল—উদ্দাম আনন্দের স্বর্গ—paradise of joy এই আনন্দকে তারা স্বর্গীয় সেই পরমানন্দের পূর্বাভাস মনে করে। কিন্তু থাক সেসব কথা—

জেনীর মা নতজানু হয়ে বসল আনিজার সামনে। বলল হে মহাপ্রভু আনিজা—আমি ডাইনী—আমি তোমার একনিষ্ঠ উপাসিকা আমি আজ তোমার কাছে এনেছি, নতুন এক সেবিকা সে আমৃত্যু তোমার সেবাদাসী হয়ে থাকবে মহাপ্রভু—বিড় বিড় করে প্রার্থনার এই কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় জেনীর মা। তার যেন মনে হল আনিজার হাস্যপ্রদীপ্ত চোখ দুটো থেকে তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে তাঁকে সন্তান উৎসর্গ করছে তাই দেবতা খুশি হয়েছেন। জেনীর মা স্পষ্ট দেখল, আনিজা দুই বাহু প্রসারিত করল তার জেনীকে গ্রহণ করার জন্য। তাঁর হাতে সঙ্গে সঙ্গে জেনীকে দান করল জেনীর মা মিসেস হারভিলিয়ার। তার পরমারাধ্য দেবতা তার সন্তানকে গ্রহণ করেছেন—তীব্র আনন্দের আবেগে তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

*আনিজা—হল পুংছাগলের (ডাইনীদের দেবতার) প্রতীক। আনিজার দুই শিং-এর মাঝখানে জলন্ত মোমবাতি। আনিজার আলোকোজ্জ্বল প্রতিভার আভাস দেয়। নবম শতাব্দীতে আরবের আনিজা (আরবিয় ভাষায় ছাগল) সম্প্রদায়ের নেতা আবু-এল-আটায়াহিয়া প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আনিজার মাথার দুই সিং-এর মাঝখানে মোমবাতি বসানো রহস্যময় অশুভশক্তির এই দেবতার মূর্তি। ইরানে আনিজাকে বলে রবিন বা রাহবিন। রাহের অর্থ রাস্তা। যে পথ দেখায়- Guide বা Grandmaster. সুফী ঐতিহাসিক ইদ্রিশ শাহ সৈয়দ জানিয়েছেন, অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আনিজা বা রবিন মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব পারস্য থেকে ইউরোপে অনুপ্রবেশ করে। ইংল্যাণ্ডে আনিজার তথা উইচক্র্যাফটের প্রবর্তন হয়েছিল ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে—যখন পোপ দশ বছরের জন্য চার্চ থেকে গ্রেট বৃটেনকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা কিং জন গোপনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন বলে মরোক্কোয় দূত পাঠিয়েছিলেন শোনা যায় ডাইনীবিদ্যার ভক্তও হয়ে উঠেছিলেন এবং এইভাবেই ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ডাইনীবিদ্যা ছড়িয়ে গিয়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে বসে রইল মিসেস হারভিলিয়ার।

আবার কোথাও কোথাও ডাইনীদের উৎসবে বা 'স্যাবাথে' দেবতার (আনিজা) সামনে শিশুর গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে কিম্বা মন্ত্রপূত তেল মাখিয়ে দীক্ষিত করার প্রথা ছিল। উইচক্র্যাফটের ইতিহাসে আছে French inquisitors were peculiarly horrified at the numbers of children dedicated to the non-chiristian deity. অর্থাৎ অখ্রীষ্টান এবং অন্ধকুসংস্কার দিয়ে গড়া দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত অবোধ শিশুদের বিপুল সংখ্যা দেখে তখনকার (ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর) সরকারী তদন্তকারীরা অদ্ভুতভাবে শিহরিত হয়ে উঠেছিলেন।

গ্রামগ্রামান্তরে অশুভশক্তির কুশীলবদের মহল্লায় অনেক অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে ডাইনীরা কখনোই তাদের শিশুসন্তানদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতো না। তারা দীক্ষা দিত স্যাবাথে দেবতা আনিজার কাছে। তাই ডাইনীর সন্তান ডাইনীই হতো। এইভাবেই অশুভশক্তির রহস্যময় লীলার স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে যেত এক প্রজন্মী থেকে আর এক প্রজন্মীতে। কখনোই তারা জ্ঞানে বিদ্যায় সংস্কৃতিতে উন্নত সভ্যতার আলোয় আসতে সক্ষম হতো না। আর দয়া মায়া মমতা উদারতা কি মহত্ত্ব-সব মানবিক অনুভূতি বিসর্জন দিয়ে আদিমতার ঘন অন্ধকারে বাস করতো তারা যুগের পর যুগ।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি তাদের, বলেছেন গরীব দুঃখী মেয়েদের একটি 'হোম' বা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম বোরিংটন (১৬৬১-খৃঃ)। আমার হোমের একটি বারো বছরের মেয়ে আমাকে বলেছিল সে ডাইনী। তার মা তাকে ডাইনীদের বার্ষিক সভায় নিয়ে গিয়ে শিংওয়ালা দেবতার কাছে উৎসর্গ করেছে। তাকে দীক্ষা দিয়ে তার দু'হাতে উল্কি এঁকে দিয়েছে (একটু বয়সে বড় হলেই হাতে কিম্বা পায়ে উল্কি এঁকে দেওয়া হয়)। সেই দেবতার সামনে মাটিতে টান টান হয়ে শুয়ে বলতে হয়েছে পবিত্র শপথ, আমি ঈশ্বর মানবপুত্র যীশুকে পরিত্যাগ করছি। আজ থেকে অস্বীকার করছি, আমার পিতামাতাকে। আমার স্বর্গ নেই, মর্ত্য নেই, নেই পাপ-পুণ্য। আমার সমস্ত সত্ত্বায় শুধু তোমার অস্তিত্ব বিরাজ করছে। আজ থেকে আমার দেহ মনপ্রাণ সব তোমাকে উৎসর্গ করলাম প্রভু—

আরও জানিয়েছেন নিষ্ঠাবতী খৃষ্টান, ম্যাডাম বোরিংটন—তিনি কিছুতেই এই মেয়েটিকে বহু চেষ্টা করেও গীর্জায় নিয়ে যেতে পারেন নি।

আরো একটি মেয়ে, আগেরটির চেয়ে কিছু ছোট। সে তার মা বাবার সঙ্গে বহু স্যাবাথ নিয়মিত অ্যাটেনড করেছে। মেয়েটি প্রায়ই বিড় বিড় করে কি মন্ত্র পড়তো কে জানে।

হঠাৎ একদিন ম্যাডাম বোরিংটনের নজর পড়ল। চাঁদনী রাতে হোমের সামনের মাঠে একটা লম্বা ঝাঁটার ওপরে ঘোড়ায় চড়ার মত করে দু'দিকে পা ঝুলিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটছে। অনেক চেষ্টা করে তাকে নিরস্ত করার পর এই পাগলামির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলেছিল তার মা এবং তাদের গ্রামের অন্যান্য ডাইনীরা যে এইরকমই করে। আকাশে সোনার থালার মত চাঁদ যখন গা টেনে টেনে ওঠে আর চারিদিক ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দিনমানের মত মনে হয় তখুনি না কি দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ডাইনীরা। সবাই এক একটি লম্বা ঝাঁটার ওপরে চড়ে ছুটতে থাকে—কেউ কেউ আবার মন্ত্রের প্রভাবে উড়ে যেতেও পারে—আরও অনেক বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের কথাও বলেছিল সেই মেয়েটি।

অল্পবয়সী মেয়ে। তার কথা বিশ্বাস করেন নি ম্যাডাম বোরিংটন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত মেয়েটিকে হোমে রাখতে পারেন নি তিনি। অতি তুচ্ছ কারণে রেগে কেঁদে কেটে অনর্থ করতো। কথায় কথায় ঝগড়া মারামারি করতো। বোরিংটনের তাকে দেখে মনে হতো। ঠিক যেন বনের একটা বাঘিনীকে সভ্য মানুষের পৃথিবীতে সহস্র বিধিনিষেধের খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়েছে।

উইচ সম্প্রদায়ের থেকে যে কয়জন মেয়ে ম্যাডাম বোরিংটনের হোমে ছিল, তাদের চালচলন মতিগতি দেখে তাঁর মনে হয়েছে—অশুভশক্তির উপাসনা করতে গিয়ে তাদের ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো। তারা পশুর মতই জীবনযাপন করে—They live like animals.

ম্যাডাম বোরিংটনের এই ধারনা যে মিথ্যে নয় তার অকাট্য নজির আছে উইচক্র্যাফটের ইতিহাসে। ডাইনীবিদ্যার বিশেষজ্ঞ ও বহুদর্শী ডকটর মারগারেট মারে (Dr. Margaret Murray) জানিয়েছেন—অশুভশক্তির সাধনার প্রাচীনতম বিবরণে আছে—ডাইনীর ক্রিয়ানুষ্ঠানে পৌরহিত্য কি কোন গ্র্যানড মাস্টারের প্রয়োজন হতো না। ইংরেজ ডাইনীরা ঝাঁটার পিঠে চড়ে নৈশবিহার করতো। নিশি রাতে গভীর বনে যেয়ে তারা নানারকমের গুহ্য ক্রিয়াকলাপ শুরু করার আগে দুচোখে ঠুলি পরে নিত ; গায়ে মালিশ করতো এমন একটা ওষুধ যাতে থাকতো ফক্স-গ্লোভ (অর্থাৎ শিয়ালকাঁটা জাতীয় গুল্ম থেকে তৈরি। এই ওষুধ নাড়ির স্পন্দনকে দ্রুততর করে তুলতো—মনে হতো যেন আকাশে

ডানা মেলে উড়ে চলেছে।

শুধু তাই নয়। পা-দুটো অসাড় করার জন্য অ্যাকোনাইট বা বিষাক্ত কাঠ থেকে তৈরি ওষুধ খেত আর বেলেডোনা বা বিষাক্ত ওষধি খেয়ে নিত চেতনাকে একেবারে লুপ্ত করার জন্য। তারপরেই গভীর রাতের অন্ধকারে তারা এক একটা প্রেতিনীর মত ঝাঁটার ওপরে উঠে ছুটতে ছুটতে কোন নিরুদ্দেশ শূন্যে উধাও হয়ে যেত। আর দূর—বহু দূর থেকে শাঁ শাঁ বাতাসে ভেসে আসতো তাদের সমবেত কণ্ঠের গানের এই বিচিত্র কথাগুলো—শোনা যেত তাদের অট্টহাসি।

আমরা চলেছি ঘোড়ার পিঠে চড়ে
চলে যাচ্ছি উড়ে উড়ে
যাবো দূরে—বহু দূরে দিগন্ত পেরিয়ে
চলে যাবো আকাশের বুক ফুঁড়ে
হা—হা—হা—হা—হা—

দশ

প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের ডাইনীরা কি সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল ?

'উইচ' শব্দটির জন্মই হয়েছে প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের মাটি থেকে। 'Witch' কথাটা এসেছে অ্যাংলো-স্যাকশান শব্দ 'উইক্যা' (Wicca) থেকে। তাই স্মরণাতীত-কাল থেকে দেখা যায় গ্রেটবৃটেনের নানা শহরে, গ্রামে, জনপদে ডাইনীবিদ্যার এবং ডাইনীদের অস্তিত্ব। সুদূর অতীতে বৃটেনে অশুভ শক্তির কুশীলবরা দুই হাতের আঙুলের নিচে ঘন নীলরঙের উল্কিতে আঁকতো প্রাক্-খ্রীস্টান যুগের কেল্টিক (প্রাচীন ইংল্যাণ্ড) বর্ণমালা। তারা নিজেদের পরিচয় দেয় 'ড্রুইড' বলে। বৃটেনে নবপ্রস্তর যুগের ডাইনীদের দেবতার নাম ড্রুইড (Druide)। ড্রুইডের (এই ড্রুইডই পরবর্তীকালে হয়েছে শিংওয়ালা দেবতা-হর্ণভগড)। উপাসকরা কিন্তু সাধারণ ডাইনীদের মত বিষযুক্ত ওষুধ খাইয়ে হত্যা কিম্বা মন্ত্রবলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি ইত্যাদি সমাজবিরোধী কোন কাজই করতো না। তারা নিবিড় মনযোগে এবং গভীর নিষ্ঠায় অনুশীলন করতো যাদুবিদ্যার। এরা অধিকাংশই বাস করতো স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন জনপদ মেজরকায়ে। মেজরকায়ের ড্রুইড সম্প্রদায়ের রমণীদের কী অসামান্য ছিল যাদুকরী শক্তি তার একটা সত্যি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ডাইনীবিদ্যার আর এক গবেষক এবং উইচক্র্যাফট টুডর লেখক ও মেজরকায়ের বাসিন্দা ডক্টর গার্ডেনার।

মেজরকায় বাস করতো ডেভিড। ডেভিড মেজরকায়ের বিখ্যাত কাঠের মিস্ত্রী। তার হাতের কাজের প্রশংসা শোনা যায় লোকের মুখে মুখে। নামডাক আছে। কাজেই প্রচুর কাজ। অঢেল পয়সা যা রোজগার করে তার একটা ফার্দিং পর্যন্ত দিয়ে দেয় অ্যানিটাকে (তার স্ত্রী)। কিন্তু—তবুও—

অ্যানিটার মন পাওয়া যায় না। কে জানে কি ধাতু দিয়ে গড়া এই মেয়েমানুষ—বুঝতে পারে না ডেভিড। এমন কি তার সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা পর্যন্ত বলে না। সব সময় ভার ভার মুখ। ছল ছল দুটো চোখ। যেন মনে হয়, হয়তো এখুনি কান্নাকাটি করে এল। কিছুই বুঝতে পারে না সে। কিন্তু এইভাবে তো থিয়েটারের নকল স্বামী-স্ত্রী হয়ে বাস করা যায় না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে সংসারের কাজকর্ম মিটিয়ে অ্যানিটা ঘরে

পা দিতেই ডেভিড তাকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরে চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিল তার মুখখানা—

খবরদার—তুমি আমাকে ছোঁবে না। হিংস্র বাঘিনীর মত ফুঁসে উঠল অ্যানিটা। সবলে তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঝড়ের বেগে পাশের ঘরে চলে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডেভিড।

পরদিন ডেভিড তার কারখানায় গেল। ভোরের অন্ধকার থাকতে প্রতিদিন যেমন যায়। ঘরের চারিদিকে তারই হাতের তৈরি সুদৃশ্য কত ফার্ণিচার—সেসব যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। তার মনে হলো, তারা যেন বলছে ঘরের বৌ যাকে পাত্তা দেয় না, সে আবার মানুষ না কি! যত বড় মিস্ত্রীই হোক না কেন—তার কোন মূল্যই—

কি গো মিস্ত্রীসাহেব, সাতসকালে এত কি ভাবছ? ঝরণার জলের মত কলকল করে বলল অ্যাগনিস, রুটিওয়ালার মেয়ে। হাসতে হাসতে ডেভিডের একেবারে বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আস্তে আস্তে বলল, বৌ-এর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কোন কথাই বলল না ডেভিড। অ্যাগনিসের যৌবনপুষ্ট দীঘল চেহারাটার দিকে কেমন লোলুপ চোখে তাকিয়ে থাকতে তার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল।
কি হয়েছে তোমার বলো তো? অ্যাগনিস কৌতূহলের যন্ত্রণায় ছটফট করে।

তুমি আর আমার কাছে এস না অ্যাগনিস, ভাঙ্গা গলায় বলল ডেভিড।

কেন—কেন? কি হয়েছে শুনি? খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল অ্যাগনিস। ডেভিড তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, কতগুলো কথা।

ও গড! তাতে কি হয়েছে আমরা তো বন্ধুর মত—

খস্ বাইরে বুড়ো পপলার গাছের নিচে কিসের একটা শব্দ হলো।

বিদ্যুতগতিতে অ্যাগনিসের থেকে বেশ খানিকটা তফাতে সরে দাঁড়ালো ডেভিড। কারখানা ঘরের জানলা দিয়ে পপলার গাছটার দিকে তাকাতেই তার নজরে পড়ল একটা প্রেতিনীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যানিটা। তীব্র আক্রোশে তার চোখদুটো দুখণ্ড আগুনের মত চকচক করছে।

বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই কারখানা ঘরের নিরালায় সকলের চোখের আড়ালে অ্যাগনিস আর ডেভিডের অবৈধ প্রণয় একটা বন্যলতার মত দিনে দিনে সতেজ ও পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

রুটি বিক্রি করতে আসত অ্যাগনিস। তার হাসিখুশি উচ্ছলতা ডেভিডের

মন টেনেছিল। বাইরের মাঠজোড়া সোনালী রোদের ঝলকের মত অ্যাগনিস যেই তার আধো অন্ধকার ঘরটার ভেতরে এসে দাঁড়াতো তখুনি যেন আলোর দিকপ্লাবী বন্যায় ভেসে যেত তার নতুন কাঠের গুঁড়োর গন্ধেভরা শ্রীহীন নড়বড়ে কারখানা ঘরটা। আর তার মনের ভেতরে ভেসে উঠতো আর একটি অন্ধকার মুখ। কেমন গম্ভীর আর কঠিন। নিরুত্তাপ। শীতল। সেই নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে বাস করতে করতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আলোর দিকে ঝুঁকেছিল।

হ্যাঁ। জানে—সেটা অন্যায়। অ্যানিটাকে বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু সে কি করবে—কি করতে পারে সে। বহু চেষ্টা করেও সে তার মনই পায় নি। সবসময় তাকে সন্দেহ আর কেমন ছাড়া ছাড়া ব্যবহার। কতদিন কতকাল আর মানুষ খিদে সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। তাই—

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল তার। আর একদিন নিরালা দুপুরে অ্যাগনিসকে চুমু খেতে খেতে তার বুকে নদী হয়ে মিশে গিয়েছিল. সেদিনই ওই ডাইনী অ্যানিটা হয়তো দেখে ফেলেছিল। তারপর থেকেই গম্ভীর—এই কথাগুলোই অ্যাগনিসের কানে কানে বলেছিল ডেভিড। আরও বলেছিল অ্যাগনিসকে—'আমার মনে হয় ওই মাগী বোধহয় তুকতাক করছে কিছু—একটু থেমে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে আবার বলেছিল, আমার ক্ষতি হয় হোক—কিন্তু ডার্লিং তোমার কোন বিপদ হোক—আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না—

অ্যাগনিস তার এসব কথাকে আমলই দিল না। তার গভীর প্রেম বাঁধভাঙা বন্যার মত। কখনো কোন বাধাই মানে না।

তাই পরদিনই দুপুরে এল অ্যাগনিস। কারখানা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। ধক করে উঠল অ্যাগনিসের বুকের ভেতরটা। সর্বনাশ! তাহলে কি ডেভিডের সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়ে গেল।

সেদিন বিকেলে এল আবার। এল সন্ধ্যায়। আর দারুণ দুশ্চিন্তায় কালিমাড়া মুখ নিয়ে ফিরে গেল। ডেভিড এল না।

এল না তার পরের দিনও। অ্যাগনিসের হাসি উচ্ছলতা কোথায় মিলিয়ে গেল। গভীর বেদনার শোক ম্লান সচল প্রতিমার মত প্রতিদিন আসে। আর ফিরে যায়। কাউকেই কিছু বলতে পারে না। এসব তো বলা যায় না।

গ্রামে কোন খবরই চাপা থাকে না। ডেভিডের খরিদ্দারদের কাছ থেকেই অ্যাগনিস জানতে পারল, ডেভিডের অদ্ভুত একটা অসুখ করেছে। জ্বর নেই, জ্বালা নেই, এমন কি সর্দিকাশি পর্যন্ত নেই। কিন্তু সে কিছুতেই বাড়ির

বড় দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় নামতে পারে না—

কি হয়েছে ডেভিডের? চৌকাঠ পেরিয়ে বাড়ির গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে যেতে চেষ্টা করলে কি হয় তার?

সকালের রোদ প্রাচীন ওক গাছটার ভেতর দিয়ে বাঁকা হয়ে পড়েছে ডেভিডের উঠোনে। বাড়ির পোষা কালো বিড়ালকে বুকের ভেতরে চেপে ধরে আদর করছে অ্যানিটা।

আজকের দিনে আমাকে অন্তত একবার যেতে দাও কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ডেভিড, কত অর্ডার আছে—কত কাজ—

যাও না—আমি তো তোমাকে আটকে রাখি নি, কেমন খস খসে গলায় বলল অ্যানিটা। ডেভিডের মুখের দিকে তাকালো না। বিড়ালটার গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে যেমন আদর করছিল তেমনিই করে যেতে লাগল। তোর ওই বিড়ালটা যত নষ্টের গোড়া—তুই ডাইনী—বদ্ধ উন্মাদের মত চিৎকার করে বলল ডেভিড—যতবার চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি—ততবারই কেন আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি—কেন—কেন? তীব্র উত্তেজনায় তার বাদবাকী কথাগুলো আটকে গেল। নিস্ফল আক্রোশে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল ডেভিড। কিছুক্ষণ শোকে মুহ্যমান মানুষের মত দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে বসে রইল।

এত তড়পাচ্ছো কেন, মৃদু গলায় বলল অ্যানিটা, যেতে ইচ্ছে হচ্ছে—যাও না। তুমি কেন জ্ঞান হারিয়ে ফেল তা আমি কি করে বলবো—আমি কি ডাক্তার—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—যাবো—নিশ্চয়ই যাবো, গর্জন করতে করতে উঠে দাঁড়ালো ডেভিড। দাঁতে দাঁত ঘসে বলল, দেখি—তুই কত বড় ডাইনী মাগী বলেই টলতে টলতে উঠোন পেরিয়ে যেই গেটের দরজার চৌকাঠে পা দিল অমনি ঝিমঝিম করে উঠল ডেভিডের মাথার ভেতরটা। চোখের সামনে ঘনিয়ে এল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। দেহটা ভারী অনড়, অটল পাথরের মত হয়ে একটু একটু করে যেন গভীর অন্ধকার খাদের ভেতরে তলিয়ে যেতে লাগল। তার পায়ের নিচে মাটি নেই। বহু চেষ্টা করেও তার হাত পাদুটোকে বশে আনতে পারল না। কিছুতেই সেই নীরন্ধ্র অন্ধকার থেকে আলোবাতাসের পৃথিবীতে উঠে আসতে পারল না। ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এল তার চেতনা। তার মনে হলো গভীর কালো জলের স্রোতে সে একটা কুটোর মত ভেসে চলেছে কোন অন্ধকার পাতালে।

একদিন নয়। দুদিন নয়। এক মাস কি দুই মাস বা এক বছরও নয়—দীর্ঘ তের বছর ডেভিডকে নজরবন্দী করে রেখেছিল মেজরকায়ের রমণী অ্যানিটা। মেজরকায়ের মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ যাদুবিদ্যার সাহায্যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিল।

অ্যানিটা যত বড় যাদুকরীই হোক। কালব্যাধি যক্ষা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। আর নিয়তি এবং অনিবার্য মৃত্যুকে তো কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না।

অ্যানিটা মারা গেল!

স্ত্রীর নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে ডেভিডের মনে হলো সেই প্রথম মনে হলো, তাকে ভালবাসে বলেই তো যাদুমন্ত্রে বাড়িতে বন্দী করে রেখেছিল। শুধু স্বামী নয় গোরু বাছুর ভেড়া মুরগী সব কিছুকে যক্ষিনীর মত সতর্ক প্রহরায় আগলে রাখতো।

মূর্তিমতী গৃহলক্ষ্মী অ্যানিটা। তার মনের ভেতরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উবে গিয়ে সেখানে গভীর মমতা আর সহানুভূতি টলমল করতে লাগল।

আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবে বাড়ি ভরে উঠল। তাদের সঙ্গে ডেভিডও স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সুদৃশ্য কফিন এল। কফিনের ভেতরে শবদেহকে আর কয়েকজনের সঙ্গে ধরাধরি করে সযত্নে শুইয়ে দিল ডেভিড। ছুটে যেয়ে অ্যানিটার বালিশটা নিয়ে এল। তার মাথার নিচে বালিশ দিয়ে দিল যেন কোন কষ্ট না হয় তার। তারপর স্ত্রীর পাণ্ডুর মুখে নাকে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মনে মনে বলল, আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি—আমাকে ক্ষমা করো—

সিমেট্রি (সমাধিভূমি বা গোরস্থান) অনেক—অনেক দূরে, এক আত্মীয় বললেন দেরী হয়ে যাবে ডেভিড—চলো রওনা দেওয়া যাক—

আমি!—আমি কোথায় যাবো? আশ্চর্য হয়ে বলল ডেভিড।

সে কি তুমি সিমেট্রিতে যাবে না? ফাদার প্রেয়ার পড়বেন—তোমার খোঁজখবর করবেন—

তোমরা বলবে—আমার ফিটের ব্যামো আছে। কেমন নিভু নিভু গলায় বলল ডেভিড, তোমরাও তো সবাই জানো—বাড়ির গেটের দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে যেতে গেলেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই—

উঠোনের ভীড়ের ভেতর থেকে মেজরকায়ের এক গ্রামবৃদ্ধ ওয়াকিং স্টিকে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে ডেভিডের কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বলল, চেষ্টা করেই দেখ—আজ নাও হতে পারে—

আশ্চর্য! কফিনের সঙ্গে দিব্যি সেই চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে চলে এল। আসতে পারল ডেভিড। মাথা ঝিমঝিম করল না। অজ্ঞানও হলো না। পাখির মত হালকা মনে হলো তার।

ফিউন্যারেলের (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) ঝামেলা চুকে গেলে—প্রায় দীর্ঘ তের বছর পর ডেভিড তার কারখানা ঘরের সামনে দাঁড়াল। ঘরের সামনে পিছনে প্রচুর আগাছা হয়েছে। বর্ষার জলে ঝড়ে ঘরটাও যেন একটু ডানদিকে হেলে পড়েছে।

ভালো আছো? গম্ভীর গলায় বলল এক রমণী। চমকে পিছনে ফিরতেই থমকে দাঁড়াল ডেভিডের হৃদ্‌স্পন্দন। অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি!

হ্যাঁ—আমি আজও তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। মৃদুকণ্ঠে বলল অ্যাগনিস, বাবা মারা গেলেন, কত ভাল ভাল ছেলে এল—আমি কাউকেই—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই পরম স্নেহে তাকে বুকে টেনে নিল ডেভিড।

অ্যাগনিসকে বিয়ে করে পরম সুখে দীর্ঘকাল ঘরসংসার করেছিল ডেভিড—Married and lived happily for many years.

কিন্তু সত্যিই কি যাদুমন্ত্রে কোন লোককে বাড়িতে আটকে রাখা যায়—কতটুকু সত্য আছে এই ঘটনার ভেতরে? এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল ডাইনীবিদ্যার ভুবনবিখ্যাত গবেষক এবং স্কটল্যাণ্ডের ডাইনীতত্ত্বের যাদুঘরের (Museum of Witchcraft) কিউরেটার ডক্টর গার্ডেনারকে।

এই ঘটনাটি আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, বলেছিলেন ডক্টর গার্ডেনার, মেজরকায়ের ডাইনীরা ড্রুইড সম্প্রদায়ের উইচ। শুধু যাদুবিদ্যা নয়—স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি (intuition), দ্বিতীয় দৃষ্টি (Second sight), চিন্তাসংযম (Thought Control) এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনেক বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী ছিল তারা।

এগার

ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার জন্ত সত্যিই কি ডাইনীরা মন্ত্রবলে সমুদ্রে ঝড় সৃষ্টি করেছিল ?

অনেকেরই ধারনা আছে—স্মরণাতীতকাল থেকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই উপমহাদেশ ভারত ভূখণ্ডই বুঝি ডাইনীবিদ্যা এবং যাদুবিদ্যা ও বশীকরণ, তুকতাক ইত্যাদি রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের আদি লীলাভূমি। কিন্তু শুধু ভারতভূমি নয়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, বিদ্যা ও সংস্কৃতিতে উন্নত ও প্রগতিশীল দেশ সমগ্র গ্রেটবৃটেনেই (স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড) যুগযুগান্তর ধরে উড়ছিল ডাইনীবিদ্যার জংধ্বজা।

১৬০৪ খ্রীস্টাব্দ। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তখন রাজা প্রথম জেমস (১৫৬৬-১৬২৫ ; রাজত্বকাল ১৬০৩-১৬২৫)। জেমস বিয়ে করেছিলেন ডেনমার্কের রাজা, চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ানের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে। মাঝে মাঝেই জেমস রাজকুমারীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি কোপেনহেগেনে (ডেনমার্কের রাজধানী) যেতেন।

একবার জেমস আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ডে ফিরছেন। মহাসাগরের উত্তাল ঢেউয়ে মোচার খোলার মত ভাসতে ভাসতে জাহাজ চলেছে। চলেছে অনুকূল বাতাসে পাল খাটিয়ে তীব্র গতিতে। পরিষ্কার ঝকঝকে নীল আকাশের কোন কোণে এতটুকু মেঘের চিহ্ন নেই।

তবুও হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠল। মাতলা হাতীর মত ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল সাগরের ঢেউ। জেমস চিৎকার করে বলে উঠলেন মাল্লাদের—সাবধান —খুব সাবধান—নিশ্চয়ই কোন ডাইনী সাগরের জলে বিড়াল ছুঁড়ে ফেলেছে—

আমাদের ডেনমার্কেও লোকে বলে, দারুণ ভয় পেয়ে জেমসের কাছে ঘেসে দাঁড়িয়ে রাজকুমারী অস্ফুটস্বরে বললেন, ডাইনীরা মন্ত্রপূত বিড়াল সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দিলে ঝড়-দুর্যোগ হয়—

কিন্তু শয়তানের অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে ঈশ্বরের শুভ শক্তি। তাই জেমস একমনে যীশুর নাম জপতে শুরু করলেন।

ঝড় থেমে গেল। অনিবার্য মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেলেন জেমস। ইংল্যাণ্ডে পা দিয়েই শুনলেন নর্থবারউইকে পাঁচজন স্ত্রীলোককে ডাইনী সন্দেহে গ্রেপ্তার

করা হয়েছে—

বিদ্যুতচমকের মত তার মনে হলো—এই ডাইনীরাই নিশ্চয়ই তাঁর জাহাজ ডুবিয়ে দেবার চক্রান্ত করেছিল। অনেক কারণে নর্থবারউইকের (প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের জনপদ) বাসিন্দারা তাঁকে পছন্দ করে না।

তিনি পুলিশকে জানালেন—নর্থবাবউইকের ডাইনীদের মামলার বিচার তিনি নিজে করবেন। বিশেষ আদালত বসল লণ্ডনের প্রাচীনতম গীর্জা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির প্রাঙ্গণে (১৬০৩ খ্রীস্টাব্দ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী)।

পাঁচ যুবতী।

পাঁচ ডাইনী!

তাদের প্রত্যেকের কোমরে দড়ি বেঁধে রাজার সম্মুখে আনা হলো। ডাইনীদের নেত্রী ক্ল্যারা স্যামপসন। দীর্ঘ পুরুষালী চেহারা। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল তার ঘাড়ের ওপরে কালকেউটের মত দুলছে। বড় বড় দুটো তীক্ষ্ণ চোখে কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। জেমস স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ক্ল্যারার দিকে। নিতান্তই সাধারণ এক তরুণী—ওর কি সত্যিই আছে অলৌকিক ক্ষমতা—মন্ত্রপূত করে বিড়াল সাগরের জলে নিক্ষেপ করল আর ঝড় উঠল! সব বুজরুকি নয়তো। হয়তো এমনি কোন প্রাকৃতিক কারণেই ঝড় হয়েছিল—

তোমরা ডাইনা—

আজ্ঞে হ্যাঁ—ইয়োর অনার—

তোমরা মন্ত্রবলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি, রমণীদের গর্ভপাত, গবাদি পশুর মড়ক, প্রবল বায়ু বা ঝড়ের সৃষ্টি করতে পারো?

হ্যাঁ, পারি, তবে মানুষের ক্ষতি হয় এমন কিছু সহজে করি না—বলল ক্ল্যারা। আমরা ড্রুইড সম্প্রদায়ের ডাইনী—

তোমরা ডাহা মিথ্যেবাদী, বুজরুক—তোমরা এসব কিছুই পারো না। ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন জেমস—

মিথ্যেবাদী বলবেন না হিজ একসেলেনসি, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল দলনেত্রী, কখনো একটাও মিথ্যে কথা আমরা বলি না—

ক্ল্যারার কথার দৃঢ়তা, তার উজ্জ্বল প্রদীপ্ত দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন জেমস। চোখের কোণা দিয়ে ক্ল্যারার মুখের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, মিথ্যে যখন কখনো বলো না—তবে একটা কথা আমাকে বলবে?

বলুন—আমার জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলবো—

তোমরাই কি কয়েকদিন আগে মন্ত্রপুত বিড়াল সাগরের জলে নিক্ষেপ করে ঝড়ের সৃষ্টি করেছিলে?

হ্যাঁ—হিজ একসেলেনসি—

কেন? সহজে তোমরা নাকি মানুষের ক্ষতি করো না, এইমাত্র বললে, তোমরা তো জানতে আমি সস্ত্রীক আটলান্টিক পেরিয়ে ডেনমার্ক থেকে ইংল্যাণ্ডে আসছি।

হ্যাঁ—জানতাম। জাহাজডুবি হয়ে আপনার এবং আপনার চোখের মণি ড্যানিশ কুইনের মৃত্যু হোক—এটাই আমরা চেয়েছিলাম—

সে কি! আমার ওপরে আক্রোশের কারণ?

ধক্ করে জলে উঠল ডাইনী ক্ল্যারার চোখ দুটো, ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, আপনি ড্যানিশ কুইনকে নিয়ে এত মত্ত হয়ে আছেন—কোনদিকে তাকাচ্ছেন না। কুইনের পরামর্শে আপনি গাদা গাদা ড্যানিশ কর্মচারী নিযুক্ত করছেন—তারা আমাদের ওপরে অত্যাচার করছে, তীব্র আবেগে ক্ল্যারার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল ক্ল্যারা। নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিজেকে সংযত করে ক্ল্যারা হেসে বলল, ইয়োর অনার, ভুলে যাবেন না আমরা ড্রুইড সম্প্রদায়ের ডাইনী। আমরা যে কি পারি—আর না পারি—তা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না—

কি রকম?

আপনি গত রাত্রে কুইনকে নিয়ে শয্যায় যাওয়ার পর কি কি আলোচনা হয়েছিল আপনাদের—আমি হুবহু বলে দিতে পারি—বলেই গড় গড় করে যা বলে গেল—তা শুনেই ভয়ে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল রাজা-রানীর মুখ!

বিস্ময়কর ও অলৌকিক ক্ষমতা এই ডাইনীর। নিরালা শয়নকক্ষের নিভৃত পরামর্শের প্রতিটি কথা নির্ভুল। না—বিপজ্জনক এই ডাইনীদের বেঁচে থাকতে দেওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা। অতএব—

অ্যাগনিস এবং তার সঙ্গিনীদের প্রত্যেককে ফাঁসী দেওয়া হলো।

বারো কল্যাণকামী ডাইনীও আছে

বলা দরকার, প্রতিটি বিষয়ের যেমন তেমনি আছে ডাইনীবিদ্যারও ভাল ও মন্দ। সমাজের ও দেশের কল্যাণকারী ডাইনীদের বলে হোয়াইট উইচ আর শয়তানের অনুচর, সর্বনাশা ক্ষয়ক্ষতির কুশীলবরা হলো—ব্ল্যাক উইচ! হোয়াইট উইচরা রোগ ব্যাধি মুক্ত করে এবং কেমন করে মন্ত্রের প্রভাবে তারা অনেক অসম্ভবকেও অলৌকিকভাবে সম্ভব করতে পারে সে সম্বন্ধে তার একটি সত্যি ঘটনা শুনুন—

গ্রামের নাম—মিটাই। সাবেক জার্মানীর একটি গ্রাম। সেখানে একবার শুরু হলো প্রচণ্ড খরা। দিনের পর দিন এক ফোটা বৃষ্টি নেই। ধূসর আকাশ থেকে মধ্যাহ্নের সূর্য প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে। যতদূর চোখ যায় দিগন্তপ্রসারী বন্ধ্যা মাঠ গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও মাটি ফেটে গিয়েছে। কৃষকরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

গ্রামের লোক এল বুড়ি ইনগ্রীডের বাড়ি। গ্রামের প্রান্তে নড়বড়ে কুঁড়েঘর। ইনগ্রীড রোদে পিঠ দিয়ে সরু সরু প্যাঁকাটির মতো দুটো হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে বসেছিল। লোকের সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তোমরা কি চাও বাছা?

মাসী কি আবার চাইবো, দেখতে পাচ্ছো আকাশের হাল—বিষ্টি বাদল না হলে তো মরে যাবো বলো? কৃষকদের কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনায়—

তা আমি কি করতে পারি বলো,-এসবই তো ভগবানের ব্যাপার—

না-না-মাসী তুমি একবার মন্ত্র পড়ে—মাটিতে কিসব আঁকিবুকি করে মুষল ধারে বিষ্টি নামিয়ে দিয়েছিলে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—বাবা, মনে আছে ফোকলা দাঁতে হেসে ইনগ্রীড বলল, আমার জওয়ান ছেলেটা মরে যেয়ে আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে বাবা—

শেষের দিকের কথাগুলোর ভেতরে কান্নার আভাস ফুটে উঠল।

তোমার পায়ে পড়ি মাসী, বলতে বলতেই এক প্রবীণ কৃষক ইনগ্রীডের

পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা ব্যবস্থা করো—দুর্ভিক্ষ থেকে আমাদের বাঁচাও—

ওঠ—ওঠ—উঠে দাঁড়াও—করছো কি বলতো, ইনগ্রীড বিব্রত হয়ে উঠল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তার পিচুটি মাখা ঘোলাটে চোখ দুটোর দৃষ্টি কেমন গভীর হয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে যেন অনেক অনেক দূর থেকে বলল, তোমরা তো জানো না, মন্ত্রতন্ত্র আমি কিছুই জানি না। কোন অলৌকিক ক্ষমতাই আমার—

না-না মাসী, তোমার কোন কথা আমরা শুনবো না—সমবেত কণ্ঠের প্রবল প্রতিবাদে ইনগ্রীডের ক্ষীন গলার কথাগুলো হারিয়ে গেল।

ইনগ্রীড আর কোন কথা বলল না। উঠে দাঁড়ালো।

বলল, যাও—আরও কিছু কাঠ নিয়ে এসে আমার শোয়ার ঘরের চুল্লীতে দাও—

কেন কি হবে মাসী—

আঃ যা বলছি তাই করো—মাসীর সেই ঘোলাটে চোখ দুটোই দু'টুকরো আগুনের মত জ্বলছে!

কৃষকরা ছুটে কাঠ নিয়ে এসে ফেলল উনানে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। লেলিহান আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে ইনগ্রীড বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগল! হঠাৎ থেমে গেল সে। তারপরেই চিৎকার করে গ্রামের লোকদের বলল, এবার তোমরা প্রত্যেকে মনের কামনা বাসনা এই আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একমনে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করো—

বুড়ির নির্দেশ অনুযায়ী তারা প্রত্যেকে আগুনের চারিদিকে গোল হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগল। আশ্চর্য! বাইরে আকাশের দূরকোণে গিন্নী শকুনের ঠোঁটের মত কালো এক টুকরো মেঘ দেখা দিল।

সেই মেঘ সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে বৃষ্টির ঢল নামিয়েছিল। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে ডাইনীবিদ্যার গবেষক ডক্টর মার্গারেট মারে (Dr Margaret Murray) বলেছেন তাঁর 'উইচক্র্যাফট ইন ওয়েস্টারন ইউরোপ' গ্রন্থে—"আমি পশ্চিম ইউরোপ তথা ব্রিটেনের যে কয়জন ডাইনীকে দেখেছি তারা প্রত্যেকে অত্যন্ত সৎ ও আদর্শবাদী। তারা হোয়াইট উইচ শ্রেণীর। তবে এদের সংখ্যা বেশি নয়।"

ডক্টর মারের এই হোয়াইট উইচের প্রসঙ্গেই বলা দরকার, পৃথিবীর দেশে

দেশে ডাইনীবিদ্যার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য খুঁজতে গিয়েই জানা গেল, শয়তানের পূজারী এবং বীভৎস আচার প্রক্রিয়ার কুশীলব ব্ল্যাক উইচদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই হোয়াইট উইচও তৈরি করা হচ্ছে। আমেরিকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে উইচক্র্যাফট। সেখানকার উইচক্র্যাফটের ডক্টরেট সুন্দরী এক তরুণী মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের ব্রত নিয়ে পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে পরিক্রমা করছেন। নিউইয়র্কের বোষ্টনের জনবহুল রাজপথেও শোনা যায় তাঁর উচ্চারিত কণ্ঠস্বর···

এখন থাক—তাঁর কথা যথাস্থানে বলা হবে।

তের

চারশো বছর আগে ইংল্যাণ্ডে ডাইনী সনাক্ত করার প্রক্রিয়া ছিল বীভৎস।

কিন্তু যত চেষ্টাই করা হোক না কেন হোয়াইট উইচের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য—রোডেশিয়ার পুনে, নেটসেয়ি, ম্যাজউইটা, ডিঙ্গেলা কি টটসাভানি বা ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্ল্যাক উইচদের সংখ্যাও কিন্তু পৃথিবীর নানা দেশেই ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। আফ্রিকায় যেমন তেমনি ইউরোপে এবং ভারতেও আধুনিককালে ডাইনীদের মামলা হয় আদালতে। তার আগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং কেস সাজায়। কিন্তু—ইউরোপে মধ্যযুগে ডাইনীদের সনাক্ত করা এবং শাস্তি দেওয়ার জন্যই জন্ম হয়েছিল একটি জীবিকার—

উইচ ফাইণ্ডার!

কিন্তু উইচ ফাইণ্ডারদের অতি বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্তে অগ্রসর হওয়ার আগে ডাইনীদের শাস্তি দেওয়ার প্রসঙ্গেই আবার সাবেক ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরাতে হয়।

ইউরোপীয় ডাইনীবিদ্যার ইতিহাসে আছে নরম্যাণ্ডির অভিযানের (১০৬৬ খৃষ্টাব্দ) আগে ডাইনীদের নানা পদ্ধতিতে অপরিসীম কষ্ট দেওয়া হতো। কিন্তু কখনো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো না। ১৫৪২ সালে প্রথম এলিজাবেথের (স্বর্ণযুগখ্যাতা) শাসনকাল (১৫৫৮-১৬০৩) শুরু হওয়ার ষোল বছর আগে উইচক্র্যাফট অ্যাক্ট (Witchcraft Act 1542) চালু হয়েছিল। এই আইনেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান হচ্ছিল না। তাই এলিজাবেথের রাজত্বের গোড়ার দিকে ডাইনীদের লোহার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে আগুনে জীবন্ত পোড়ানো হতো না বা দাঁত উপড়ে ফেলা হতো না। কোন নৃশংস অত্যাচারই করা হতো না। কিন্তু—

পিউরিট্যান বা গোঁড়া খ্রীষ্টানরা কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না শয়তানের অনুচর ডাইনীদের। তাই ডাইনীদের ওপরে অত্যাচার ছিল তাদের আনন্দময় একটা খেলা—delightful sports for puritans…এই পিউরিট্যানরাই ধীরে ধীরে ডাইনীদের মৃত্যুদণ্ডের প্রবর্তন করেছিল। তারা অত্যন্ত ব্যাপকসংখ্যায় ডাইনীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে স্বপক্ষে যুক্তি দিত বাইবেলে মোজেসের

সেই বিখ্যাত উক্তি আউড়ে—Thou shalt not suffer a Witch to live. ডাইনীদের বাঁচিয়ে রেখে যন্ত্রণা দেওয়া উচিত নয়। ১৫৬২ সালের পর থেকে ইংল্যাণ্ড তথা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেশে হাজার হাজার ডাইনীকে হয় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছিল কিম্বা ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। চার্চের পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্যে উইচক্র্যাফটের আইন এবং পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গিয়েছিল। পিউরিট্যানদের এই নৃশংস উন্মাদনা একটু একটু করে কমতে থাকে ইংল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের (Reformation Movement) পর থেকে। সে ইতিহাস এখানে অবান্তর—

এবার বলা যেতে পারে উইচ ফাইণ্ডার বা ডাইনীদের অনুসন্ধানকারীদের কথা।

১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ।

সপ্তদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে পূর্ব ইংল্যাণ্ডের নরফোকে, এজেকসের গ্রামে জনপদে অনুচরদের নিয়ে ঘুরতে দেখা যেত এক রাজপুরুষকে। তার পায়ে কালো গামবুট। গায়ে কালো ওভারকোট। মাথায় কালো টুপি। তার ছোট ছোট কুতকুতে দুটো চোখে তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি।

কোথায় কে ডাইনীবিদ্যার চর্চা করছে ; কে কোথায় শয়তানের আরাধনা করছে তাকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসী দিতে হবে। দুনিয়ার নোংরা আবর্জনা ওই ডাইনীদের নির্মূল করতে হবে—

এই রাজকর্মচারীর নাম—ম্যাথু হপকিনস। হপকিনস ছিল মাস্টার উইচ ফাইণ্ডার। তাকে দেওয়া হয়েছিল উপাধি—উইচ ফাইণ্ডার জেনারেল। ডাইনী নির্ধারণ করার পদ্ধতি ছিল বিচিত্র—

সন্দেহজনক ব্যক্তির ডান হাত বাঁদিকের পায়ে বেঁধে তাকে কম্বলে মুড়ে পুকুরের জলে চিৎ করে শুইয়ে (পিঠ থাকবে জলের ওপরে) দেওয়া হতো। যদি সে ভেসে থাকতে পারে তাহলে সে ডাইনী। আর যদি ডুবে যায় তাহলে নির্দোষ।

কম্বলে বাঁধা মানুষ কখনো ভেসে থাকতে পারে না। আবার ডুবে মরতেও কেউ চায় না। দাপাদাপি করে বাঁচার চেষ্টা করলেই হলো—ভেসে থাকা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুকুর থেকে তুলে এনে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত পোড়ানো হতো।

আরো এক নিয়মে 'ডাইনী' ঠিক করতো হপকিনস—ডাইনী সন্দেহে ধৃত স্ত্রীলোকটিকে পুরো একদিন ঘরের মাঝখানে দুই পা আড়াআড়ি করে একটা

টুলের ওপর বসিয়ে রাখতো। এই চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে তাকে এক ফোটা জল ও খাবার দেওয়া হবে না। জানালা দরজা থাকবে হাট করে খোলা।

হপকিনসের মতে এই সময় ডাইনীর কোন ইম্পস বা বাচ্চা (অনুচর) এসে ডাইনীর রক্ত চুষে খেয়ে থাকে। এবং তারা মাছি কি বোলতা কিম্বা অন্য কোন পতঙ্গের রূপ ধরে আসে। হপকিনসের অনুচররা সেই ঘরে কোন মাছি মশা এলেই তাদের মেরে ফেলতো। কিন্তু যদি কোন মাছি হাত ফসকে উড়ে পালায় তাহলেই বুঝতে হবে সেই মাছি ওই ডাইনীর ইম্পস এবং মেয়েছেলেটি নিঃসন্দেহে ডাইনী। তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা হতো।

বলা দরকার, উইচ ফাইণ্ডার জেনারেল ম্যাথু হপকিনস সরকার থেকে তো মাইনে পেতই উপরন্তু তার ফি ছিল প্রত্যেক ভিজিটে ২০ শিলিং এবং ডাইনী গ্রেপ্তার করে হত্যা করলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেত আরও বিশ শিলিং। আর হপকিনস প্রতি বছরে কম করে ষাটজন স্ত্রীলোককে ডাইনী বলে গ্রেপ্তার করতো এবং ফাঁসী দিত। এইভাবে বহু নির্দোষ স্ত্রীলোকের ওপরে মর্মান্তিক অত্যাচার চালিয়ে আর অঢেল রোজগার করে বেশ সুখেই বাস করছিল সে—

হয়তো আরও বহুকালই বহাল তবিয়তে থাকতো যদি না সেই মধ্যযুগীয় অন্ধ কুসংস্কারের ভেতরে বাস করেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রেভারেণ্ড মিঃ গল (Rev Mr. Gaul) একটি পুস্তিকায় হপকিনসের ভিত্তিহীন এবং যুক্তিহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদের ধ্বনি না তুলতেন। রেভারেণ্ড গলের বই থেকে জানা যায়--হপকিনসের ডাইনী নির্ধারণের আর এক রোমাঞ্চকর অশ্লীল পদ্ধতি। আর তারই পরিকল্পিত সেই নারকীয় ও বীভৎস পদ্ধতির সূত্র ধরে কেমন করে হপকিনসের জীবনের যবনিকা নেমে এসেছিল তার বিবরণ দিয়েছেন রেভারেণ্ড অত্যাচারিত ও অপমানিত (হপকিনসের হাতে) সেই পরমাসুন্দরী তরুণীর জবানীতে—

আমি মা-ঠাকুমা এবং পাড়াপড়শীদের কাছে শুনতাম শয়তান হপকিনস না কি কি একটা কুৎসিত অসভ্য উপায়ে ডাইনী ঠিক করছে। কিন্তু কি সেই পদ্ধতি যেটা বড়রা কিছুতেই আমাকে ভেঙে বলতো না। একদিন খুব পীড়াপীড়ি করতে ঠাকুমা বললেন, মেয়েদের ধরে নিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে গায়ে পিন ফুটিয়ে দেয়। যদি ব্যথায় আর্তনাদ করে ওঠে মেয়েটি, তাহলে নির্দোষ। কিন্তু যদি পিনের খোঁচা খেয়েও তার ব্যথার অনুভূতি না থাকে তাহলে সে নির্ঘাত ডাইনী। তাকে জীবন্ত পোড়াচ্ছে হপকিনস। একটু থেমে আরও বলেছিলেন ঠাকুমা—অনেক মেয়েই লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে বাঁচার

জন্য মৃত্যু কামনা করে। পিন বিঁধিয়ে দিলেও চুপ করে থেকে লজ্জায় থেকে পরিত্রান পেয়ে যাচ্ছে—এসব বলেই ঠাকুমা এবং মা আমাকে বারে বারে সাবধান করে দিয়েছিলেন, বাইরে যেন বেশি ঘোরাঘুরি না করি—হপকিনসের সাঙ্গোপাঙ্গোদের চোখে যেন না পড়ি।

শয়তান হপকিনসের নজর ছিল সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ওপর। রূপ আর যৌবন দুটোই ছিল আমার। কিন্তু হপকিনসের ভয়ে আমার তো ঘরে বসে থাকলে চলে না। আমি গরীবের মেয়ে। আমাকে বাড়িতে বাড়িতে দুধ ফেরী করে বিক্রি করতে হতো। আমার প্রতিবেশীরা, খদ্দেররা খুবই ভালবাসতো। এবং বলাবাহুল্য তারা প্রত্যেকেই হপকিনসের ওপরে বিরূপ ছিল। প্রায়ই বলতো তারা—যদি তোমাকে হপকিনস কখনো ডাইনী বলে গ্রেপ্তার করে আমরা শয়তানটার আস্ত রাখবো না—

একদিন ভরদুপুরে দুধ বিক্রি করে ফিরে আসছি। গ্রামের নির্জন জনমানবহীন পথ। হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হপকিনসের এক বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনুচর সে আমার কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল, তুমি খুব সুন্দরী, এস না জঙ্গলে—বলেই আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতেই আমি চিৎকার করে উঠে তার হাতে কামড়ে দিয়ে ছুটে পালালাম—লোকটা যন্ত্রনায় আর্তনাদ করতে করতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল—দাঁড়া—মাগী—তোকে মজা দেখাচ্ছি—

পরদিনই শেষ রাত্রে হপকিনস সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করতে এল। আমার মা-ঠাকুমা শয়তানের পায়ে কেঁদে পড়ে বলল, আমাদের মেয়ে ডাইনী হতে পারে না—

বেশ তো—সেটাই তো পরীক্ষা করে ছেড়ে দেব, খেঁকিয়ে হেসে বলল হপকিনস। ঠাকুমা-মার কান্নাকাটি চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেল। তারাও কত বলল—কত অনুরোধ করল। হপকিনস কারো কথা শুনল না।

আমাকে নিয়ে এল তার আস্তানায়। একটা ঘরে আমাকে বন্দী করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করল। যথারীতি প্রায় চার ইঞ্চি লোহার পেরেক নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল হপকিনস। আমি আর্তনাদ করে বললাম—আমি ডাইনী নই—আমাকে ছেড়ে দাও—

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

পেরেক হাতে নিয়ে আমাকে বিঁধাতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হপকিনস—

আমার নিরাবরণ দেহের উদ্ধত যৌবন সম্ভারগুলোর দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে লেহন করতে লাগল। তখুনি বুঝলাম ডাইনী বলে আমাকে পুড়িয়ে আর মারবে না। কিন্তু আর এক চরম সর্বনাশ আসন্ন—এসব ভাবতে ভাবতেই ক্ষুধার্ত বাঘের মত যেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে অমনি বাইরে সোরগোল উঠল—আগুন—আগুন—

গ্রামের লোকেরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল হপকিনসের ডেরায়। হপকিনস পালাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারে নি। তাকে ধরে তারই ডাইনী সাব্যস্ত করার পদ্ধতিতে উত্তেজিত জনতা হাত পা বেঁধে কালো কম্বলে জড়িয়ে পুকুরে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাঁচবার জন্য জলে ভেসে থাকতে চেষ্টা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকেরা তাকে হত্যা করে তার লাশ পুকুরের পাঁকে পুঁতে রেখেছিল।

১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে থানা-পুলিশ থেকে অনেক দূর গণ্ডগ্রাম সফোকে হয়েছিল এই ঘটনা কিন্তু—

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উইচ ফাইণ্ডার জেনারেল ম্যাথু হপকিনসের হত্যা আর সলিল সমাধির খবর যতদূরেই হোক, পুলিশের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল—সফোকের নেতৃস্থানীয় গ্রামবাসী এবং সেই নিপীড়িত ও বিপন্ন তরুণীর বিরুদ্ধে কেস সাজিয়ে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। নরফোকের কাউন্টি কোর্ট থেকে গড়িয়ে সেই মামলা চলে গিয়েছিল প্রিভি কাউন্সিলে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছিল। মেয়েটির জবানবন্দীতে যেমন তেমনি আরও অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষীতে জানা গেল, ডাইনী কি না সাব্যস্ত করার নাম করে শুধু অর্থোপার্জন নয়—প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পরমসুখে কামলালসাও চরিতার্থ করতো উইচ ফাইণ্ডার।

মামলার বিচারক পিটাকারিন মন্তব্য করেছিলেন—

Not a witch finder, but downright cheater and criminal.

চৌদ্দ

প্যারিসে ব্ল্যাক আর্টের কুশীলবরা কত বীভৎস পাপাচারে মত্ত হয়ে উঠেছিল।

উইচ ফাইণ্ডার হপকিনসের বৃত্তান্ত থেকে অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে ডাইনীবিদ্যা একটা ধাপ্পা, এবং নানা রহস্যময় ক্রিয়াবিধির আবরণে একটা বুজরুকি। তবুও অশুভশক্তির বাহক ডাইনীবিদ্যা, যাদুবিদ্যা, প্রেতচর্চা ইত্যাদি জটিল ও রহস্যাচ্ছন্ন গুহ্য ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার প্রতি যুগে যুগে দেশে দেশে ছিল এবং আজও আছে ও দূর অনাগতকালেও থাকবে দুর্বার আকর্ষণ।

'উইচক্র্যাফট' যেমন ডাইনীবিদ্যা আর ঠিক সেই রকমই ব্ল্যাক আর্ট অর্থাৎ শয়তানের শক্তিকে জাগ্রত করার কলাকৌশলও তেমনি এদেরই সমগোত্রীয় আর একটি শব্দ 'ব্ল্যাক মাস' বা অশুভশক্তির জন্য প্রার্থনা। এই 'ব্ল্যাক মাস' শব্দটির জন্ম হয়েছিল এবং উচ্চারিত হয়েছিল ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের (১৬৩৮-১৭১৫খ্রীঃ) সমসাময়িককালে গুপ্তবিদ্যার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ন্যক্কারজনক 'চেমব্রে আরডেন্টে অ্যাফেয়ার' মামলায়। এই কেসের 'প্রসিডিংস' থেকে জানা যায়, ব্ল্যাক মাসের পুরোহিত এবং তাদের অনুগামীদের ক্রিয়াপ্রকরণ ছিল যেমন ভয়াবহ ও বীভৎস তেমনি অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক—'Most obscene rites. এই গুপ্তবিদ্যার অনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ ছিল নগ্ন নারীদেহের কখনো উদর, কখনো জরায়ু, মোমের তৈরি মানুষের মূর্তি, (অবশ্যই শত্রুর, যার অনিষ্ঠ করতে হবে) কালো মোমবাতি, মন্ত্রজুত কালো পাউরুটি বা ব্ল্যাক হস্ট এবং চ্যালিশে তাম্রপাত্রের মত পবিত্র কিছু তাজা রক্ত এবং একটি মাস তিনচারেকের শিশু। কোন কোন সময় ব্ল্যাক মাসের যৌনগন্ধী আচারপ্রকরণের কোন উদ্দেশ্য বা অর্থই খুঁজে পাওয়া যেত না—Some of obscenities scarcely bear any significance.

সে যাই হোক, এই মন্ত্র উচ্চারণ করে গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগের নামে সমাজবিরোধী ও বীভৎস কার্যকলাপে চতুর্দশ লুইয়ের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত বহু রাজকর্মচারী এবং তাঁর রূপসী, সুযৌবনা সহচরীরা (রক্ষিতা বা মিসট্রেস) জড়িত হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ কমিশনার মিঃ রেনীর কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন ফ্রান্সের রাজা লুই। সাধারণ আদালতে এই মামলা চললে তো তাঁর সম্মান পথের ধুলোয় লুটিয়ে যাবে।

তাঁর নির্দেশে তৈরি হলো বিশেষ আদালত। তার এজলাস ঘরটির প্রতিটি জানালা দরজা ছিল ঘন কালো পর্দায় ঢাকা। বিচারকের টেবিলে থাকতো জলন্ত কালো মোমবাতি। ঘরটির নাম—চেমব্রে আরডেণ্টে আর মামলার নাম চেমব্রে আরডেণ্টে অ্যাফেয়ার।

বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর এই কেস শুরু হয়েছিল ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর শেষ হয়েছিল ১৭০৯ সালে। সুদীর্ঘ উনত্রিশ বছরের মামলায় আসামীদের জবানবন্দীর সূত্র ধরেই অপরাধীদের এক বিশাল চক্রের (Criminals Ring) সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল পুলিশ আর সেই চক্রের সঙ্গে লিপ্ত আছে জানা গেল এমন অনেক ব্যক্তি যারা চতুর্দশ লুইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুই শুধু নয় অত্যন্ত সম্মানিত অভিজাত এবং উচ্চবংশজাত। তাদের এবং ফ্রান্সের রাজা লুই তার নিজের মানমর্যাদা বাঁচানোর জন্য সেই প্রায় তিনদশকব্যাপী মামলার পর্বতপ্রমাণ নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। রেকর্ডের বেশিরভাগই তিনি ভস্মীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতি সামান্য যে অংশটি লেলিহান আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছিল তা আজও সযত্নে আছে প্যারিসের বিবলিওথেকা ন্যাশনালে। সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক (নোংরা কুৎসিত এবং বীভৎস) সেই কেসের ইতিবৃত্ত কখনই হয়তো ফ্রান্সের গণ্ডি পেরিয়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তো না যদি উইচক্র্যাফট এবং ব্ল্যাক আর্টের বিদগ্ধ গবেষক রোনাল্ড শেঠ (Ronald Seth) সেই রেকর্ডের কিছু অংশ ইংরাজিতে অনুবাদ না করতেন। এখানে তারই হুবহু বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো।

সেই সময়

প্যারিসের এই অভিজাত মহলের পাপচক্রের জন্ম হয়েছিল ঠিক তখন, যখন চতুর্দশ লুই দীর্ঘ ছত্রিশটি বছর রাজত্বকাল শেষ করেছেন এবং আরও অনাগত ছত্রিশটি গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তও ফ্রান্সের সিংহাসনে নির্বিঘ্নে সমাসীন থাকবেন। এই মামলার কুশীলবদের মস্তিস্কে এই কুৎসিত অনাচারের চক্রান্ত ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল সেই সময়—যখন ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণী সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বিপুল সম্পদের বিস্ময়কর প্রাচুর্যে। আর অনিবার্যভাবেই তাদের সেই অগাধ ঐশ্বর্য থেকে বিলাসব্যাসনের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছিল এই অকল্পনীয় ব্যভিচার।

প্রথম সূত্রপাত

১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

স্থান নটরড্যাম গীর্জা।

বিশপ। (জনৈক মহিলা উদ্দেশ্যে)—বল—বল, লর্ড যীশুর কাছে খোলাখুলি বল—

জানো দয়ার অবতার, পাপীতাপী এবং সমস্ত মানুষের ত্রানকর্তা প্রভুর কাছে অনুতপ্ত হয়ে নিজের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করলে তাদের তিনি ক্ষমা করেন—

মাঝবয়সী মহিলাটি মাথা নীচু করে বলতে শুরু করেছিল, ফাদার আমি একজন পুরুষ এবং দুইটি স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি। আমি খুব গরীব। স্বামী আর একজনকে বিয়ে করে চলে গিয়েছে। তার তিন তিনটি ছেলেমেয়ে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে উনি নতুন সেই মাগী নিয়ে স্ফূর্তি করছেন। আর আমি আধপেটা খেয়ে না খেয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। অনেক ভেবেচিন্তে ফরচুন-টেলারের (ভবিষ্যৎবক্তা) ব্যবসা খুললাম। সাইনবোর্ডে আরও লিখে দিলাম—যার জীবনের যে সমস্যাই থাকুক, তা সমাধান করা হয়—প্রচুর লোক আসতে শুরু করল। কিন্তু—

কিছুই তো জানি না—না জানি জ্যোতির্বিদ্যা—না জানি বশীকরণ। অতএব মাটিতে চকখড়ি দিয়ে আঁকিবুকি করে আর আন্দাজ করে যা খুশি বলে বেশ পয়সা রোজগার করতে শুরু করলাম। আর একজন খুব বড় গুণিনের কাছ থেকে বশীকরণ এবং শত্রুর অনিষ্ঠ করার ওষুধ কিনে নিয়ে এলাম।

যে তিনজন এসেছিল আমার কাছে তাদের প্রত্যেকেরই দাম্পত্যজীবন ছিল বিষময়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিল। আমি দিলাম গুণিনের সেই ওষুধ। ফাদার—সেই ওষুধ খেয়ে তারা দিনতিনেক খুব যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে মরে গেল।

আমার কি দোষ ফাদার? আমি তো জানি না গুণিন কী ওষুধ দিয়েছিল। মানুষগুলো খুন হবে জানলে কি আর আমি দিতাম ওই ওষুধ? ফাদার না জেনে পাপ করলে ঈশ্বর কি ক্ষমা করেন না।

—গুণিনটি কে? ফাদার গম্ভীর ও কঠোর কণ্ঠে বললেন।

ফাদার! আমি খুব অনুতপ্ত, ফাদারের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে স্ত্রীলোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

দিন দুয়েক পরে আর একজন মহিলাও গীর্জায় এসে ঠিক একই অপরাধের স্বীকারোক্তি করেছিল? ফাদার বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা কেউই বিষের সেই গোপন উৎস সেই গুণিনের নাম প্রকাশ করে নি।

ফাদার আর কি করবেন? পুলিশকে জানিয়েছিলেন এই দুইটি স্ত্রীলোকের

কথা। শুধু বিশপের কথার ওপর ভিত্তি করেই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছিল কিম্বা অন্য কোন স্টেপ নিয়েছিল কি না—সে সম্বন্ধে জানা যায় না।

এই ঘটনার দিন দুই পরেই প্যারিসের আকাশে ছড়িয়ে পড়ল ভয়াবহ এক গুজব—ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চক্রান্ত চলছে—সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের ভেতরে ও বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো কঠোর করা হলো। পুলিশ কমিশনার নিকোলাস ছ লা রেনীর (Nicholas de la Reynie) নির্দেশে পুলিশবাহিনী সারা শহরে তোলপাড় করে খুঁজতে লাগল বিষের গোপন কারবারীদের ডেরা অর্থাৎ ক্রিমিন্যাল ডেন। কিন্তু—

একমাস ধরে খোঁজখবর করেও কোন কিনারাই করতে পারলেন না পুলিশ-সাহেব রেনী। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, বিশাল রাজপ্রাসাদের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ভেতরে বাস করে কেউ গোপনে বিষের কারবার করছে না তো ? প্যালেসের বাসিন্দাদের ইনট্যারোগেশান বা জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তাব জানাতেই রাজার একান্ত সচিবের—ষ্ট্রিক্টলি কনফিডেনশিয়াল নোট এল।

হিজ একসেলেনসি ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়েছেন আপনার প্রস্তাবে। মহামান্য নৃপতিকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার হুমকি—নিতান্তই একটা ভিত্তিহীন গুজব ! রাজপ্রাসাদের প্রতিটি মানুষ মহামান্য রাজাকে দেবতার মত ভক্তি করে। ভালবাসে। তারা কেউই হিজ একসেলেনসিকে বিষ দেবে—এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। শহরের আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখুন—কেউ বিষ-টিস নিয়ে বিজনেস করছে কি না।

সেই দুইটি স্ত্রীলোকের (যারা স্বীকারোক্তি করেছিল) খোঁজে নটরড্যাম গীর্জায় গেলেন পুলিশসাহেব রেনী। ফাদার তাদের কোন ঠিকানা নিয়ে রাখেন নি। অতএব তিনি অন্য পুলিশী পন্থা ধরলেন। প্যারিসের সর্বত্র এবং বিশেষ করে প্রসটিটিউটদের (ক্রিমিন্যাল ডেন) কোয়ার্টারের আশেপাশে সাদা পোশাকে ওয়াচার পোস্টিং করে দিলেন। এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। ওয়াচাররা উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু খবর দিতে পারল না। কিন্তু—

পুলিশ কমিশনার রেনী রহস্যের অন্ধকারে প্রথম আলোর রেখা দেখতে পেলেন একেবারে আকস্মিকভাবে। সাহেবের আর্দালী কোন কাজে শহরের এক শ্রীহীন দরিদ্র শ্রমিক পল্লীর ভেতর দিয়ে চলেছিল যেতে যেতে হঠাৎ তার কানে এল তীক্ষ্ণ স্ত্রীকণ্ঠের এই কথাগুলো :

আরে আমাকে আর পায় কে ? বড় বড় সব লোক কত ভাচেস্, কত

প্রিনসেস, কত মারকুইস লর্ডস আমার কাছে লাইন দিয়ে বসে থাকে। তারা কেউ স্বামীর হাত থেকে রেহাই পেতে চায়, কেউ বা গোপনে গর্ভপাত করতে চায়—তাদের সমস্যার শেষ নেই, একটু থেমেই আবার বলল,—কিছুদিন পরেই বড়লোকদের পাড়ায় গিয়ে ভাল ফ্ল্যাট কিনে পায়ের ওপর পা দিয়ে দিব্যি সারাটা জীবন……

আর্দালী মাথা উঁচু করে শ্যাওলাধরা ইট বের করা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল, সাইনবোর্ডে লেখা আছে মারিয়া বসে—ফরচুন টেলার!

পুলিশসাহেবের মনে হলো, মারিয়া বসে কেমন করে অ্যাবোরশান করায়—কেমন করেই বা স্বামী-স্ত্রীর ভেতরের বিবাদ মিটিয়ে দেয়, ভবিষ্যৎ বলেই বা কি করে? সব কি মন্ত্রপূত ওষুধের সাহায্যেই করে—কি সেই ওষুধ?

খট্-খট্-খট্—মারিয়ার দরজার কড়া বেজে উঠল। দরজা খুলতেই ঘরে এল অভিজাত এক তরুণী। এসেই কোন ভূমিকা না করেই মারিয়ার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বলল, আমাকে দয়া করে স্কাউণ্ড্রেল, ড্রাঙ্কার্ড, লুজ ক্যারেক্টার হাসব্যাণ্ডের হাত থেকে বাঁচান ম্যাডাম।

এ আর কঠিন কি? মৃদু হেসে মারিয়া বলল, এমন ওষুধ—অবশ্যই মন্ত্রপূত ওষুধ দেব যে বাছাধন পালাতে পথ পাবে না—

সেই সুন্দরী যুবতী তাকে দেওয়া স্বামার কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার মন্ত্রপূত ওষুধ নিয়ে কে জানে কেন সোজা চলে এল কমিশনারের চেম্বারে। মসিয়ে রেনী শুধু গম্ভীর হয়ে বললেন ওষুধ নিয়ে এসেছেন?—

ইয়েস স্যার।

আপনি কে বুঝতে পারে নি তো—

নো—মসিয়ে:

এই তরুণী মেয়ে গোয়েন্দার (Female Detective) নিয়ে আসা ভবিষ্যৎবক্তা এবং গুণিন মারিয়ার ওষুধ কেমিক্যাল একজামিনেশন করে জানা গেল ওষুধ নয় মারাত্মক বিষ। সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ি তল্লাসী করে পেয়ে গেল আরও অনেক পরিমানে মজুত করা বিষ। মারিয়া বসে-কে গ্রেপ্তার করা হলো।

১নং আসামী মারিয়া বসে

বিবসিওথেকে ন্যাশনালের রেকর্ডের ভিত্তিতে মারিয়ার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এখানে বলা হলো।

মারিয়ার বয়স ৩৩। রুক্ষ চেহারা। অতিরিক্ত মদ্যপানে চোখদুটো

স্বাভাবিক রং হারিয়ে ফেলে লাল হয়ে থাকে। আর তাঁর এই দুষ্কৃতিতে আর একজন সঙ্গীনিও ছিল তার নাম লা দামে ভিগোরিউকস। এই মহিলা আবার মারিয়ার ভূতপূর্ব দুই এবং বর্তমান স্বামীর প্রেমিকা। একই শয্যায় রাত্রিবাস করে ভিগোরিউকস, মারিয়া এবং তার বর্তমান স্বামী। ভিগোরিউকস এবং মারিয়া এই ব্যবসা করছে গত তিন বছর ধরে। তারা তিন বছরে আড়াইশো নবজাত অবাঞ্ছিত শিশু হত্যা করেছে। আর স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের ব্যাপারে স্বামী বা স্ত্রীকে মন্ত্রপূত ওষুধের নামে বিষ দিয়ে হত্যা করার সংখ্যা প্রায় ১০০০। অভিনব ছিল মারিয়ার বিষ দেওয়ার টেকনিক—যে স্ত্রীলোক প্রার্থী হয়ে যেত তাকে (যদি স্বামীকে তার অবাঞ্ছিত মনে হয়) তার স্বামীর একটা সার্ট আনতে বলতো। সেই সার্ট আরসেনিক সলিউশানে ভিজিয়ে দিত মারিয়া। এই সার্ট গায়ে দিলেই ভদ্রলোকের সারা শরীরে দগদগে ঘা (দেখতে সিফিলিসের) বেরিয়ে যাবে। তখন প্রার্থী স্ত্রীলোকটি আবার আসবে মারিয়ার কাছে। মারিয়া তাকে একটা মলম দেবে। স্ত্রী এসে তার স্বামীকে বলবে ঘা-য়ের জায়গাগুলোতে এই ওষুধ মালিশ করো—দেখবে খুব আরাম পাবে—যে ওষুধ দিয়েছে তিনি প্যারিসের সবচাইতে বড় ওঝা—

আসলে সেই অলৌকিক ওষুধ আরও বেশি উগ্র বিষ, ঘায়ে সেই মলম মালিশ করলেই কয়েক মিনিটের ভেতরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

কিন্তু মারাত্মক এই বিষ মারিয়া বসে কি করে পেল? তার সঙ্গে আরও সুদীর্ঘ সময় জেরার ফলে জানা গেল, রাজপ্রাসাদের বাশিন্দা মহামান্য নৃপতির ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক ডিউক অফ লুকসেমবার্গ এবং একদা রাজার প্রণয়িনী এবং চোখের মণি ম্যাডাম দ্য পলিজেনস প্রমুখ কয়েকজন এই পয়জন বা বিষের গোপন কারবারীদের চক্রের সঙ্গে জড়িত।

পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই খবর পাওয়া মাত্রই এদের বিচারের জন্যই সেই বিশেষ আদালত স্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন চতুর্দশ লুই। তাঁর মনে হয়েছিল হয়তো পলিজেনসের নাম যখন শোনা গিয়েছে তখন মনটেসপেন, টিনজারী ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য মিসট্রেসরা থাকাও বিচিত্র নয়।

[কিন্তু রাজবাড়ির লোকদের জেরা করা এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কি না—তার কোন রেকর্ডই পাওয়া যায় নি।]

মারিয়ার জবানবন্দীর সূত্র ধরেই জানা গেল, আর এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বিখ্যাত গুণিনের কথা। তার ঘর সার্চ করে পুলিশ পেয়েছিল মোমের

তৈরি মানুষের মূর্তি, যাদুবিদ্যার বই। কয়েকটি কালো মোমবাতি। পবিত্র পাত্র বা চ্যালিশ। গুণিনের নাম লা ফিলেসট্রি। এক রূপসী তরুণী। কিন্তু তার চোখে মুখে ব্যভিচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ সুস্পষ্ট।

২নং আসামী লা ফিলেসট্রি

ফিলেসট্রি মুখে যেন চাবি এঁটে এসেছিল। কোন কথাই বলে না। পুলিশ বলল, ম্যাডাম চুপ করে থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন না—শুরু হয়েছিল লা ফিলেসট্রির ওপরে প্রচণ্ড পুলিশী অত্যাচার। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বলেছিল সে, হুজুর আর চাবুক মারবেন না। বলছি—সব বলছি—

তার বক্তব্য তার জবানীতে বলা হলো—মারিয়া বসের ব্যবসা এবং নাম ডাক আমাকে উৎসাহিত করেছিল। আমি তিনবার বিয়ে করেছি। কোন হাজব্যাণ্ডের সঙ্গেই আমার কখনো বনিবনা হয় নি—আরও দশবার বিয়ে করলেও হতো না। পুরুষ মানুষদের চাহিদা বড্ড বেশি—কিন্তু থাক সেসব কথা।

জীবন ছিল বিস্বাদ। আমার মনে হয়েছিল শয়তানের আরাধনা করে যদি মন্ত্রতন্ত্র, জড়িবুটি করার অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারি—

আমারই আমন্ত্রণে ব্ল্যাক মাসের বিখ্যাত প্রিস্ট ফাদার ডেশাইজ এবং ফাদার কটন এলেন। তাঁরা আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করতে বললেন। যে ছোট ঘরে আমি সদ্য একটি শিশু প্রসব করেছিলাম, সেই ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ করে ফাদার ডেশাইজ তিন চারটি কালো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। আমাকে চাপা গলায় চিৎকার করে বললেন দেখ,—ফিলেসট্রি মোমবাতির জ্বলন্ত শিখার ভেতরে শয়তান আবির্ভূত হয়েছেন।

প্রসবের ধকলে আমি দুর্বল ও অবসন্ন। আচ্ছন্নের মত হয়ে তখন মেঝেতে শুয়ে আছি। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মোমের আলোর দিকে তাকিয়ে মনে হলো এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ফাদারকে সঙ্গে সঙ্গে বললাম—খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে আমি আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম—

তারপরেই আমার অনুমতি নিয়ে আমার সদ্যজাত শিশুটিকে ফাদার হত্যা করে চ্যালিশে (পবিত্র পাত্রে) তার কিছু রক্ত রাখলেন। আমার উন্মুক্ত উদরের ওপরে হাত রেখে ফাদার মৃদু কণ্ঠে মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরেই আমার প্ল্যাসেণ্টা (ফুল—ভ্রূণের নাভি নাড়ীর সঙ্গ যুক্ত মাংস পিণ্ড—placenta) বেরিয়ে এল। পুরোহিত ডেশাইজ সেই ফুল চ্যালিশে রেখে আবার মন্ত্রপাঠ করলেন—'He conducted mass over the placenta…'

তারপর দিনই ঘরের বাইরে রাস্তার দিকে টাঙিয়ে দিলাম—সাইনবোর্ড

দৈবক্ষমতাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ বক্তা এবং মন্ত্রপূত মায়া শরবত বিক্রেতা। অনেক খদ্দের আসতে শুরু করল। সাধারণ চিনির শরবতের সঙ্গে আরসেনিক, সালফার এবং ভিট্রিওল (সালফিউরিক অ্যাসিড গন্ধকদ্রাবক), তার সঙ্গে বাদুড়ের এবং ব্যাঙের শুকনো রক্ত দিয়ে তৈরি হতো লাভ ফিলট্রেস (Love philtres) বা মায়া ওষুধ প্রচুর বিক্রি হতো। আমার অনেক পয়সা হয়েছিল। আমার এই বিষাক্ত ওষুধে অনেক মেয়েপুরুষের মৃত্যু হয়েছে হুজুর—

এই ওষুধ এবং শিশুহত্যা ও আরও বহুলোকের মৃত্যুর জন্য লাভ ফিলেসট্রিকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল।

৩নং আসামী ফাদার ড্যাভোট

ফাদার ড্যাভোট সম্বন্ধে কেস রেকর্ডে আছে—Father Davot had conducted amatory mass over a naked girl, throughout which he had continually kissed the girl's genitals অর্থাৎ ফাদার ড্যাভোট একটি নগ্ন বালিকার ওপরে কামোদ্দীপক মন্ত্রপাঠ করেছিলেন এবং যতক্ষণ মন্ত্র পড়া চলছিল ততক্ষণ তিনি মেয়েটির গোপনাঙ্গে চুম্বন করে চলেছিলেন।

[ফাদার ড্যাভোট মারিয়া বসে এবং লা ফিলেসট্রির মত কোন মন্ত্রপূত ওষুধ বা বিষের কারবার করতেন কি না জানা যায় না।]

৪নং আসামী ফাদার গুইয়িবেরিগ (Guiborg)

৫নং আসামী মাদাম মিললে ডা অসিলেটস (Mille Des Oscillets)

এদের বৃত্তান্তে অগ্রসর হওয়ার আগে বলা দরকার, ফাদার ডেশাইজ, ফাদার ড্যাভোট এবং ফাদার গুইয়িবেরিগ প্রমুখরা ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর আশির দশকের প্যারিসের কুখ্যাত ব্ল্যাক মাস প্রিস্ট অর্থাৎ অশুভশক্তি সাধনার পুরোহিত তদন্তে জানা যায় মারিয়া বসে, লা ফিলেস্ট্রি এবং এই মামলায় লিপ্ত প্রতিটি মহিলাই উপরোক্ত পুরোহিতদের শিষ্যা।

চার নম্বর আসামী ফাদার গুইয়িবেরিগের প্রধান কাজ ছিল—উলঙ্গ নারীদেহের ওপরে যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে তাকে অসাড় করে দিতেন। তারপরে মেয়েটি না কি মোহাচ্ছন্ন মানুষের মত যে কথাগুলো বলতো—তার ভেতরে গুপ্তধনের আভাস পাওয়া যেত। আবার কখনো বা ফাদার যাদুমন্ত্রের বদলে সেই বিবসনা নারীর ওপরে কামনা-উদ্দীপক মন্ত্রপাঠ করতেন। তীব্র কামনার মাদকতায় তার স্নায়ুগুলো কেমন অবশ হয়ে যেত আর সে তখন যা বলতো—তা দৈববাণী—এসব ফাদারের (গুইয়িবেরিগের) বক্তব্য।

আসামী সুন্দরী তরুণী মাদাম মিললে ত্ত অসিলেটস এলেন ফাদার গুইয়িবেরিগের কাছে। মাদামের মুখখানা বিষণ্ণ। সঙ্গে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। মিললে বলল, ফাদার, আপনি তো জানেন আমি হিজ একসেলেনসির মিসট্রেস। এখন তিনি কেন যেন আমাকে সহ্য করতে পারেন না—নিত্যি নতুন নতুন যে যুবতী মেয়েরা আসছে তাদেরকেই অঙ্কশায়িণী করছেন রাজা—

. গুইয়িবেরিগ আরও কিছু বলেছিল কি না সে কথা নেই রেকর্ডে। ফাদার তার সাহায্যের জন্যই লাভ ফিলট্রেস বা মায়া ওষুধ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মাদাম মিললেকে আর আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—কোনরকমে এই ওষুধ রাজা যাকে বেশি ভালবাসেন তাকে খাওয়াতে পারলে, রাজা আর তাকে ভালবাসবেন না আপনার দিকে নজর পড়বে।

মাদাম মিললে উৎফুল্ল হলেন। তার সঙ্গী ভদ্রলোক ফাদারকে দিলেন বিশেষ যাদুমন্ত্রের কথা—(words of conjurations)। ফাদার তাদের জানালেন আপনারা দুজনে ওষুধ তৈরি করুন—আমি সেই সদ্য প্রস্তুত লাভ ফিলট্রেসের ওপরে যাদুমন্ত্র পাঠ করবো।

ফাদার অন্য আর একটি ঘরের থেকে নিয়ে এলেন চ্যালিশ বা পবিত্র পাত্র। কিন্তু এই ওষুধের প্রধান উপকরণ হল—seeds of both sex. নারী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের বীজ। মাদাম মিললের ঋতুকাল চলছিল। তাই তিনি পবিত্র পাত্রে দিলেন ঋতুর রক্ত। আর সেই ভদ্রলোক সেই ঘরে ফাদারের খাট আর দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে নিজেকে উত্তেজিত করলেন। ফাদার চ্যালিশ নিলেন তার শুক্র। সেই ঋতুরক্ত এবং শুক্রের মিশ্রণের ভেতরে আবার মিশিয়ে দেওয়া হলো বাদুড়ের এবং ব্যাঙের শুকনো রক্তের চূর্ণ বা পাউডার। এবার তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো সামান্য একটু আঠার গুঁড়ো শুধু শক্ত করার জন্য। সেই মিশ্রিত পদার্থপূর্ণ পবিত্র পাত্র বা চ্যালিশ স্পর্শ করে ফাদার গুইয়িবেরিগ মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পর মন্ত্রপাঠ শেষ হলো। ম্যাডাম মিললে এবং তার সঙ্গী ভদ্রলোক দুইটি শিশিতে ভরে সেই মন্ত্রপূত ওষুধ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপরে আর কিছু জানেন না ফাদার।

বলাবাহুল্য এই ওষুধ বিষাক্ত। যে খাবে তার ভয়ানক ক্ষতি হবে এবং চাই কি জীবনহানিও ঘটতে পারে। কিন্তু শুধু মাদাম মিললে অসিলেটস কেন? রাজপ্রাসাদের মহামান্য নৃপতির প্রণয়াভিলাষিণী প্রতিটি রক্ষিতা বা

মিসট্রেসকেই এই মন্ত্রপূত ওষুধ বা বিষের সাহায্য নিতে হতো। কেননা রাজার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য পরস্পরের ভেতরে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ছিল বিষাক্ত বিদ্বেষ। তাই যে যার পথের কাঁটাকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে চাইত। আর এই বিষের কারবারে মিসট্রেসদের ভেতরে সেরা ছিলেন ম্যাডাম দ্য মন্টেসপ্যান। এসব তথ্য এই কেসের প্রসিডিংস থেকেই ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। রেকর্ডে আছে Mine de Montespan was the fountain head of all these witchcraft and blackmass. মন্টেসপ্যানই রাজার নতুন মিসট্রেস তন্বী সুন্দরী সুযৌবনা মিলডে ফন্টাগনেসকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল—

ইতিহাস কুখ্যাত চেমব্রে আরডেন্টে অ্যাফেয়ারসের আরও নানা ঘটনার ভেতর থেকে উপরোক্ত কয়টি কেসের কথা বলে উইচক্র্যাফট বিশেষজ্ঞ রোন্যাণ্ড শেঠ মন্তব্য করেছেন—All these obscene rites dependent on the two centuries belief in Witchcraft which had evolved out of earlier theories of the great powers of the evil—অর্থাৎ এইসব অশ্লীল ক্রিয়াকলাপের মূলে আছে ডাইনীবিদ্যা বা উইচক্র্যাফটের প্রতি দুই-দুইটি শতাব্দীর নিবিড় ও অন্ধবিশ্বাস। শয়তানের শক্তি অবশ্যই অসাধারণ—প্রাচীনদিনের এই মতবাদ বা থিয়োরী থেকেই জন্ম নিয়েছে ডাইনীবিদ্যার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু কালক্রমে, মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আর একটি মতবাদ Good god counteracted the bad Devil—কল্যাণকারী ঈশ্বর শয়তানের অশুভশক্তিকে প্রতিহতও করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দ্বান্দ্বিক সত্য বা দ্বৈত মতাদর্শ কিংবা ডুয়ালিজম (Dualism) দেখা দিল। আর তখুনি নিতান্তই অশ্লীল এবং ঘৃণ্য এই ক্রিয়ানুষ্ঠানের গায়ে ধর্মীয় ক্রিয়া প্রকরণের লেবেল লাগানো হলো। তাই কালো মোমবাতি জ্বালাতে হয়—প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়—সেই শক্তিমান অদৃশ্য শয়তানের উদ্দেশ্যে···প্রয়োজন হয় চালিশের বা পবিত্র পাত্রের।

সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের আপাত অতি ন্যক্কারজনক অশ্লীল ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধে ডাইনীবিদ্যার নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় (Witchcraft in Western Europe) ডক্টর মারগারেট দিয়েছেন আরো অভিনব এক ব্যাখ্যা। প্রাচীনদিনের বৃটেনের ডাইনীরা ছিল উর্বরাশক্তির পূজারী। Fertility Culf-এর প্রতি ছিল গভীর বিশ্বাস। বিবসনা নারী, এবং তার উদর নিঃসন্দেহে উর্বরাশক্তির প্রতীক। বৃটেন থেকেই ফ্রান্সে, ইটালীতে, গ্রীসে এবং জার্মানীতে ছড়িয়ে

পড়েছিল ক্যাটিলিটি কান্টের ভক্ত সমগোত্রীয় ডাইনীরা। কিন্তু—

থাক এসব কথা। চেমব্রে আরডেন্টে অ্যাফারের মামলার পরিণতি কি হলো?

দিনের পর দিন রাজপ্রাসাদের বাসিন্দা এবং মহামান্য নৃপতির ঘনিষ্ঠ অনুচর এবং তাঁর বিলাসের সহচরীদের কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে পড়ছিল দেখে তিনি মামলা স্থগিত করে দিয়েছিলেন (১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ)।

১৬৭৮ থেকে ১৬৮২ সালের চেমব্রে আরডেন্টে মামলার পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হলো।

গ্রেপ্তার—৩১৯

জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ—১০৪

ফাঁসী—৩৬

গিল্যাটিন
শিরচ্ছেদ যন্ত্র বিশেষ } ৪

নির্বাসন—৩৪

কিন্তু মহামান্য নৃপতির অনুগ্রহপুষ্ট, ধনী অভিজাত এবং রাজঅন্তপুরের প্রমোদসঙ্গিনী আসামীদের বেকসুর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আর সারা দেশে আইনজারী করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যৎ বলার ব্যবসা এবং ডাইনীচর্চাকে কুসংস্কার বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

ধনী সম্ভ্রান্ত এবং মহামান্য রাজার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল বলে জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল আর—

১৭০৯ সালে চতুর্দশ লুই চেমব্রে আরডেন্ট মামলার রেকর্ড ভস্মীভূত করে অভিজাত সমাজের কলঙ্ককে নিঃশেষে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। কে জানে, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সেই ক্ষোভের ভেতরেই আটদশক পরের ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে ছিল কি না।

পনের

অকসফোর্ড এবং কেমব্রীজেও শুরু হয়েছিল-
ডাইনীবিদ্যার চর্চা!

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ব্ল্যাকমাস বা ব্ল্যাক-আর্টের অনুশীলন চলে এসেছিল ইংল্যাণ্ডে। এখানেও ফ্রান্সের মতই ধনী অভিজাত ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা অশুভশক্তি বা শয়তানের আরাধনায় মত্ত হয়েছিল। ডাইনীবিদ্যার ইতিহাসে আছে Now Blackmass Crossed the Channel to XVIII Century England and also find a profusion of Devil Worshippers, making thir own Contribution to to the Dark Arts.

আর ব্ল্যাক মাসের মতই এই শয়তানের সাধনার কলাকৌশল বা ব্ল্যাক আর্টস অভিজাত ও বিত্তশালী লণ্ডনবাসীদের একেবারে একচেটিয়া হয়ে উঠেছিল। ব্ল্যাক আর্টসের কুশীলবদের সংগঠনের নাম হেলফায়ার ক্লাব (Fire Club)। ১৭১০ সালে ইংল্যাণ্ডে কুইন অ্যানীর রাজত্বকালে লণ্ডনের প্রাচীনতম গীর্জা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির কাছে এক জীর্ণ সরাইখানায় প্রথম এক হেলফায়ার ক্লাবের অস্তিত্ব জানা গিয়েছিল। তার দশবছর পরে (১৭২০) লণ্ডনের আর এক পুরানো ঐতিহাসিক বাড়ি সামারসেট হাউসে ছিল আর একটি হেলফায়ার ক্লাব। এই সমিতির পরিচালক ছিলেন এক জ্যাকোবাইট (ইংল্যাণ্ডের রাজা ক্যাথলিক মতাবলম্বী দ্বিতীয় জেমসের অনুগত ডক্টর এবং লর্ড হোয়ারটন। শোনা যায়—ক্লাবের মেম্বরদের উপস্থিতিতে ডক্টর হোয়ারটন কোন গুপ্ত ক্রিয়াপ্রক্রিয়া করছিলেন। ঘর ছিল ঘুটঘুটি অন্ধকার। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছিল। অদূরে রূপোর তৈরি পবিত্র পাত্রে মোমের আলো ঠিকরে পড়ছিল। ক্লাবের সভ্যরা প্রত্যেকে ঘন অন্ধকারে এক একটি প্রেতমূর্তির মতো বসে স্থির দৃষ্টিতে মোমের শিখার দিকে তাকিয়েছিল। ডক্টর হোয়ারটন অস্ফুটস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মন্ত্র বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ক্লাবের সভাপতি ডক্টর হোয়ারটন। চোখেমুখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। চাপা কর্কশগলায় চিৎকার করে বললেন, চ্যালিশ শূন্য কেন? তোমরা কি জানো না, তাজা রক্ত পান

করতে ভালবাসেন শয়তান—তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই উৎসাহী এক ইউনিভারসিটি স্টুডেন্ট ধারালো ছুরি দিয়ে বুকের একটুকরো মাংস কেটে ফেলল। ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত। বিদ্যুৎগতিতে হোয়ারটন চ্যালিশটা ধরলেন ছাত্রটির কাটা জায়গাটায়। চোখের পলকে পবিত্র পাত্রটি কানায় কানায় ভরে উঠল তাজা রক্তে।

ও—হাউ হরিবল! বলেই আর্তনাদ করে হঠাৎ চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেল আর এক সভ্য। সে সেই বীভৎস রক্তাক্ততা দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এবং শুধু তাই নয়—সেই যে অসুস্থ হয়েছিল আর সেরে উঠতে পারে নি। কয়েকমাস পরে মারা গিয়েছিল। He sercamed out with terrific imprecations that he was lost eventually.

এই কুখ্যাত হেলফায়ারের ইতিবৃত্ত বলতে গিয়ে গুপ্তবিদ্যা এবং ডাইনীবিদ্যার গবেষক এবং অকাল্টিসায়েন্সের বা ইন্দ্রায়তীত বিজ্ঞানের বিখ্যাত লেখক মন্টেগু সামারস বলেছেন—খুবই দুঃখের বিষয়, শুধু ধনী অভিজাত শ্রেণীই নয়—লণ্ডনের দু-দুটো বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রীজ আর অকসফোর্ডেও এই পাপ—এই বিকৃতি প্রবেশ করেছিল—Unfortunately Satanism was practised also in the two Universities.

১৭২১-২২ সালে কেমব্রীজেও না কি হেলফায়ার ক্লাবের অস্তিত্ব ছিল। ১৭২৭ সালে শুরু হলো পুরোদমে অকসফোর্ডেও শয়তানের আরাধনার বীভৎস ক্রিয়াকলাপ। ১৭৪৫ সালে অকসফোর্ড ইউনিভারসিটির এক ছাত্র জর্জে সেলউইন (George Selwyn) হেলফায়ার ক্লাবের প্রেতচক্রে (পরলোক থেকে প্রেতকে আহ্বান করার বৈঠক) যোগ দিয়েছিল। এবং তার হাত কেটে তার রক্ত চ্যালিশে রেখে তার গায়ের জামাটা সেই রক্তে ভিজিয়ে কী সব মন্ত্র পড়ছিল—এই অপরাধে সেলউইনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল।

কঠোর ব্যবস্থা বা স্ট্রং ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশান নিলে হবে? কর্তৃপক্ষ কিম্বা প্রোটেক্টাররা কিন্তু এই শয়তানের পূজা, বীভৎস পিশাচের মত ক্রিয়ানুষ্ঠানের স্রোতকে প্রতিহত করতে পারল না।

দেখতে দেখতে অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হলো। এল উনবিংশ শতাব্দী। অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল হেলফায়ার ক্লাবের কুশীলবদের অ্যাকটিভিটি। শয়তানের আরাধনা করতে গিয়ে কী বিস্ময়কর ও অলৌকিক এবং মর্মন্তুদ

ঘটনা ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন মণ্টেগু সামারস।

১৮২৯ সালে অকসফোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ব্র্যাসেনস কলেজে ঘটেছিল এই করুণ দুর্ঘটনা। লিখেছেন মণ্টেগু সামারস, এবং আরও জানিয়েছেন ব্র্যাসেনস কলেজের ফেলো এবং টিউটর রেভারেণ্ড টি. টি. চারটন এই ঘটনাটি আমাকে ঠিক যেমন বলেছিলেন ঠিক হুবহু তেমনি এখানে বললাম।

১৮২৯ সাল ডিসেম্বর মাস। সেদিন লণ্ডনে গভীর রাত্রির ঘন কুয়াশার সঙ্গে মিশে অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছিল।

কিন্তু সেই হৃদয়বিদারক করুণ ঘটনা বলার আগে ব্র্যাসেনস কলেজের চৌহদ্দিটা একটু বলা দরকার—

ব্র্যাসেনস কলেজের উত্তরদিকে সরু গলি ব্র্যাসেনস লেন। এই সংকীর্ণ রাস্তাটা বাঁদিকে খানিকটা গিয়ে মিশেছে টারল স্ট্রীটে, এই সংযোগস্থলের নাম র‍্যাডক্লিফ স্কোয়ার। এই স্কোয়ার থেকে ব্র্যাসেনস লেন ধরে ডানদিকে কয়েক গজ গেলেই ব্র্যাসেনস কলেজের ঠিক বিপরীত দিকে মুখোমুখি লিঙ্কন কলেজ। লিঙ্কন কলেজের গেট রাস্তার ওপরে যেমন, তেমনি ব্র্যাসেনস কলেজের পিছনটা ব্র্যাসেনস লেনের ওপরে। কলেজের সঙ্গে লাগোয়া হোস্টেল। এই রাস্তায় হাঁটলে দেখা যায়, হোস্টেলের সারি সারি গরাদ এবং তার দিয়ে ঘেরা জানালাগুলো ঝুলছে।

সেদিন ক্লাব থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় বারোটা-সাড়ে বারোটা হবে, ব্র্যাসেনস কলেজের অধ্যাপক এবং ফেলো রেভারেণ্ড টি. টি. চার্টন বলতে শুরু করলেন, আমি হন হন করে হাঁটছি—ব্র্যাসেনস লেনের মাঝামাঝি এসে পড়েছি হঠাৎ তরল অন্ধকারে মনে হলো হোস্টেলের জানালা দিয়ে কাউকে যেন জোর করে ঠেলে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

একী! হোস্টেলের ভেতরে এসব কি? আমার বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল যে ঘরটির জানালায় এই কাণ্ড হচ্ছে সে ঘরটি এক আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট বড়লোক ছাত্রের রুম। আর সেই ছেলেটি হেলফায়ার ক্লাবের সঙ্গে জড়িত সন্দেহ করা হয়।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম একটি খুব লম্বা লোক মাথায় কালো টুপি, কালো ওভারকোট। সেই অজানা মানুষটি প্রচণ্ড জোরে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রটিকে জানালার বাইরে ফেলে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ছাত্রের চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। বিকৃত মুখখানা ছাইয়ের মতো সাদা। ঠক ঠক করে কাঁপছে সে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, সেই রহস্যময় অজানা

আগন্তুকের মত্তহস্তীর মত প্রবল শক্তির সঙ্গে আমাদের ছাত্র কিছুতেই পেরে উঠছে না—তাকে ক্রমাগত জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে গলিয়ে বার করতে চেষ্টা করছে। আমি—আমি বোধহয় এক সেকেণ্ডের জন্য সেই উটকো মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ইস্—সে মুখ এমন কুৎসিত, এত ভয়ানক, এত বীভৎস যে আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার মনে হলো নিশিরাতের অন্ধকারে এই ছায়া দেহ এই মাটির পৃথিবীর মানুষ নয়—হতে পারে না—এ নিশ্চয়ই সেই নরকের গভীর অন্ধকার গহ্বর থেকে উঠে আসা সেই শয়তান যার আরাধনা করে এই ছাত্ররা, এই পর্যন্ত বলে থামলেন রেভারেণ্ড চার্টন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার আস্তে আস্তে যেন বহুদূর থেকে বললেন, কতদিন আগের কথা—কিন্তু আজও সেই ভয়ঙ্কর বিকট মুখখানা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে—আবার থেমে গিয়েছিলেন ধর্মপ্রাণ রেভারেণ্ড চার্টন। সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্মৃতির পীড়নে তাঁর মুখখানা কেমন ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারপরের ঘটনা প্রচণ্ড উত্তেজনা আর আবেগে অস্থির হয়ে কোনরকমে যা বলেছিলেন তা এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

রেভারেণ্ড চার্টন চিৎকার করে উঠেছিলেন, দারোয়ান দারোয়ান—কে কোথায় আছো—আর্তনাদ করে ছুটতে ছুটতে গলি ঘুরে ব্র্যাসেনস কলেজের গেটে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দারোয়ানের পাশের ঘর--সেই আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রর ঘর (যে ঘরের জানালায় কয়েক মুহূর্ত আগেই সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে এসেছেন) থেকে একদল যুবক ভয়ার্ত পশুর মত আর্তনাদ করতে করতে বেরিয়ে এল। এরা প্রত্যেকেই সেই কুখ্যাত হেলফায়ার ক্লাবের সভ্য। তাদের একজন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অস্ফুট আর্তনাদ করে বলল, তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন উঃ কী ভয়ানক, বলতে বলতেই সেই ছাত্রটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। দারোয়ান ছুটতে ছুটতে এসে বলল, রেভারেণ্ডকে—সাহেব—ঘরের ভেতরে আর এক বাবু কেমন করছেন—

চার্টন সেই ঘরে এসে দেখলেন সেই ঘরের মালিক—সেই আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রটি মেঝেতে শুয়ে কিসের যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে। থেকে থেকেই হিক্কা তুলছে—চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠছে উর্দ্ধমুখী। কয়েক মুহূর্ত পরেই তার বুকের ভেতরে প্রাণের ধুকধুকি থেমে গেল। আর দেখতে দেখতে সেই শবদেহটা কয়লার মত কালো হয়ে উঠতে লাগল।

বিচিত্র এই ঘটনাটি রেভারেণ্ড চার্টন নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছিলেন এ

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে নিশিরাত্রির সেই ভয়ঙ্কর মুখাকৃতির আগন্তুক কে? কেন মারা গেল হেলফায়ার ক্লাবের সেক্রেটারী (চার্টন পরে জেনেছিলেন) সেই বড়লোক ছাত্রটি?

ছাত্ররা দিনরাত শয়তানের ভজনা করতো—এই অলৌকিক ঘটনার কারণ সম্পর্কে বলেছেন প্রেততত্ত্ববিদ টারটুল্লিয়ান (Tartullian), প্রেতলোক কোন দুষ্টু প্রেতাত্মাই কালো কোট পরে শয়তানের রূপ ধরে এসেছিল—আর প্রেতাত্মাদের এক ধরনের স্থূলদেহ থাকে Soul has a Kind of body of Quality peculiar to them…এবং সেই দুষ্টু ও প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতাত্মা কোন কারণে শয়তানের পূজারীদের ওপরে বিরূপ হয়েছিল—

সেই থেকে এই হেলফায়ার ক্লাব আর কখনও শয়তানের আরাধনার ক্রিয়াঅনুষ্ঠানের চক্রে বসে নি। তবে জানা গিয়েছে—

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বশীকরণ, তুকতাক, প্রেতচক্র ইত্যাদি ব্ল্যাক আর্টের বা গুপ্তবিদ্যার চর্চা নাকি খুব গোপনে করতো—Witchcraft and necromancy were being practised clandestinely in the University of Oxford.

ষোল

সুপ্রাচীনকালের একটি বই থেকে এক অশুভ আত্মার আবির্ভাব হয়েছিল এবং ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটিয়েছিল।

এবার চলুন খাস লণ্ডন শহরে।

কিন্তু এই বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ দেওয়ার আগে বলা দরকার, বিশ্বাস করুন, আর নাই বা করুন, সুপ্রাচীনকালের এক বই থেকে শয়তানের আত্মা আবির্ভূত হয়ে ঘটিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। এই নিদারুণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল লণ্ডনের সমাজজীবন। উনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের খবরের কাগজ লণ্ডন টাইমসে, 'ট্রিবিউনে' ফলাও করে দিনের পর দিন ছাপা হয়েছিল সেই অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিশদ বিবরণ।

শুধু তাই নয়। ডাইনীবিদ্যার বিশারদ, মনস্তত্ত্ববিদ ও প্রেতবিদ্যার বিশেষজ্ঞরা অনেকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৈঠকে বসেছেন; দিনের পর দিন তাঁরা আলোচনা করেছেন। অনেক গুঞ্জন, অনেক গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল লণ্ডনের বাতাসে। কিন্তু—

থাক সেসব কথা। ঘটনা-টা-ই বলি কিন্তু এই কাহিনী জানতে হলে যেতে হবে ঘটনার পটভূমিতে।

হলওয়েল স্ট্রীট। রাস্তার দুদিকে তিনকোণা ছাদ দিয়ে ঘেরা সুন্দর সুন্দর বাড়ি প্রতিটি বাড়িতে পাতলা তক্তার ওপরে সিমেণ্ট দিয়ে, প্লাস্টার করা ছাদ। কোন কোন বাড়ি অবশ্য জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। পলেস্তারা খসে গিয়ে নোনা ধরা ইট দাঁত বের করে হাসছে।

এই বাড়িগুলোর খুব কাছেই প্রাচীন অলিম্পিক থিয়েটার। থিয়েটারের বাড়িটাও বহু বছরের বর্ষার জলে রোদে জীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। এই ভাঙ্গা থিয়েটারের বাড়ির পাশেই আঠারোর দশকের বিখ্যাত পান্থশালা—'রাইজিংসান!' রাইজিংসানের বাড়িটাও বাঁদিকে হেলে পড়েছে। পলেস্তারা খসে গিয়ে ইটের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে বুনো গাছ। এই রাস্তার বাড়িগুলোর ক্ষয়িষ্ণু, জীর্ণ চেহারা আর প্রাচীন পপলার গাছের পাতায় সাঁ সাঁ বাতাসের দীর্ঘশ্বাস যেন স্মরণ করিয়ে দেয়—কিছুই থাকে না—থাকে না কিছুই—

আজ আর কেউ বলতে পারবে না, এই রাস্তার ওপরেই কোথায়,

কোনখানে ছিল সেই পবিত্র জলাধার বা কূপ! যেখান থেকে হয়েছে এই রাস্তার নামকরণ—হোলিওয়েল! আসলে রাস্তাটির নাম, হোলিওয়েল স্ট্রীট। কিন্তু লোকের মুখে মুখে হয়ে গিয়েছে হলওয়েল!

এখন আর কেউ বলতে পারবে না, এই রাস্তার কোন বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়েছিল।

এখনো কি এখানকার বাড়িতে আছে প্রেতের আনাগোনা? তা নাহলে বুকসেলার রুফুস হপকিনসের এই মর্মান্তিক করুণ পরিনতি কি করে হলো? দিব্যি সুস্থ সবল মানুষ। এমন কিছুই নয়—পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়স। রাতে খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছে। শেষরাতের ঝুকঝুকি অন্ধকার থাকতেই, কেন কে জানে, বইয়ের দোকানে ঢুকেছিল। অমনি শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেল!

১৮৯৩ সালে রুফুস হপকিনসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে শুধু হোলিওয়েল স্ট্রীট নয় উইচ স্ট্রীট নয়, তার পাশে স্কোয়ার মারকেট নয়, সারা ব্রিটেন আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

হপকিনস ছিল হোলিওয়েল স্ট্রীটের অনেক পুস্তক বিক্রেতাদের ভেতরে এমন একজন যাদের জন্য এই হোলিওয়েল স্ট্রীটের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তরে। যেকোন বিষয়ের যে কোন বইয়ের নাম, তার প্রকাশকের নাম, প্রকাশের সময় ছিল হপকিনসের মুখস্থ। মনে হতো যেন হপকিনসের মাথার ভেতরে অদৃশ্য কমপিউটার বসানো আছে। প্রশ্ন করা মাত্র যান্ত্রিক নিয়মে নির্ভুল উত্তর বেরিয়ে আসছে।

প্রায় একশো বছরের পুরানো দোকান—হপকিনসের। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন এই দোকানঘরটা সামনের দিকটা একটু ঝুঁকে পড়া। ঠিক তার ওপরতলায় সারি সারি দুটো ঘরে সে তার স্ত্রী এবং দুই সাবালক ছেলে নিয়ে বাস করতো।

ঠাকুরদাদার আমলের দোকান। সে তার বাবার সঙ্গে এই দোকানে কাজ করতো। স্কুলের পাট চুকিয়ে দিয়ে সে বাবার সঙ্গে বইয়ের ক্যাটালগ করতো, ডেলী হিসাব রাখতো। প্রায়ই পেটিকোট লেনে এবং ক্যালিডোনিয়ান লেনের মার্কেটে নতুন এবং পুরানো চিত্তাকর্ষক বই কিনতে যেত।

সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সে হোলিওয়েল স্ট্রীটে বই বিক্রি করে চলেছে। তবে একটা কথা, বই বিক্রির চেয়ে সে বেশি আনন্দ পায় তার শোকেসের কাঁচের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রকমের মানুষ দেখে।

তার দোকানের সামনে ফুটপাতের ওপর ঝুলানো তিনটি শোকেস—তিনপেনী, ছয়পেনী আর এক শিলিং দামের অর্থাৎ সস্তা দরের বইয়ের শোকেস।

সেইখানে—সেই ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়েই নানাবয়সের নানারকমের খরিদ্দার ঝুঁকে পড়ে বই দেখে। হপকিনস ভেতর থেকে এই দৃশ্য দেখে খুব আনন্দ পায়।

সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বৈচিত্রময় মানুষ দেখে কখনো এতটুকু ক্লান্তি বোধ করে না। মানুষ—কত রকমের মানুষ—কত বিচিত্র তাদের চাহিদা।

কেউ চায় বিখ্যাত বই 'প্যারাডাইজ লস্টের' প্রথম সংস্করণ আবার কেউ হয়তো চায় অ্যালডাইনের 'ইনকুনাবুলা'। ছাত্ররা খোঁজে নিত্য নতুন সিলেবাসে পাল্টে যাওয়া পাঠ্যপুস্তক।

তারা প্রত্যেকে আলাদা। তাদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে হপকিনস। তাই বহুকাল পরে এলেও তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না তার। কখনও কখনও এমনও হয়েছে, কাউকে হয়তো দেখেছে নিতান্ত বালক। সে তখন চেয়েছিল কিউরিও, এখন চায় থুসিডিয়াস।

প্রত্যেককে—প্রত্যেক খরিদ্দারের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলেই বুকসেলার হপকিনসের ভুল হয় নি সেই বিচিত্র রহস্যময় মানুষটিকে চিনতে।

সেই লম্বা, ঢ্যাঙ্গা লোকটা যে বাইরের শোকেসের বইগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—সে হপকিনসের বহুদিনের চেনা হয়ে গিয়েছে।

সে মোটেই আর তরুণ নয়, হপকিনস লক্ষ্য করে, কেমন জীর্ণ চেহারা। গায়ে লম্বা কালো কোট। গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। আর তারই মত বয়সের ভারে জীর্ণ বারান্দাওয়ালা টুপি!

এই টুপিটার জন্যই তার মুখ কখনো দেখতে পায় না হপকিনস। লোকটা মাথা নাচু করে বই দেখে। টুপি দিয়ে মুখ ঢাকা থাকে। তবে হপকিনস অনুমান করে তার মুখখানা। লম্বা আর সরু এবং তার চেহারার মতই বয়সের রেখা আঁকা।

হপকিনস যখন স্কুল থেকে সবে বেরিয়েছে তখন লোকটাকে প্রথম দেখেছিল। সবসময়ই সস্তা দামের বই খোঁজে। কখনো কখনো তার হাতে বই থাকে। কিন্তু কখনো একটা তিনপেনীর বইও সে কেনে নি বা দোকানের ভেতরে এসে কোন বইয়ের খোঁজ করে নি।

পাল্টা বলা যায় হপকিনসও কখনো তাকে জিজ্ঞাসা করে নি—কি আপনি খুঁজছেন? সত্যি আদৌ তার কোন বইয়ের দরকার আছে কি না?

লোকটাকে ঘিরে হপকিনসের চিন্তায় ঢেউ ওঠানামা করে—ভদ্রলোক সত্যিই রহস্যময়। কেন—কেন ভেতরে এসে জিজ্ঞাসা করে না? মনে হয়

ভদ্রলোক গরীব। যে বই তার পছন্দ তার দামটা কুলিয়ে উঠতে পারছে না। হয়তো ভদ্রলোক যে বইটা চায়, তার দাম অনেক—অনেক বেশি।

আরও মজার কথা, ভদ্রলোক কখনো দিনে আসে না। আসে রাত্রে। ঠিক যখন আলো জ্বলে ওঠে তখুনি এসে হাজির হয়।

না। রোজ আসে না। আসে বছরে মাত্র দুই দিন—

২৪শে জুন আর—

৩০শে অক্টোবর

প্রথম দিনটি হলো—Mid Summer Dream (মিড সামার ড্রিম) উৎসবের দিন। আর একটা দিন অর্থাৎ ৩০শে অক্টোবর হলো হলওয়েল ইভ—খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন—

হপকিনস ভাবে, ভদ্রলোক কি তাহলে বছরে এই দু'দিনই বোনাস কি ডিভিডেণ্ট পেয়ে থাকেন? এটা খুব আশ্চর্য, ভদ্রলোকের সেকেণ্ড পেমেণ্ট হয় অক্টোবরে, ক্রীশ্চমাসে নয়!

কিন্তু হপকিনস খুব বেশি অবাক হয় না। সারাটা জীবন এত অদ্ভুত আর বিচিত্র মনের মানুষ দেখেছে। বিশেষ করে, তিনপেনী আর ছয়পেনীর অর্থাৎ সস্তা বইয়ের খদ্দেরদের ভেতরেই সে কত বৈচিত্রময় মানুষ দেখেছে; দেখেছে শো কেসের ওপরে ঝুঁকে পড়ে তাদের সেই সাগরে ডুব দিয়ে মুক্তো খোঁজার মত নিরলস আর অন্তহীন সন্ধান।

তবুও—তবুও ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েই একবার অনেক—অনেক বছর আগে মনে হয়েছিল লোকটাকে একবার জিজ্ঞাসা করবে, কি বই খুঁজছেন? সে কি কোন সাহায্য করতে পারে?

কিন্তু হপকিনস তা করে নি। অজস্র মানুষের বিচিত্র চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার নিরন্তন এবং নিঃশব্দ অনুসন্ধানের মাধুর্য এবং আনন্দ কথা বলে নষ্ট করতে চায় না।

কিন্তু এবার হপকিনস মরিয়া হয়ে ঠিক করল, আগামী ৩০শে অক্টোবর জিজ্ঞাসা করবে, কি বই, কেমন ধরনের বই চাই তার! বইয়ের নাম প্রকাশকের নাম—ঠিকানা নোট করে নেবে সে। তারপরের জুন মাসে তিনপেনীর শো কেসে সাজিয়ে রাখবে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সেই বই—দাম তার যাই হোক না কেন—

কিন্তু আবার মনে হয়, ভদ্রলোক যে বই চায়, তার দাম যদি এক শিলিং-এরও বেশি হয়?

—রুফুস হপকিনস, এই বয়সে পৌঁছেও তুমি কঞ্জুস হয়ে উঠেছ, তার বিবেক তাকে ধমকায়।

তখন ঠিক করল, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বই যেখান থেকে পাবে তার দাম যাই হোক কিনে এনে দোকানে রেখে দেবে।

এল ৩০শে অক্টোবর! সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ফুটপাতের ওপরে ঝুলানো তিন পেনী এবং ছয় পেনীর শোকেসের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে আর প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে জ্বলে যায়।

তার মনে হতে লাগল প্রতিমুহূর্তে, এখুনি কুয়াশা ঘেরা ঘোলাটে আলোয় আচ্ছন্ন রাস্তার ঝাপসা অন্ধকারে ফুটে উঠবে সেই লম্বা, ঢ্যাঙ্গা, গলাবন্ধ কালো কোট পরা সেই অদ্ভুত মানুষটার ছায়ামূর্তি।

কিন্তু হলো না। সন্ধে গড়িয়ে গড়িয়ে রাত নেমে এল। ভদ্রলোক আর এল না। তীব্র অশান্তির আগুনে পুড়ে যেতে লাগল হপকিনস।

না। দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে এল। এল না লোকটা। আর হয়তো আসবে না—হতাশার অন্ধকারে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগল রুফুস হপকিনস।

ঢং—ঢং—আটটা বাজল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। নেমে এল দারুণ শীত। সেই শীত, বৃষ্টি, কুয়াশা আর রাত্রির অন্ধকার মাথায় করে রহস্যময় মানুষটা এল।

হপকিনস দোকানের সামনে আর্কল্যাম্প লাগিয়েছিল। সেই উগ্র সাদা নীলচে আলোয় তার জীর্ণ চেহারায় আর পুরানো বেশবাসে দারিদ্র্যের প্রকট চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠল—হপকিনস কাউন্টারের আড়াল থেকে লক্ষ্য করে। আবার ভয়ও পায়। তাকে যদি দেখে ফেলে।

কোণের দিকে আরও সরে যায় হপকিনস। তার চোখে শিকারী বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু কেমন করে—কি দেখবে! বারান্দাওয়ালা টুপি আরও ঝুলে পড়ে ঢেকে দিয়েছে লোকটার মুখখানা।

তিন পেনী আর ছয় পেনীর বই যে দুটো শোকেশে রেখেছিল তার কাঁচের ওপর দিয়ে বৃদ্ধ লোকটার লম্বা সরু সরু প্যাকাটির মত আঙ্গুলগুলো পরম উল্লাসে ছুটতে লাগল। ওদিকে তীব্র উত্তেজনায় আনন্দে ফেটে পড়ছে হপকিনস। কিন্তু—

টক! আর পারল না হপকিনস। পারল না নিজেকে সংযত রাখতে। দরজায় শব্দ করে বেরিয়ে এল সে। ভদ্রলোককে বলল, মাফ করবেন স্যার—

চমকে উঠল লোকটা।

আপনাকে মাঝে মাঝেই দেখি, থেমে থেমে নিভু নিভু গলায় বলল হপকিনস, আপনি কি বই খুঁজছেন—আমাকে যদি বলেন—

কী! ভদ্রলোকের গোল গোল মার্বেলের মত ঘোলাটে চোখদুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল।

ধন্যবাদ! কেমন ঘ্যাসঘেসে গলায় লোকটা বলল, আমি তো সস্তা দামের বই দেখে থাকি—

হপকিনস হাসল। হাসল বোকার মত। কেমন নিস্তেজ গলায় বলল, যারা বই ভালবাসে, তাদের আমরা কমিশন দেই, একটু থামল। আবার থেমে থেমে বলল, সস্তা দরের আরও ছয় ডজন বই আছে ভেতরে। আপনি কি অনুগ্রহ করে একবার ভেতরে আসবেন?

কয়েকমুহূর্ত কি ভাবল লোকটা। প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, চলুন—

তাকে ভেতরে নিয়ে এল হপকিনস।

বসুন, সাদরে আপ্যায়ন করে হোলিওয়েল স্ট্রীটের বইপাড়ার সবচেয়ে পুরানো দোকানী রুফুস।

কোন কথা বলল না বৃদ্ধ।

একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। এখন দেখা যাক, আপনার জন্য কি করতে পারি, হপকিনস বলে।

লোকটা ম্লান হাসে। কথা বলে না। গোল গোল চোখদুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোকানের চারিদিক দেখে। নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলে, সব সেই আগের মতই আছে—

হপকিনস মই হাতে নিয়ে ওপরের তাক থেকে বই নামাতে যাচ্ছিল, কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলছেন কি! আপনি কি এই দোকানে আগে কখনও এসেছেন?

হ্যাঁ—অনেক—অনেক বছর আগে, নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বৃদ্ধ যেন বহু—বহু দূর থেকে বলল।

আমি এখানে আছি সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর, হপকিনস বলল, আমারও আগে?

হ্যাঁ, আপনার অনেক—অনেক আগে, ঝাপসা গলায় বলল বুড়ো।

কয়েকমুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল হপকিনস। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার বয়সের রেখা আঁকা এবড়োখেবড়ো কোনবহুল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার বয়স এখন পঞ্চাশ! বত্রিশ বছর ধরে সে দোকান চালাচ্ছে। তারও

আগে এসেছিল। নিশ্চয়ই তার বাবার সঙ্গে তাকে ভুল করছে। ভদ্রলোক তার বাবাকে দেখেছিল! তাহলে এই বৃদ্ধের এখন বয়স কত? বিস্ময়ের কুয়াশায় হপকিনসের চোখদুটো ছটফট করে।

এখন বলুন কি বই চাই? কৌতূহল চেপে রেখে বলল হপকিনস।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা জীর্ণ আর বিবর্ণ নোটবুক বের করল। কাঁপা কাঁপা হাতে কয়েকটা পাতা উল্টে বলল বইটার নাম—DOMUS VITOE; লেখকের নাম—EDWARD CHADELL, প্রকাশক—AMSTELODAMIVAN EDDS.

থর থর করে কেঁপে আঁতকে উঠে বলল হপকিনস, আমস টেলোডমি—ভ্যান এড্ডস!

আপনি চেনেন না কি?

পাবলিশার ভ্যান এড্ডসের নাম শুনেছি, হপকিনস থেমে থেমে বলে, কিন্তু বইটির নাম শুনিনি, চুপ করে গেল সে।

দোকানের চারিদিকে রাশি রাশি বইয়ের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, আমার দোকানে নেই—এটা খুবই রেয়ার বই, বলেই সে দোকানের অর্ডার বুকের খাতায় লিখে নিল—

শুনুন—বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘসঘসে গলায় বলল, বইটির কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন--

আস্তে আস্তে বলুন, হপকিনস বলল, আমি নোট করে নেই, আমার খুঁজতে সুবিধে হবে—

খুব ছোট বই। চার ফর্মার এই অদ্ভুত বইটি মাত্র ২৪ কপি ছাপা হয়েছিল। রহস্যময় লোকটি দোকানঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে যেতে লাগল, ভ্যান এড্ডসের ভাইরা নিজেরাই ছেপেছিল এবং বাঁধাই করেছিল। কভারের ওপরে এডওয়ার্ড চাদেল এবং প্যাট্রন লর্ড এডওয়ার্ড সেমপিটারের ছবি (PATRON LORD EDWARD SEMPITER) করা আছে—

লর্ড সেমপিটার! ধক করে কেঁপে উঠল হপকিনসের বুকের ভেতরটা। ভূতে পাওয়া মানুষের মত বিড়বিড় করে বলল, তিনি তো সেই কুখ্যাত হেলফায়ার ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। অন্যান্য সভাদের স্মৃতিচারণের ভেতরে আছে সেমপিটারের অশুভ শক্তির কথা, আছে তাঁর শয়তানের সাধনার কথা—

না—না, একেবারে ভুল, কোয়াইট রং, যেন অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে

বলল বৃদ্ধ, তার উইকেডনেস বা বদমায়েসী নয়—শয়তানের সাধনা নয়। বরং বলতে পারেন প্রেটি মেডিটেশান—সুন্দর একটা সাধনা—কিন্তু কখনো বলবেন না উইকেডনেস—

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলল না হপকিনস। শুধু পাকা ব্যবসাদারের মত রুক্ষ নীরস গলায় বলল, বইটি ইংরেজীতে না, ল্যাটিনে লেখা।

কিছু ইংরেজীতে এবং কিছুটা ল্যাটিনে লেখা, অস্পষ্ট গলায় বলল বৃদ্ধ। বুকের ওপরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবল। আবার বলল, এই যে লর্ড সেমপিটারের কথা শুনছেন—ইনিই আমার প্রপিতামহ—আমার নাম ও—সেমপিটার—থামল বৃদ্ধ।

হপকিনস বিস্মিত হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল বৃদ্ধকে। হঠাৎ ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে বসে বিচিত্র সেই খরিদ্দার হপকিনসকে আবার আর একটা প্রশ্নের তীর ছুঁড়ল, জানেন কি আছে এই বইতে?

হপকিনস মাথা ঝাঁকায়।

জীবন অনন্ত আর অবিনশ্বর, মাথা নীচু করে বৃদ্ধ বলতে থাকে, না সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই জীবন অক্ষয় এবং অনন্তকালব্যাপী প্রসারিত—এই তথ্যটি এবং লর্ড সেমপিটার সারা জীবন ধরে নিরলস ও সতর্ক গবেষণা করে জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে যা জেনেছেন, সে সব আছে এই বইতে।

হপকিনসের মাথাটা ভারী হয়ে ওঠে।

হপকিনসকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল বৃদ্ধ এবং বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরও জানিয়েছিল—সেমপিটার প্রমাণ করেছেন, বিপুলব্যাপ্ত বিশ্বের বাইরেও আছে জীবনের অস্তিত্ব! সে জীবন ঘাতেপ্রতিঘাতে জর্জরিত হলেও সে জীবন স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী।

জাগ্রত চৈতন্য-কে-ই যদি জীবন বলা যায়, তাহলে সে জীবন যেমন জীবন্ত প্রাণীদের তেমন জড়বস্তুরও যেমন বই, বাড়ি ইত্যাদির ভেতরেও প্রাণ সঞ্চারিত করতে পারে—

হপকিনসের মনে হয়, তার মাথার ভেতরে যেন অজস্র পিন ফুটছে।

আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন? আচমকা বুড়ো একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল।

আমি কখনো দেখি নি—

—তার মানেই ভূত নেই, আপনি বলতে পারেন না, একটু থেমে আবার বৃদ্ধ বলল, ওই যে বললাম লর্ড সেমপিটার দেখিয়েছেন, জাগ্রত চৈতন্য বা প্রাণ

জীবিত প্রাণীর ভেতর থেকে জড়ের ভেতরে সঞ্চারিত করা যায়। তেমনি করেই সুদূর অজানা পরলোকের মৃত মানুষের ভেতরে প্রাণের সঞ্চার করা যায় একটু থামল সে। আবার মাথা নীচু করে নিজের মনকেই যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, জাগ্রত চৈতন্যের অস্তিত্ব সবসময়ই থাকে—শুধু আধার পরিবর্তন করে—A mere alteration of locus and no more—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। কেন যেন মুখখানা খুব কঠোর হয়ে উঠল। বলল, তাই আপনি বলতে পারেন না, এখানে ভূত নেই—প্রেতের অস্তিত্ব যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে—

কিন্তু আপনি কি বলছেন, এই দোকানে কি করে ভূত থাকবে, অস্বস্তিতে জ্বলে যায় হপকিনস।

—আপনি ডিগবি গ্যাসকয়েজেনসের নাম শুনেছেন ?

—হ্যাঁ। কবি বায়রণের বন্ধু, আমতা আমতা করে হপকিনস বলল, ইনিও কবি। তাঁর কবিতার বই আছে আমার স্টকে—

জানেন আপনার পোয়েট গ্যাসকয়েজেনস এই দোকানে গলায় দড়ি দিয়েছিল, আচমকা ঝেঁকে বলল লোকটা।

কেমন স্থির দৃষ্টিতে হপকিনস সেই রহস্যময় আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকে—এই শীতঝরা বর্ষার রাত্রে লোকটা যেন প্রেতলোকের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে।

সেই যে এসে বসেছে, ওঠারও তো নাম নেই। লোকটা যাবে কখন নিদারুণ অস্বস্তিতে জ্বলে যায় হপকিনস। গভীর নিস্তব্ধতায় থমথম করছে দোকানঘর। তার মনে হলো, বইতে ঠাসা কড়িকাঠ পর্যন্ত ছোঁয়ানো বড় বড় সেলফে যেন নিঃশব্দে বিচরণ করছে পরলোকের হাজারো বিদেহী আত্মা। তার বহুকালের পরিচিত দোকানঘরটি মনে হচ্ছে যেন অজানা আর ভয়ঙ্কর এক মৃত্যুপুরী।

না। রহস্যময় ভয়ঙ্কর এই লোকটাকে যেমন করে হোক বিদায় করতেই হবে। মরিয়া হয়ে অত্যন্ত শুকনো গলায় বলল হপকিনস—মিঃ সেমপিটার, আপনার বই লণ্ডনের প্রতিটি বুক সেলারের কাছে খোঁজ করে জোগাড় করতে চেষ্টা করবো—

কোন কথা বলল না বৃদ্ধ। কিন্তু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, নোটবুকটা লম্বা কালো কোটটার পকেটে ভরল।

আপনি তো আবার সেই ২৪শে জুন আসছেন।

—২৪শে জুন। লোকটা দরজার দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন বিচিত্র আর জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিদারুণ চাপা যন্ত্রণায় ফিসফিস করে বলল, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?

হপকিনস কোন কথা বলল না। লোকটার মুখের দিকেও তাকাতে পারল না। জ্বরোরোগীর মত সেই জ্বরতপ্ত তীব্র উজ্জ্বল লাল চোখ দুটো যেন দুখণ্ড অঙ্গারের মত হপকিনসের মাথার ভেতরে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল নিঃশব্দে।

বলেছি তো আপনাকে অনেকদিন ধরে দেখছি, প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল হপকিনস।

লোকটা যেন আশ্বস্ত হলো। ধীর পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে হোলিওয়েল স্ট্রীটের ফুটপাতে নেমে গেল। হপকিনস স্পষ্ট শুনতে পেল, ভদ্রলোক বিড় বিড় করে বলছে—মিডসামার ড্রিমে অর্থাৎ ২৪শে জুনে আসি—এই বুকসেলার তাও জানে—

দুই প্রাচীন প্রকাশককে দুটো চিঠি দিতেই উত্তর এল।

দুই কোম্পানীই জানালো, বইটি আছে। তবে খুবই ব্যাড কনডিশান। ব্রিটল অর্থাৎ ছেঁড়া। ৩২ পাতার বই ৪টি ম্যাজোটিনট (এক বিশেষ শৈলীর) এনগ্রেভিংস বা খোদাই করা ছবি আছে—

দুজনের কাছ থেকে দুটো কপিই কিনে ফেলল হপকিনস। বইটা নিয়ে মিসেস হপকিনসকে দোতলায় দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সে।

কিন্তু ছবিগুলো দেখেই ঘৃণায় আর আতঙ্কে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বলেছিল মিসেস হপকিনস, ছুঁড়ে ফেলে দাও এই নোংরা বই—খবরদার, এই বই দোকানে রাখবে না—তোমার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে—কখনো তোমার কি তোমার ব্যবসার ভালো হবে না—হতে পারে না—

বইটা কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে দোকানে নেমে এসেছিল হপকিনস।

স্ত্রীসুলভ সেই সহজাত অনুভূতি এবং বিচারবুদ্ধিতে সেই ভয়ঙ্কর ভবিতব্য ঠিকই উপলব্ধি করেছিল মিসেস। কিন্তু—

হপকিনস তো তার কথা শুনল না। বই দুটো নিয়ে খুব সঙ্গোপনে এবং সযত্নে তার টেবিলের ড্রয়ারে রাখল।

কিন্তু কি ছিল এমন বইতে যা ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনেছিল?

প্রথমেই বলতে হয় ইলাসট্রেশন বা বইটির অলঙ্করণের কথা—প্রতিটি যেমন

ভীতিজনক বা ভয়াবহ তেমনি অশ্লীল আর নোংরা! আর লেখার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তো আগে কিছুটা বলা হয়েছে—জীবন-মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্য, প্রেতলোকের অশরীরি আত্মার বিবরণ, মৃত মানুষের দেহে প্রাণের সঞ্চার করে তাকে জীবিত করে তোলা ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত আর অলৌকিক এবং রহস্যময় অজানা জগতের নানা জটিল তথ্য—

দোকানের শান্ত নির্জন পরিবেশে এই বই কনসাল্ট করার বা পড়ার অবাধ সুযোগ এল হপকিনসের। সে স্ত্রীকে শুধু বলেছিল, তুমি ভুল করেছো—খুবই দুষ্প্রাপ্য বই—চমৎকার সব ছবি—

সকালে ঘড়িতে আটটা বাজতে না বাজতে ব্রেকফার্স্ট সেরেই দোকানে নেমে আসে হপকিনস। নিথর স্তব্ধতায় থমথম করছে ঘরটা। এখনো ঘরের কোণে কোণে রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আছে। ডানদিকের একটা জানালা খুলে দিল সে। তারপরেই বইটার ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল হোলিওয়েল স্ট্রীটের প্রবীন বুকসেলার হপকিনস।

প্রথমেই তার দৃষ্টি আটকে যায় বইয়ের প্রথম পাতার চিত্র বা ফ্রন্টিসপীসের সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস ছবিটার দিকে—

মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো কিন্তু বিষণ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটা বিশাল হলঘরের মাঝখানে সোফায় বসে আছে মুখোমুখি এক নারী আর পুরুষ। পুরুষালী লম্বা চেহারার স্ত্রীলোকটির দেহে খর যৌবন।

আর পুরুষটির চেহারাও অত্যন্ত কর্কশ। সারা মুখে নিষ্ঠুর অমানবিকতার ছাপ। আবছায়া অন্ধকার ঘরে তাদের মনে হচ্ছে যেন মৃত্যুলোকের অভিশপ্ত দুটো আত্মা এসেছে প্রেম ভালবাসায় ভরা মানুষের সংসারে অভিশাপের বিষ ঢালতে।

তাদের দুইজনেরই চোখে তীব্র লালসা।

লালসার আগুনে তাদের চোখগুলো দগদগে ঘায়ের মত জ্বলছে। তারা দুইজনেই পরম উল্লাসে একটা শিশুর মৃতদেহ খুবলে খুবলে খাচ্ছে!

শিল্পী তার আশ্চর্য নৈপুণ্যে আর মুন্সীয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন গোটা ছবিতে একটা নিদারুণ বীভৎসতা—এ ভেরী পাওয়ার ফুল হ-র-র!

ভয়ঙ্কর আর অকল্পনীয় নৃশংস সেই ছবির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হপকিনসের মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। যে ঝাপসা অন্ধকার ঘরটিতে বসে মেয়েপুরুষ দুটো নরমাংস খাচ্ছে পরমতৃপ্তিতে সেই ঘরে তাদের সামনে বসে আছে যেন সে। কাঁচা মাংসের আঁশটে গন্ধ পাচ্ছে—

হপকিনসের শরীরের ভেতরটা পাক দিয়ে গুলিয়ে উঠল। টলতে লাগল মাথার ভেতরটা তবুও—

তবুও বইটিকে ছাড়ল না। ছাড়তে পারল না হপকিনস। কী এক অমোঘ আকর্ষণীশক্তি যেন জোর করেই তাকে অভিশপ্ত বইটির ভেতরেই নিমগ্ন রাখল।

শুধু সেই শিশুর মাংস খাওয়া কদাকার সেই যুবক যুবতী নয়। আরও বীভৎস এবং ভয়ানক ছবিও আছে।

দুটো গাছ জড়াজড়ি করে উপরে উঠে গিয়ে আর একটি গাছকে লোলুপ উল্লাসে জড়িয়ে ধরে শোষণ করছে। শিল্পী এমন মুন্সীয়ানার সঙ্গে বিচিত্র এই ছবি এঁকেছে—যে গাছ দুটো শোষণ করছে তার ডালপালাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন কোন করোটি কঙ্কাল সহস্র বাহু মেলে গ্রাস করছে অপেক্ষাকৃত ছোট গাছটাকে। আবছায়া কালো রঙের পটভূমিতে আঁকা বলেই ছবিটি যেমন রহস্যময় তেমনি ভয়াল হয়ে উঠেছে! খুব বেশীক্ষণ এই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না হপকিনস। তার বুকের ভেতরটা ব্যথা করতে লাগল! দ্রুত কাঁপা কাঁপা হাতে পাতা উল্টে গেল।

আবার একটা ছবি।

কয়েক পাতা পরেই আর একটি ভয়ানক নৃশংস অলঙ্করণ—দুটো কালো কুচকুচে কাঁকড়াবিছে একটা প্রজাপতিকে আক্রমণ করেছে। তার ডানাদুটো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তারা। তীব্র যন্ত্রণায় প্রজাপতিটা কুঁকড়ে যাচ্ছে!

হপকিনসের মনে হলো—যেন বহুদিন আর বহুকাল ধরে সে বীভৎস নরকের রাজ্যে বাস করছে। তার মাথার ভেতরটা জ্বলে যায়। বন্ধ হয়ে আসে নিশ্বাস। তবুও—

তবুও ছাড়তে পারে না বইটিকে। কী এক ভয়ঙ্কর অদৃশ্য শক্তি বিপজ্জনক সেই বইটির ভেতরে তাকে নিবদ্ধ রেখেছে। কেমন আচ্ছন্নের মত সে আলগোছে পাতা ওলটায়। নজরে পড়ে আরও একটি অকল্পনীয় বীভৎস ছবি—

দুটো হৃষ্টপুষ্ট শিশু একটা মরা বিড়ালের দেহ কুরে কুরে পরমতৃপ্তিতে খাচ্ছে! আশ্চর্য এই ছবিটাতে যতখানি বীভৎস থাকা উচিত ছিল, তা নেই। কেমন শান্ত আর বিষণ্ণ পরিবেশ গোটা ছবিতে।

প্রত্যেকটি ইলাসট্রেশানের নিচে ভয়াবহ এক একটি ক্যাপশান। সবশেষে একটা সাদা পাতার মাঝখানে জলজলে কালো আর বলিষ্ঠ অক্ষরে লেখা একটি

বিচিত্র উদ্ধৃতি—

MOS DOMUS VITOE—অর্থাৎ Death is the abode of life. মৃত্যুই জীবনের আবাসস্থল। কিন্তু হঠাৎ এই উক্তিটির অর্থ কি? মাথা নীচু করে হপকিনস ভাবতে থাকে—

মৃত্যু না থাকলে জীবনের অস্তিত্ব থাকতো না। মৃত্যু আছে বলেই জীবন আছে—জীবন মৃত্যুর সেই শাশ্বত লীলার দিকেই কি ইঙ্গিত করেছেন লেখক? গভীর চিন্তার ভেতরে একটু একটু করে তলিয়ে যায় হপকিনস।

সে ভুলে গেল বইয়ের সেলফগুলো ঝাড়পোছ করতে হবে, শোকেসগুলো বাইরে বসিয়ে দিতে হবে—খুলতে হবে দোকানের মেইন গেট—কিছুই পারল না, প্রতিদিনের রুটিনের কাজগুলো কিছুই করল না—করতে পারল না হপকিনস। সেই সর্বনাশা বই যেন তাকে বাস্তব পৃথিবী থেকে নির্বাসিত করে নিয়ে চলে গিয়েছে মৃত্যুর নীরন্ধ্র অন্ধকার এক রহস্যময় জগতে।

হয়তো আরও কিছুক্ষণ বইটা নিয়ে বসে থাকত হপকিনস।

কিন্তু—

তুমি কী করছ বলো তো? নিস্তব্ধ দোকানঘরে ঝনঝন করে বেজে উঠল মিসেস হপকিনসের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি করে বইটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালো হপকিনস।

সেই সাতসকালে ওপর থেকে নেমে এসেছো, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নামতে নামতে মিসেস হপকিনস বললেন, লাঞ্চের সময় হয়ে এল তোমার পাত্তা নেই—

বইটইগুলো ঝাড়পোছ করছিলাম—

মিথ্যা কথা বলো না, কঠোর গলায় বললেন মিসেস, তুমি ওই নোংরা অশ্লীল বইটা পড়ছিলে। জেনে রেখ, ওই বই তোমার দারুণ সর্বনাশ করবে, বলেই রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলেন!

কার কথা কে শোনে?

মিসেস হপকিনস যত নিষেধ করে, তত তার আগ্রহ বাড়ে। আর বইটিরই একটা এমন অদৃশ্য আকর্ষনী শক্তি ছিল যে সে এটা না পড়ে পারতো না।

প্রতিদিন।

দোকানে এসেই বইটি খুলত আর ধীরে ধীরে তন্ময় হয়ে যেত। লেখক এডওয়ার্ড চ্যাডেল কি বলতে চেয়েছেন তা বুঝতে চেষ্টা করতো—

আমাদের জীবন একটা সুদীর্ঘ নিদ্রা এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিভ্রান্তি ছাড়া আর

কিছুই নয়। জন্মমুহূর্ত থেকে যে আত্মার নিরবিচ্ছিন্ন যাত্রা শুরু হয় আমাদের সঙ্গে সেই আত্মা অনির্বাণ ধ্রুবতারার মত—বহু—বহু শত শত যোজন মাইল দূর থেকে আমাদের প্রেরণা দেয়। নিরন্তন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়—চ্যাডেলের এই কথাগুলোই কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতায় বলেছেন। হপকিন্সের মনের ভেতরে গুণগুণ করে উঠল লাইনগুলো Our birth is but a sleep and a forgetting, The Soul that rises with us, our loftiest st r.

চ্যাডেল বোধহয় পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছিল, জাগ্রত চৈতন্য বা কনসাচনেচই হলো প্রকৃত জীবন। এবং যেমন চৈতন্য ছাড়াই দেহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে (ঘুমন্ত অবস্থায় কি অজ্ঞান হয়ে গেলে যেমন হয়) তেমনি রক্তমাংসের দেহকে অবলম্বন না করেও চৈতন্য জাগ্রত থাকতে পারে।

পড়ে মনে হয় চ্যাডেলের কাছে এই চৈতন্য—সদাজাগ্রত চৈতন্যের যেন একটা পৃথক সত্ত্বা আছে। রক্তমাংসের এই দেহের চেয়ে কোন অংশে কম বাস্তব বা মেটিরিয়েল নয় সেই চৈতন্য। স্বাধীনভাবে সে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে যেতে পারে—

আরও বলেছে চ্যাডেল, জীবন ও চৈতন্য সংক্রান্ত এই মতবাদ প্লেটো, প্যারাসেলসাস, অ্যাকুইনিস, সুইডেনবার্গ এবং জোসেফ গ্ল্যানভিলিসের থিয়োরীর সংমিশ্রণ।

এসব পড়তো হপকিনস।

খুব মনযোগ দিয়ে পড়তো। আর থেকে থেকে মাথা নীচু করে ভাবতো। অত্যন্ত জটিল এবং দুরূহ তত্ত্বগুলি তার মাথার ভেতরে অঙ্কুশের মত খোঁচা দিত। আবার কোন কোন কথা তার বোধবুদ্ধির কুয়াশার ভেতরে এক একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিত। আর তার বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী খুশি হয়ে জিভ দিয়ে তৃপ্তিসূচক শব্দ করতো!

জানো, আশ্চর্য ব্যাপার, হপকিনস একদিন রাত্রে স্ত্রীকে বলল, বত্রিশ বছর ধরে হাজার হাজার বই নিয়ে কারবার করেছি, কখনও এইরকম অদ্ভুত বই দেখি নি—

আমি তোমার ওই অলক্ষুণে বই সম্বন্ধে কোন কথা শুনতে চাই না—

আহা, শোনই না—শোনই না অনুনয় করে বলে হপকিনস, যে কোন ব্যাপারে অত অধৈর্য হও কেন? একটু থেমে আবার বলল, বইটির প্রত্যেকটি সরল, পরিষ্কার বাগভঙ্গী বা ফ্রেজের আড়ালে লুকিয়ে আছে গোপন এবং গূঢ় একটা অর্থ—হপকিনসের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে। বুক উজাড় করে, একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মিসেস হপকিনস। মনে মনে প্রার্থনা করে ও ক্রায়েস্ট—কবে—কখন এই বইটার ভূত মানুষটার কাঁধ থেকে নেমে যাবে—

ঢং-ঢং-দূরে পুলিশ ফাঁড়ির পেটা ঘড়িতে এগারোটা বাজল।

গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন মিসেস হপকিনস।

আর হপকিনস চোখদুটোকে প্রখর করে জ্বালিয়ে নিয়ে অন্ধকার কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তার ভেতরে তলিয়ে গেল—জীবন আর মৃত্যুর জটিল রহস্যময় তত্ত্বের সঙ্গে দুই যুবকযুবতীর নরমাংস খাওয়া, দুই শিশুর বিড়ালের ইত্যাদি মাংস কুরে কুরে খাওয়া, এসব বীভৎস ছবির কি যোগাযোগ আছে? লেখক চ্যাডেল কি সেই কুখ্যাত হেলফায়ারের (যারা বীভৎস প্রক্রিয়ায় শয়তানের সাধনা করে) সভ্য। না আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়েপড়তে হবে!

পরদিন ভোর হতে না হতে কোন অদৃশ্য শক্তি চাবুক মেরে নিয়ে এল তাকে দোকানঘরে। আর বইটির সামনে বসিয়ে দিল। ঘোরলাগা একটা আচ্ছন্ন মানুষের মত পড়তে শুরু করল হপকিনস।

কয়েকটা পাতা উল্টে যেতেই থর থর করে কেঁপে উঠল সে। চোখদুটো কুঞ্চিত করে আবার দেখল সে—সেই আশ্চর্য ব্যাপার।

এ কী! বইটির এক একটি জায়গায় দুটোপাতা জোড়া দেওয়া। তাহলে কি বাইণ্ডিং-এর সময় পাতা কাটা হয় নি! না, আবার এমনও হতে পারে বিশেষ কোন জরুরী কারণে প্রকাশকই গাম দিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু—

তাহলে কি আছে—কি থাকতে পারে, দুটো জোড়া পাতার অন্ধকার গহ্বরে। দুর্নিবার কৌতূহলের আগুনে পুড়ে যেতে লাগল হপকিনস।

এখন সে কি করবে? চাকু দিয়ে খসখস করে জোড়া পাতাগুলো কেটে দেবে? কিন্তু—

সেই লম্বা ঢ্যাঙ্গা রহস্যময় লোকটার চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তাঁর বই। তিনি অর্ডার দিয়ে গিয়েছেন। তাই সে তো পাতা কাটতে পারে না!

কি আছে—কী থাকতে পারে? মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে অতি সন্তর্পণে আলগোছে বইয়ের জোড়া পাতা খুলল হপকিনস। আর দুটো চোখের দৃষ্টি চমকে উঠল—দুদিকেরই দুই পাতা জুড়ে ভয়ঙ্কর আর বীভৎস এক একটা ছবি—একটাতে আছে—উলঙ্গ যুবতীর শবদেহ। সেই শবদেহের ওপরে বসে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আছেন এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। তার সামনে

মেঝেতে যত্ন করে পাতা রয়েছে কালো বিড়ালের চামড়ার একটা আসন। তার চারিদিকে চারটে কালো মোমবাতি জ্বলছে। ছবির নিচে ক্যাপশানে লেখা আছে—শবের ওপরে বসেই জীবনের সাধনা করতে হয়—

আর একটা ছবিতে আছে—একটি শিশুর মৃতদেহ চিৎ করে শোয়ানো রয়েছে। তার পেটের ওপরে তিনটি কালো মোমবাতি জ্বলছে। আর তার সামনে বসে ব্ল্যাকমাসের (শয়তানের পূজোর ক্রিয়াপ্রকরণ) পুরোহিত তন্ময় হয়ে মন্ত্র পড়ছে! তার ক্যাপশানে আছে—মৃত্যুকে আমরা স্বীকার করি না। জাগ্রত চৈতন্য বা আত্মা শুধু এক দেহ থেকে দেহান্তরিত হয় মাত্র। আত্মা নক্ষত্রের মত অনির্বাণ জ্বলতে থাকে!

এই রকমই এক একটা ছবি আর রকমারি ক্যাপশানে পরিকীর্ণ জোড়া পাতাগুলো। আবার সযত্নে গাম দিয়ে লাগিয়ে রাখল সেই পাতাগুলো।

পেরিয়ে গেল এক মাস।

দ্বিতীয় মাসের শুরুতেই কে জানে কোন অজানিত কারণে বিচিত্র সেই বইটি হপকিনসকে আরও বেশি করে আকর্ষণ করতে লাগল।

যদিও সে স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে বইটি ব্ল্যাকমাস বা শয়তানের পূজোর ক্রিয়াপ্রকরণের উন্নত ও পরিমার্জিত সংস্করণ এবং লেখক চ্যাডেল শয়তানের অস্তিত্বের কথা স্বীকারও করেছেন এখানে।

কিছুদিন পর আরও লক্ষ্য করল হপকিনস, বইটির আরও একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই এক একটি শব্দের মাঝখানে যে 'ল্যাকুনে' বা গ্যাপ অর্থাৎ ফাঁক আছে সেখানে লুকিয়ে আছে অদৃশ্য এবং গূঢ় অর্থবহ এক একটি কথা। হপকিনস অমানুষিক পরিশ্রম করে ল্যাকুনের সমাধান করতে চেষ্টা করে। ডায়েরীতে সে লিখেছিল, গ্যাপের ভেতরের কথাগুলো বের করতে এক একটা দিন কাবার হয়ে যেত। বলাবাহুল্য বই সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত বাড়তি অভিজ্ঞতা এই কাজে খুব সহায়ক হয়েছিল।

যত দিন যায়, ততই সর্বনাশা বইটির নানা রোমাঞ্চকর বৈচিত্র হপকিনসকে অতিকায় অক্টোপাসের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। মনে হয় চ্যাডেলের বইটা যেন প্রচণ্ড হিংসুক স্বভাবের এক উদগ্র যৌবনবতী প্রেমিকা—কিছুতেই তাকে ছাড়া এক মুহূর্তের জন্য অন্যকোন দিকে মনোনিবেশ করতে দেয় না।

আবার আবিষ্কার করল হপকিনস।

আরো চমকপ্রদ একটা বৈশিষ্ট্য।

দুটো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে আছে সাইফার অর্থাৎ সাঙ্কেতিক অর্থবহ এক

একটি শূন্য ! আছে প্রচুর ক্রিপটোগ্রামস—সঙ্কেতে লেখা এক একটি চিহ্ন !

প্রত্যেকটি সঙ্কেতের অর্থ বের করার চেষ্টায় মত্ত হয়ে উঠল হপকিনস। তার বুদ্ধিবিবেচনা মত সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল ধাঁধার মত এক একটি সঙ্কেতের অন্তর্নিহিত বক্তব্য বের করতে চেষ্টা করে সে।

এই সময় থেকেই তাকে অত্যন্ত অস্থির আর চঞ্চল মনে হয়েছিল। এইবার কতগুলো সাদা কাগজ নিয়েছিল সে। সাইফার বা শূন্যর দুইদিকে দুটো শব্দ সাদা কাগজে নোট করে নিয়ে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত তন্ময় হয়ে ভাবতো, কী কী হতে পারে শূন্যের জায়গায় পছন্দসই শব্দ। একটা শব্দ লিখত। আর বার বার মনে মনে সেই শব্দটিই আবৃত্তি করতো। পছন্দ না হলে মাথা ঝাঁকাতো। আবার শব্দটিকে কেটে দিয়ে আর একটা কথা লিখত হপকিনস।

এইভাবেই কথার পর কথা সাজিয়ে গভীর জলে জাল ফেলে মাছ ধরার মত করে সাইফারের সাঙ্কেতিক শব্দটি ধরতে আপ্রাণ চেষ্টা করতো হপকিনস। তার নিজের মনে হতো, কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে যেয়ে সম্মোহিতের মত সে এইসব করে চলেছে। তার নিজের ওপরে আর কোন বশ নেই। ইচ্ছে করলেই সে বইটা বন্ধ করে দোকানের বিক্রীবাটার দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। পারে না, সর্বনাশা ভয়ঙ্কর বিষধর সাপের মত বইটিকে তার রেয়ার বা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের বাক্সে বন্দী করে ফেলতে। না—না আর সে কিছুই পারে না।

দিন যায়। হপকিনস আরও বেশি করে মত্ত হয়ে ওঠে—অস্থির হয়ে ওঠে বই নিয়ে। এইবার সে আরও অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ্য করে—সাইফারের দুদিকের দুটো শব্দ বার বার আবৃত্তি করতে করতে থেকে থেকেই হঠাৎ তার সুদূর বাল্যকালের পড়া কবিতার কথাগুলো ঝরণার জলের মত কলকল করে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আশ্চর্য !

জীবনে কখনো এমন কি স্কুলের নিচের ক্লাসেও আবৃত্তি করেছে বলে তার মনে পড়ে না। কোনকালেই পড়াশুনায় মনযোগীও যেমন ছিল না, তেমন কোন আগ্রহ ছিল না তার। কিন্তু হঠাৎ কবিতার এই স্ফুরণ কোথায় থেকে এল ? ভয়ে তার বুকের ভেতরে ঢিব ঢিব করে।

কিন্তু আরও ভয় আরও দুঃখ হপকিনসের জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

হপকিনসের অপঘাত মৃত্যুর পর মিসেস হপকিনস পুলিশের কাছে যে

জবানবন্দী দিয়েছিল তা থেকে জানা যায়—এই সময় থেকেই স্বামীকে নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সর্বক্ষণ অলক্ষুণে বইটা নিয়ে মাথা গুঁজে বসে থাকে মিঃ হপকিনস। কে জানে কি বিড়বিড় করে বকে।

না। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সুখী ছিলেন তিনি। সংসারের সব ঝক্কি ঝামেলা তার ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসা করতেন। ঘুম, খাওয়া—সব—সব ছিল খুব নর্মাল। কিন্তু—

ওই বইটা হাতে আসার পর থেকেই একটু একটু করে বদলে যেতে লাগলেন। তিনিও নিজে বেশ বুঝতে পারছিলেন। এই বই তার স্বামীকে তার কাছ থেকে একটু একটু করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে এক অজানা জগতে।

অদৃশ্য ও সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা এক একটি শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য বইটা খুলে নিয়ে আর এক হাতে খাতা পেন্সিল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি।

মিসেস হপকিনসের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর স্বামীও বুঝতে পেরেছিলেন, তার জীবনের চারিদিকে একটা দূরপ্রসারী রহস্যের ঘন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে! মনে হয়, তাকে প্রতিহত করার কোন ক্ষমতাই তার ছিল না……

মনের ভেতরে কবিতার অস্ফুট এবং স্বতস্ফূর্ত বুদ্বুদ ছিল একরকম ভালো। কিন্তু—

একী!—এটা কি করে সম্ভব হলো? যতবার সে সংকেত লিপিগুলো পড়তে চেষ্টা করছে ততবারই তার মনের ভেতরে ঘন জমাট অন্ধকারের সমারোহ ঘনীভূত হয়ে আসছে। আর সেই অন্ধকারে প্রেতচ্ছায়ার মত একের পর এক ফুটে উঠছে বইটির সেই কুৎসিত আর বীভৎস এক একটা ছবি—সেই কদাকার যুবক যুবতী পরম তৃপ্তিতে মৃত শিশুর মাংস খাচ্ছে; সেই—সেই উলঙ্গ যুবতীর শবদেহের ওপর তিনটি কালো মোমবাতি জ্বালিয়ে শয়তানের আরাধনা—ছবির কুশীলবরা যেন ছবি থেকে উঠে এসে তার দিকেই মৃতদেহগুলো নিয়ে যেন গুটি গুটি এগিয়ে আসছে! তার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তীব্র ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল। তার মনে হলো, যেন তার পায়ের নিচে মাটি নেই! একটু একটু করে অতল এক গহ্বরের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে! তবুও—

তবুও ডুবন্ত মানুষের মত নিজের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ করে বইটাকে ছুঁড়ে

ফেলে দিল। নিজেকে সংযত করে তার ডায়েরীতে পাতার পর পাতা ঝড়ের গতিতে কি যেন লিখে চলল।

শেষ হলো লেখা।

সে লেখা একবার পড়েই ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল হপকিনসের মুখ। আর অজানা একটা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

এ কী—কি হয়েছে তোমার। দোকানঘরে এসে স্বামীর ওই করুণ অবস্থা দেখে চমকে উঠল মিসেস হপকিনস! নোটবুক আর সেই বিপজ্জনক বইটা দোকানের পুরানো বইয়ের স্তূপের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে নিয়ে ওপরে চলে গিয়েছিলেন।

কি ছিল হপকিনসের ডায়েরীতে?

কী এমন লেখা যাতে সে নিজেই ভয় পেল?

রাত্রে হপকিনসের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মিসেস বলল, তোমার সেই কাষ্টমার ভদ্রলোক কবে আসবেন?

২৪শে জুন।

উঃ সে তো অনেক—অনেকদিন পরে! বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস হপকিনস। কিন্তু কিছু বললেন না।

অন্ধকার ঘরে গাঢ় স্তব্ধতা।

টিক্—টিক্-টিক্—একটানা শুধু ঘড়ির শব্দ বেজে চলেছে।

বইটার কত চার্জ নেবে?

এখনও কিছু ঠিক করি নি। পুরানো দুষ্প্রাপ্য বই। আর—

হ্যাঁ, তুমি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করেছো—বেশ মোটা মার্জিন রাখবে—

বেশি মার্জিন—বেশি লোভ করতে গেলে একটা মুস্কিল হয়—

কি?

মিঃ সেমপিটারের মত অভিজাত খদ্দের আর পা মাড়ায় না—

সেমপিটার! তিনি কে?

ওই যে গো বইটার কাস্টমার বুড়ো। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত স্পিরিচুয়্যালিস্ট লর্ড সেমপিটারের নাতি—

তিনি যেই হন, বেশ মোটা মার্জিন রেখে ঠুকে দাম নিয়ে নেবে—

স্ত্রীর কথাগুলো যেন শুনতেই পেল না হপকিনস। নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বলল, জানো, লোকটা অর্ডার দিতে

এসে কত কথাই যে বলে গেল—

কি বলেছিল ?

ভদ্রলোক না কি বাবার আমলে আমাদের দোকানে এসেছিল। কোন কবি না কি দোকানঘরের ভেতরে গলায় দড়ি দিয়েছিল—

অঁা! অস্ফুট আর্তনাদ করে বিছানায় উঠে বসল মিসেস হপকিনস।

হঁ্যা গো! ওই সুইসাইডের প্রসঙ্গেই বৃদ্ধ জানিয়েছিল দোকানে না কি ভূত আছে—

সে কী গো! অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলেপুড়ে মিসেস হপকিনস বলল, না—না বাপু তুমি অন্য কোথাও ঘর ভাড়া দিয়ে দোকান করো—

হো হো করে হেসে উঠল হোলিওয়েল স্ট্রীটের প্রাচীনতম বুকসেলার। হাসির রেশ টেনে আস্তে আস্তে বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? প্রায় দেড়শ বছরের পুরানো দোকান ছেড়ে দেব!

তোমাকে একটা কথা বলবো গো? তার মুড বুঝে মিসেস হপকিনস বলল, ওই অলক্ষুণে বইটা তো অনেক পড়েছো। আর পড়ো না কেমন, একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছো—একটু একটু পালটে—

না। আর পড়বো না, পরিষ্কার আর দৃঢ় গলায় বলল হপকিনস, এবারে রেয়ার বইয়ের বাকেস তালা দিয়ে রেখে দেব ওই ডেনজারাস বইটা—

সত্যি বলছো গো! অন্ধকার ঘরে প্রদীপের মত চোখদুটো জ্বলে উঠল। তীব্র আনন্দে উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে হপকিনসের মুখখানা চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিল।

কক্—কক্—কেঁা—রাতচরা একটা পাখি কর্কশকণ্ঠে ডেকে উড়ে চলে গেল দূর অন্ধকার দিগন্তে।

প্রহরে প্রহরে রাত গভীর হলো।

পরম নিশ্চিন্তে গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল মিসেস হপকিনস। ঘুম এল না হপকিনসের চোখে। চ্যাডেলের সেই সর্বনাশা বইয়ের রহস্যময় কথাগুলো মনে হতে লাগল—মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মার, মানুষের চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে? তাই যদি হয়, তাহলে তো কবি ডিগবি গ্যাসকয়জেনের আত্মা তার দোকানেই আজও আনাগোনা করছে! আবার লেখক যে বলেছেন বই, টেবিল, চেয়ার-সব-সব জড়বস্তুকেই জীবন্ত করা যায় প্রাণ সঞ্চারিত

করে। কিন্তু কি করে?

সেই যে নিরাবরণ তরুণী, যার উদরের ওপরে তিনটি কালো মোমবাতি জ্বালিয়ে ব্ল্যাকমাসের পুরোহিত মন্ত্র পড়ছিলেন, সেই যুবতী কি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল? রাশি রাশি চিন্তা বিষাক্ত পিঁপড়ের মত তার মাথার ভেতরে কামড়াতে লাগল। তবুও—

তবুও সে জোর করেই চোখদুটোকে বন্ধ করল। তাতে আরও অস্বস্তি হলো—সেই কুৎসিত, নোংরা আর বীভৎস ছবির পাত্রপাত্রীরা,—সেই নরমাংস ভোজী দুই কদাকার শিশু, সেই ব্ল্যাকমাসের পুরোহিত, সবাই সবাই যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করল। আর এক অদৃশ্য কোন শক্তি যেন তাকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল একতলায় তার অন্ধকার দোকানঘরে! সেই নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, যেন শত শত বিদেহী আত্মা ওই নিবিড় অন্ধকারে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে খল খল করে হাসছে। আর তারা যেন শোভাযাত্রা করে চলেছে তার চোখের সামনে দিয়ে। কিন্তু—

একী! তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কেন? এই ঘর এবং তার দেওয়ালগুলো আর শতাধিক প্রেতমূর্তি সব সব যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে! তাদের দুহাতে অনিবার্য মৃত্যুর নিশানা। তবুও—তবুও সে জোর করেই সেই অভিশপ্ত বইটা স্পর্শ করতেই—

দড়াম্!

দারুণ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল মিসেস হপকিনসের। বিছানায় হাত দিয়ে দেখল হপকিনস নেই। তখন বাইরে শেষ রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে।

তাহলে কি বাথরুমে গিয়েছে। ছুটে গেল সেখানে। না সেখানেও নেই হপকিনস। তখন ঝড়ের বেগে নেমে এল নিচে দোকানঘরে। আর ঢুকেই মিসেস হপকিনস তীব্র ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

মেঝের ওপরে আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে হপকিনসের প্রাণহীন দেহ। চারিদিকে জমাট রক্ত। মুখের দুপাশ দিয়েও রক্তের কষ গড়িয়ে পড়ছে।

আর সেই বইটা—মেঝেতে তার পাশেই ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। বাতাসে খোলা পাতাগুলো ফরফর্ করে উড়ে চলেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল মিসেস হপকিনস। বিকল হয়ে এল তার চেতনা। সম্মোহিতের মত সেই অভিশপ্ত বইটি স্পর্শ করতেই

বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত ছিটকে সরে দাঁড়াল সে। তার মনে হয়েছিল, বইটা যেন থর থর করে কাঁপছে। আর জীবন্ত আর উত্তেজিত মানুষের হৃদপিণ্ডের মত অত্যন্ত দ্রুততালে ধুক ধুক করছে।

তার বুকের ভেতরে গভীর ব্যথার উজান ঠেলে ওঠে এক গভীর বিস্ময়—কাল রাত্রেই অত ভালো করে কথাবার্তা বলল আর রাতটুকু শেষ হতে না হতে বিনা দোষে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল! কোন এবং কিসের আক্ষেপে সে আত্মহত্যা করল? নিশ্চয়ই, বইটার ভেতরে কোন চিঠিপত্র লিখে রেখে গিয়েছে। এইজন্যই বইটা খুলতে গিয়েছিল সে।

হপকিনসের চিঠি পাওয়া যায়নি।

পাওয়া যায়নি তার মৃত্যুকালীন কোন জবানবন্দী।

কিন্তু সুইসাইড কেস মনে করেই পুলিশ এসেছিল। আর তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছিল আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুর কোন ক্লু।

কিন্তু হপকিনস যে খাতায় সাঙ্কেতিক শব্দের নোট লিখত—তার বেশির ভাগ কাগজই মিসেস হপকিনস উনানের আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল। পুলিশের হাতে পড়েছিল, খাতার শুধু একটি পাতা। তাতে লেখা ছিল:—

এই সংসারের দিনের আলোর মত উজ্জ্বল আর শাশ্বত্য সত্য হলো—এই রাশি রাশি বই, ছবি, সোনার গয়না, চেয়ার টেবিল—এরা কোনটাই জড় নয়, প্রাণহীন নয়। বিশ্বচরাচরব্যাপী যে অফুরন্ত প্রাণের লীলা অবিরাম প্রবাহিত হয়ে চলেছে—সেই প্রাণ এদের ভেতরেও নিরন্তন স্পন্দিত হয়ে চলেছে……

তাই আমার মৃত্যু যখন নেমে আসবে…এই ঘরে আমার প্রাণহীন দেহটা পড়ে থাকবে। আমার শবদেহে আমার আত্মা ক্ষণকাল বিশ্রাম করেই সে আবার এই মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে অনন্ত নক্ষত্রলোক পেরিয়ে দূরে—বহুদূরে অজানা জগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে……

তাই আমি এসব লিখলাম এইজন্য যে মৃত্যু……

এই পর্যন্ত লিখে আর কিছু লিখতে পারেনি হপকিনস। কিম্বা হয়তো লিখেছিল—সেই কাগজ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু ডায়েরীর একটিমাত্র পাতার লেখাটুকু থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—মৃত্যুর চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল হপকিনসের মন।

না। আত্মহত্যা নয়।

কাউন্টির সবচেয়ে বড় ডাক্তার, হার্ট স্পেশালিস্ট এবং গভর্ণমেণ্ট হোম প্যাথলজিস্ট ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে ডেডবডি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে দুইজনেই রায় দিলেন—

সিনকোপ (Syncope)।

এই রোগে কিছুটা কিম্বা সম্পূর্ণভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং সেইসঙ্গে সেলিব্র্যাল ইসকেমিয়াতে (Celebral Ischemia) আক্রান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রক্ত চলাচল।

প্যাথলজিস্ট আরও বললেন, নাক মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে সারা শরীর রক্তে ভিজে ওঠে! এটা এক ধরনের প্রাচ্যদেশীয় রোগ—(Oriental disease)! মইতে উঠে বইটা পাড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে যায়, ডেডবডির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললেন হার্ট স্পেশালিস্ট, আর সঙ্গে সঙ্গে সিনকোপে আক্রান্ত হয় মিঃ হপকিনস। তাঁরা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে যান।

বেদনার শিলীভূত মূর্তির মত বসে থাকে মিসেস হপকিনস। স্বাভাবিক মৃত্যু বলে কিছুতেই তার মন মানতে চায় না। কোন অশুভ অদৃশ্য শক্তি তাকে নিশিরাতে অন্ধকার দোকানঘরে নিয়ে গিয়েছিল! বইটার ভেতরের বীভৎস আর কুৎসিত ছবিগুলোরই বা অর্থ কি; কি ছিল সাঙ্কেতিক লিপির ভেতরে—

গুপ্তবিদ্যার বিশেষজ্ঞ এবং যাদুবিদ্যার মস্ত পণ্ডিত মাইকেল হ্যারিসনকে ডেকে নিয়ে এল মিসেস হপকিনস। তিনি প্রাচীনদিনের বইটি অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। মিসেস হপকিনসকে যা বলার বলেছিলেন। শুধু তাই নয়—হোলিওয়েল স্ট্রীটের শান্ত, ভদ্র, অভিজ্ঞ বুকসেলার রুফুস হপকিনসের রহস্যময় মৃত্যুর পর সারা লণ্ডন যখন আলোড়িত হয়ে উঠেছিল তখন লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক 'টাইমসে' দিয়েছিলেন এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি—

সুপ্রাচীনকালের এই বইটির ভেতরে শয়তানের (Devil) আরাধনার বিবিধ প্রক্রিয়া এবং ছিল ডাইনীবিদ্যা ও গুপ্তবিদ্যার বা যাদুবিদ্যার বিশদ বিশ্লেষণ সমন্বিত সুদীর্ঘ আলোচনা। সাধারণ পাঠকের কাছে বিক্রির জন্য সচরাচর এই ধরনের বই কোন দোকানে পাওয়া যায় না। গুপ্তবিদ্যার এইসব বই রাখা হয় যাদুঘরে সিল করা বাক্সে আবার কখনও কখনও বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব বিশেষ

সংগ্রহের ভেতরেও থাকতে পারে। তবে—

সাধারণ কোন বইয়ের দোকানে একেবারেই পাওয়া যাবে না—তা বলা যায় না। একটি-দুটি ছিটকে এলেও আসতে পারে। যেমন এসেছিল মিঃ হপকিনসের দোকানে।

প্রায় অবিশ্বাস্য হলেও গুপ্তবিদ্যায় আছে, বই থেকেও মাঝে মাঝে দুষ্ট আত্মা বা শয়তানের আবির্ভাব হতে পারে। এবং মৃত্যুর কালো গহ্বরে ফেলে দিতে পারে মানুষকে।

এখানে মনে হয়, সাঙ্কেতিক লিপির মাধ্যমে গুপ্তবিদ্যার অত্যন্ত গূঢ় এবং গোপন কলাকৌশল হপকিনস জানতে চেষ্টা করছিল। কিছুটা জেনেও ছিল সেইজন্যই তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো।

সতের

ডাইনীবিদ্যার প্রধান পাণ্ডা—শয়তান কে? সত্যিই কি নিশিরাত্রে ডাইনীরা হায়েনার পিঠে চড়ে দূর-দূরান্তরে যায়। ডাইনী সন্দেহে ধৃত চৌরাশিটি স্ত্রীলোকের রোমাঞ্চকর বিবৃতি—

"গভীর রাত্রে আমরা পাহাড়ের অন্ধকার গুহার ভেতরে রাত্রিযাপন করি। আমরা চিতাবাঘের চামড়ার কটিবন্ধ সেই চামড়ারই জামা আর জাঙ্গিয়া পরি। কিন্তু টকটকে লাল তার রঙ। তারপর—

রাত যখন শেষ হয়ে আসে। পূবের আকাশে ভোরের রেখা জেগে ওঠে। আমরা তখন একে একে বেরিয়ে আসি গুহা থেকে। তারপরেই পাক খেয়ে খেয়ে নাচতে থাকি।

নাচ যখন শেষ হয়, তখন পূবের আকাশে রঙের সমুদ্রে ডুব দিয়ে সূর্য অনেকটা উঠে এসেছে। আমরা সেই সোনার রোদ গায়ে মেখে ছুটে চলে যাই রাস্তার মোড়ে। একটা উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ঠিক গুণে গুণে তিনবার আমরা শয়তানকে ডাকি—

প্রথমে খুব শান্ত আর মৃদু কণ্ঠে ডাকি। তারপরে দ্বিতীয়বারে আর একটু জোরে ডাকি। তাতেও যদি সাড়া না আসে তিনবারের বার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকি—

ও কি বলে ডাকি ভাবছেন? শয়তানের যদিও অনেক নাম আছে। আমরা ডাকি 'অ্যান্টিসেসর' বলে। রাশি রাশি তারায় ভরা আকাশের নিচে অন্ধকার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আমরা চিৎকার করে ডাকি—ও—অ্যান্টিসে-সর—এস—আমাদের বহন করে নিয়ে যাও তো-মা-র রা-জ্যে—

নিশ্চয়ই আপনারা জানেন না, শয়তানের জগতেরও আছে একটি নাম 'ব্লকুলা'! ব্লকুলা থেকে শাঁ শাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে সে আসে। আসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। নানারূপ ধরে সে আসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমরা তাকে দেখেছি —গায়ে ধুসর রঙের লম্বা কোট। পরণে রুপোর চুমকি বসানো লাল টকটকে পেণ্টুলন। মাথায় পাখির পালক তৈরি মুকুট বসানো খুব উঁচু টুপি। টুপিটা আবার বহুবর্ণ রেশমী রুমাল দিয়ে জড়ানো।

বৈচিত্র্যময় রঙে রঙীন কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো।

আগুনের ভাটার মত দুটো গোল গোল চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। সেই ভয়ানক দৃষ্টি দিয়েই খর চোখে আমাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করল শয়তান, তোমরা সমস্ত সত্বা দিয়ে অর্থাৎ দেহমন দিয়ে আমার অনুগত হবে কি না ?

হ্যাঁ—হবো !!! সমস্বরে বললাম আমরা।

বাঃ খুশি হলাম। এবার তাহলে চলো, শয়তান বলল। বলেই দূরে দিগন্তবিসারী প্রান্তরের ঘনজমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে যাদুদণ্ড দিয়ে কি ইঙ্গিত করল কে জানে! সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্ধকার ফুঁড়েই বেরিয়ে এল এক একটা নিকষ কালো ছায়ার মত একপাল কালো হায়েনা।

তোমরা সবাই এক একটি হায়েনার পিঠে চেপে যাত্রা শুরু করো—কঠোর গলায় আদেশের ভঙ্গীতে বলল শয়তান !

আমরা যন্ত্রচালিতের মত হায়েনার পিঠে সওয়ার হলাম। বাতাসের বেগে চলতে লাগল সেই জানোয়ার। কত মাঠ, কত নদী, কত প্রান্তর পেরিয়ে গেলাম আমরা। এক সময়ে থামল।

যাত্রা শেষ হলো।

আমার মনে হলো, এক বিস্তীর্ণ বনভূমির প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। নজরে পড়ল, ভুতুড়ে অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভগ্ন আর জীর্ণ একটা গীর্জা! চার্চ বাড়িটার এখানে সেখানে প্লাষ্টার খসে গিয়ে নোনাধরা শ্যাওলাপড়া ইট দাঁত বের করে হাসছে। কোথাও বা ইটের ফাঁকে ফাঁকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আগাছার জঙ্গল। হয়তো বা বহু বছরের ঝড়ে জলে গীর্জার বাড়িটাই ডান দিকে হেলে গিয়েছিল। তাই পিছন দিকে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে লোহার শিকল বাঁধা আছে প্রাচীনদিনের বাড়িটা!

পোড়ো বাড়ির মত এই চার্চবাড়ির ভেতরে ঢুকতে হবে! আমার শরীরের ভেতরটা শির শির করে উঠল। চারিদিকের গাছগাছালির পাতায় পাতায় বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে! একটানা ঝিঁ ঝিঁর নূপুর বেজে চলেছে।

কঁক্—কঁক্—কাঁ—আ—রাতচরা একটা পাখি কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

আমাদের বুকে ভয়ের ধুকুপুকু।

চার্চে গিয়ে দীক্ষা দেওয়ার পরে কে জানে কি করতে বলবে, আবার কোন অজানা দেশে নিয়ে যাবে শয়তান? বুকের ভেতরে মাথা কোটে—মর্মান্তিক একটা আক্ষেপ—কেন-কেন যে ডাইনী হতে চেয়েছিলাম—এই পর্যন্ত বলে

থেমে গিয়েছিল ডোরা।

তার দীর্ঘতন্বী দেহে তেইশ বছরের উথাল পাথাল যৌবন। সে সুইডেনের এলফ্যাডে গ্রামের মেয়ে। সে ডাইনী বলে সুইডেনের স্পেশাল রয়্যাল পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশের কাছে জবানবন্দীতে সে ওপরের ওই কথাগুলো বলেছিল। গণ্ডগ্রামের সরল নিরক্ষর মেয়ে ডোরা অবশ্য বলেছিল আরো ভয়ঙ্কর—আরো রোমহর্ষক এবং প্রায় অবিশ্বাস্য অনেক কথা।

কিন্তু ডোরার বিবৃতি সম্বন্ধে বিশদ বলতে হলে সুইডেনের সপ্তদশ শতাব্দীর ষাটের দশকের সামাজিক ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরাতে হয়। আলোচ্য শতকের শেষার্দ্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী তথা সমগ্র ইউরোপের তথা সুইডেনেও গুপ্তবিদ্যা বা ডাইনীতন্ত্রের কলাকৌশল এবং বীভৎস ও জটিল ক্রিয়াপ্রকরণ অনুশীলনের মানসিকতা মহামারীর মত দেখা দিয়েছিল।

১৬৬৯ সাল। মোহরা এবং ডোরার গ্রাম এলফ্যাডেলে যেন মহাপ্রলয় নেমে এসেছিল। একটি রাত্রিতেও কোন তরুণী মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতো না। নিশির ডাকেই হোক কি অদৃশ্য এবং অশ্রুত কোন ইঙ্গিতেই হোক মাঝরাতে তারা বেরিয়ে যেত। কেউ বিস্রস্ত বেশবাস এবং বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে পরদিন সকালে ফিরে আসতো; আবার কেউ বা ফিরতো দিন তিন চার পরে সব হারিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে। অনেকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের ভেতরে আর ফিরেই আসতো না।

শয়তানের সাধনভজন (Satanic rituals) থেকে শিশু এবং বালকরাও বাদ পড়েনি। দিন তিনেকের ভেতরে মোহরা এবং এলফ্যাডেল গ্রাম থেকে বিশ জন বালক ও শিশু উধাও হয়ে গেল। তাদের একজনও আর গ্রামে ফিরে এল না।

ডাইনীবিদ্যার কুশীলবরা তাদের কোন বীভৎস ক্রিয়াপ্রকরণে নিয়োজিত করেছিল এবং সুকুমার মতি সরল এবং অবোধ বালকদের দৈনন্দিন কার্যক্রম কি ছিল এসব কিছুই কখনো জানা যেত না—যদি মোহরা গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সুইডিশ রয়্যাল কমিশনের (Swedish Royal Commission) কাছে নালিশ না করতো।

মোহরা এবং এলফ্যাডেল গ্রামের জনসাধারণ প্রায় একহাজার বিশিষ্ট বাসিন্দার স্বাক্ষর নিয়ে যে যুক্ত আবেদন করেছিল তার সারাংশ নিচে দেওয়া হলো—

আমরা গ্রামবাসীরা নিদারুণ আতঙ্কে দিনযাপন করছি। প্রতিদিন

মধ্যরাত্রে যে-ই রাস্তায় বেরোতে নিষেধ করে কারফিউয়ের ঘণ্টা বেজে ওঠে, প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই লোকালয় ছাড়িয়ে দূরে যেখানে রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানা শুরু হয়েছে, সেইখান থেকে শিঙা বেজে ওঠে। তার সেই গম্ভীর আর দূরাগত চাপা আওয়াজ পাওয়া মাত্র যুবতী মেয়ের দল বিভিন্ন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। অন্ধকারে এক একটি ছায়ামূর্তির মত তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে। আমরা অনেকবার বাধা দিয়েছি। অনেকবার তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পথ অবরোধ করেছি। কিন্তু তারা বাঘিনীর মত ক্ষিপ্ত আক্রোশে জ্বলে ওঠে। ভয় দেখিয়ে বলে খবরদার বাধা দিও না—শয়তান তোমাদের পাপ দেবে তোমাদের হত্যা করবে।

মহাশয়! আমরা গেঁয়ো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ আমরা ওদের কথায় ভয় পেয়ে নিরস্ত হয়ে যাই। ফলে আমাদের কারো একমাত্র মেয়ে, কারো বা সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে আমরা আর ফিরে পাচ্ছি না।

আমাদের বিনীত অনুরোধ, আপনি অতি শীঘ্র অনুসন্ধান করুন, কে এই শয়তান যার শিঙার আওয়াজ পেয়ে ঘরের নিশ্চিন্ত জীবনের মায়া কাটিয়ে, অন্ধকার বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়ায় মেয়েরা। খোঁজ করুন, শয়তান তাদের কোথায় নিয়ে যায় এবং ডাইনীবিদ্যার ক্রিয়াপ্রকরণের কোন কাজে নিয়োজিত করে। দ্বিতীয়তঃ ধর্মাবতার রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই জানা দরকার, শয়তানের সাধনসঙ্গিনী মেয়েরা কি করে বলে, শয়তান আমাদের হত্যা করবে। দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্যই এই সমস্যাটির বিশদ ও ব্যাপক অনুসন্ধান হওয়া একান্ত কাম্য—

এই আবেদন পেয়েই সুইডিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রাম-গ্রামান্তরে অনুসন্ধানের জন্য গঠন করেছিল একটি কমিশন—সুইডিশ রয়্যাল কমিশন! এই কমিশন গ্রামে গ্রামে ঘুরে পেয়েছিল ডাইনীদের সম্বন্ধে বহু রোমাঞ্চকর তথ্য। আর সেইসব বিবরণ বিশদ লেখা হয়েছিল সরকারী পাবলিক রেজিষ্টারে। এই গভর্ণমেণ্ট ডকুমেণ্টে প্রতিটি ডাইনীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সেই সরকারী নথিপত্র থেকেই ডাইনী ডোরার বিবৃতির বাদবাকী অংশটুকু এখানে দেওয়া হলো—

"আমাদের সবাইকে লাইন করে সেই পোড়ো বাড়ির মত সেই চার্চের ভেতরে নিয়ে এল শয়তান। আমরা ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিশাল এক হলঘরে এসে দাঁড়ালাম। দূরে উঁচু বেদীর ওপরে পাঁচটা বড় বড় কালো

মোমবাতি জ্বলছে। সেই স্বল্প আলোয় চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকার কেমন ভয়াল ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। জ্বলন্ত মোমবাতির সামনে মেঝেতে কোন জন্তুর কালো চামড়ার চারিদিকে চারটা কাঁটা দিয়ে আটকানো। সেই চামড়ার আসনের ওপরে সারি সারি পাঁচটা নরমুণ্ডু। সেই আলো আঁধারিতে আচ্ছন্ন ঘরে করোটি কঙ্কালগুলির চোখের কালো অন্ধকার কোটর, মুখের গহ্বরের কালো রেখায় যেন আমাদেরই অনাগত সেই সর্বনাশা ভবিষ্যতের অনিবার্য ইঙ্গিত! এবার তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষার মন্ত্র বলো, বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল শয়তান।

ভয়ানক দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে মন্ত্র বলতে শুরু করল সে। সে যা বলল, আমরাও তাই বলে গেলাম যন্ত্রচালিতের মত।

একসময় মন্ত্র বলা শেষ হলো। নিথর স্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল হলঘর। এইবার বেদীর ওপর থেকে ধীর পায়ে নেমে এল শয়তান। তারপরেই পায়ে পায়ে ধূর্ত একটা অভিসন্ধির মূর্তির মত এগিয়ে এল একেবারে আমাদের কাছে। গুলিভাটার মত সেই জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর, আরও তীব্র করে আমাদের দেখতে লাগল। আমাদের মনে হলো তার লোলুপ দৃষ্টি যেন লেহন করছে সর্বাঙ্গ। অল্পবয়সী এবং তরুণী মেয়েদের যেন একটু বেশি সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সে চলে গেল দূরে এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে।

কিছুক্ষণ পরে শয়তান তার এক অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে আবার এল। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের হাতে একটি করে উল্কির ছাপ দিয়ে দিল শয়তান। বলল শান্ত মৃদু কণ্ঠে, যাদের হাতে ছাপ দেওয়া হলো তাদের প্রত্যেকের সুদক্ষ ডাইনী হওয়ার সমস্ত লক্ষণ আছে; একটু থেমে আবার বলেছিল, আমি এদেরই আগে দীক্ষা দেব—আমিও ছিলাম এই দলে।

আমি যুবতী। লোকেও বলে সুন্দরী। তাই শয়তান আমারও হাতে উল্কির ছাপ দিয়েছিল।

দীক্ষার ভেতরে তেমন নতুনত্ব কিছু নেই। সেই হাতে পায়ে মন্ত্রপূত মলম মাখিয়ে দেওয়া এবং জামা খুলে ডান স্তনের নিচে চিরে দিয়ে সেখানে ওষুধের প্রলেপ লাগানো। এসবের পরেই কিন্তু ঘটে গেল সেই বিচিত্র ঘটনা—

বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। কী কুক্ষণেই যে ডাইনী হতে গিয়েছিলাম।

আমার বাবা খুব গরীব। সমুদ্রে মাছ ধরে সংসার চালায়। ভালো সাজ-সরঞ্জাম ছাড়া মাছ ধরা যায় না। সপ্তাহে তিনদিনই হাঁড়ি চড়ে না।

তারপরে গোদের ওপরে আবার বিষফোঁড়ার মত আমরা পাঁচ-পাঁচটা বোন। টাকাপয়সার অভাবে একজনেরও বিয়ে দিতে পারে নি বাবা।

ধর্মাবতার। গভীর হতাশাই আমাকে ডাইনী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রোমাঞ্চকর কিছু করবো। মন্ত্রবলে কাউকে যমের দুয়ারে পাঠাবো। আবার হয়তো কারো জীবনের সুখশান্তি ফিরিয়ে এনে দেব।

কিন্তু সেই ডাইনী হতে গিয়ে যে এত অপমান আর চরম লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে তা কল্পনাও করি নি হুজুর। ধর্মাবতার বড়ই লজ্জার কথা সেসব। কোন মেয়ের পক্ষে নিজের মুখে বলা খুব কঠিন !

ধর্মাবতার নারীজীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব—সবচেয়ে বড় সম্পদ—সেই সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে আমি যখন রিক্ত আর ক্লান্ত হয়ে শয়তানের সুগন্ধী আতরের মিষ্টি গন্ধে ভরা প্রমোদকক্ষের এক কোণে বসে আছি, তখন শয়তান আবার এল। হাসি হাসি মুখ।

আমার বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করে উঠল। কে জানে আবার কি মতলব! শয়তান সস্নেহে আমার পিঠে হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল, খিদে পেয়েছে—খাবে কিছু? তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দুইজন ক্রীতদাসী রূপোর থালায় রুটি, ভেড়ার মাংস, পনীর ইত্যাদি আরও অনেক রকম আহার্যসম্ভার নিয়ে আমার সামনে নামিয়ে রাখল।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার শুধু মনে হলো, ওই খাবারগুলোর প্রতিটি কণায় কণায় শয়তানের সহস্র পাপের অদৃশ্য চিহ্ন আঁকা আছে।

নাও—খেয়ে নাও, কঠিন স্বরে শয়তান বলল, সেই রাতদুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছো—

না, মাফ করবেন, আমি খাবো না—খেতে পারবো না. তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আমি বললাম, অনুগ্রহ করে আমাকে ছেড়ে দিন, বলতে বলতে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম।

শয়তানের গুলিভাটার মত দুটো জ্বলন্ত চোখে ধারালো একটা হাসি ছুরির ফলার মত ঝিকমিক করে উঠল।

কয়েকমুহূর্ত পর দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল শয়তান. তুমি বোধহয় জানো না, আমার ব্লকুলায় (Blockula) একবার এলে আর ফিরে যাওয়া যায় না—একটু থেমে আবার বলল, যদি বাঁচতে চাও কোন বেয়াদপি করো না—

ফাঁসীর আসামীর মত নিতান্ত অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। শোনো ভোরা তুমি মন্ত্রপুত ডাইনী হয়ে গিয়েছ, শয়তান বলল, এবারে তুমি অলৌকিক

ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে, বলেই দরজার আড়ালে কাকে যেন কিসের ইঙ্গিত করল। আর সঙ্গে সঙ্গে সারি বেঁধে এল তিনজন ক্রীতদাস। তাঁদের একজনের হাতে একটা অতি দীর্ঘ শিঙ্গা। আর একজনের হাতে প্রায় তিন ফিট লম্বা একটা লোহার নাল। এবং তৃতীয় ব্যক্তি বহন করে নিয়ে এল একটা বিশাল হাতুড়ি!

লক্ষ্য করলাম, শিঙ্গাটা মাটিতে নামিয়ে রাখতেই ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগল। কী ব্যাপার! ভয়ে বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে উঠল। আমি সরে দাঁড়ালাম। কি জানি—কি আছে এর ভেতরে!

ভয় পেও না—তোমার বাহন আছে শিঙ্গার ভেতরে অভয় দিয়ে বলল রকুলার অধীশ্বর। আর তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সেই বিশাল শিঙ্গার ভেতর থেকে উঁকি দিল ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলে ভরা একটা মাথা। দেখতে দেখতে অনেক কসরৎ করে সে সারা দেহটাকে শিঙ্গার ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এল।

সেই ক্রীতদাসের ঘাড় ধরে আমার সামনে নিয়ে এল শয়তান। বলল আমাকে, এই নাও হাতুড়ি—এই হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে লোহার নাল দিয়ে লাগাম আটকাবে এই ক্রীতদাসের মুখে। তারপর শক্ত করে লাগাম ধরে তুমি ওর পিঠে চেপে বসবে ঘোড়ায় চড়ার মত করে—

তারপব?

তোমাকে ঝড়ের গতিতে নিয়ে যাবে পশুটা—

কোথায়?

আহা, অত প্রশ্ন করো না। গিয়েই দেখো না, একটু থেমে আবার শয়তান বলল, ডাইনীদের অত কৌতূহল শোভা পায় না—

লোকটার মুখে লাগাম লাগিয়ে আমি তার পিঠে চেপে বসলাম। পাগলা ঘোড়ার মত দুরন্ত গতিতে ছুটতে লাগল সে। নিশি রাতের অন্ধকারের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছে সে ঝড়ের বেগে।

দেখলাম, লোকটা সব জানে, কোথায় কোথায় নিয়ে যেতে হবে—কোথায় যাওয়া দরকার! প্রথমেই সে আমাকে নিয়ে গেল অনেক অনেক দূরে এক গণ্ডগ্রামের শেষপ্রান্তে একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়িতে। তার চারিদিকে বড় বড় এক একটা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ভূতুড়ে অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে।

এই জনমানবহীন শ্মশানপুরীতে আমাকে নিয়ে এল কেন!

সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কানে এল বাঁশীর দূরাগত মধুর স্বর। সেই আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজছে ড্রাম। বাজছে ঝাঁঝর—ঝম-ঝম—সেই ঐকতানের সুমধুর স্বরের মূর্চ্ছনায় চারিদিকের বনবনান্ত যেন কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ হয়ে যাচ্ছে।

আমার বাহন আমাকে বাড়ির ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল। খুব উঁচু উঁচু কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে বড় একটা হলঘরের সামনে আসতেই আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল। অনেকগুলো জ্বলন্ত মশালের আলোয় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডাইনীদের সেই প্রমোদ কক্ষ।

কিন্তু লজ্জায় আমাকে চোখদুটো ঢাকতে হলো। প্রতিটি খরযৌবনা তরুণী সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মশালের লাল আলোয় তাদের অনাবৃত যৌবনের শোভা কেমন সুদূর আর অপার্থিব মনে হচ্ছে। মেয়েরা একটি সুদর্শন তরুণকে ঘিরে উদ্দাম বেগে নেচে চলেছে।

থেকে থেকেই ছেলেটি কোন একটি মেয়েকে পরম আদরে জড়িয়ে ধরে ছুটে চলে যাচ্ছে পাশের একটা ছোট কুঠুরিতে।

কিছুক্ষণ পর তারা দুইজনেই ফিরে আসছে ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত হয়ে। আমার মনে হলো, কোথায় গুপ্তবিদ্যা বা ডাইনীবিদ্যার সাধনা। এসব তো মেয়েপুরুষের নিছক যৌনলীলা।

—এস-এস চলে এসো, দাঁড়িয়ে আছো কেন? নাচতে নাচতেই একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। কোদালের মত বড় বড় দাঁত বের করে হেসে বলল, উলঙ্গ হয়ে না নাচলে ডাইনীবিদ্যায় তোর সিদ্ধি হবে না, বলতে বলতেই আমার কাছে এল। আর ক্ষিপ্র হাতে আমার স্কার্ট ব্লাউজ খুলে আমাকে নিরাবরণ করতে চেষ্টা করল—

করছেন কি—করছেন কি আপনি, বলেই তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ছুটে বাইরে চলে গেলাম। কানে এল স্পষ্ট, মেয়েরা প্রেতিনীর মত ঘেঙিয়ে হাসতে হাসতে বলছে—ওই মাগী কখনও ডাইনী হতে পারবে না—

সেখান থেকে পালিয়ে আসার পর আর বলবার মত তেমন কিছু বিবরণ নেই। আমার বাহন আমাকে নিয়ে এল একটা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের নিচে। ক্রীতদাস আমাকে সেই পাহাড়ের ওপরে চলে যেতে ইঙ্গিত করল।

খুব কষ্ট করে থেমে থেমে ওপরে উঠে দেখলাম, তিন কুৎসিত, কদাকার বুড়ি এক বিশাল চুল্লীতে কি যেন সেদ্ধ করছে—

আয়—আয়—তুই তো নতুন ডাইনী হয়েছিস খেঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলল এক বুড়ি। আয় দেখবি, কেমন কুমীরের হৃদপিণ্ড, সাপের চর্বি আর প্যাচার যকৃৎ দিয়ে মারণ ওষুধ তৈরি করছি—

তুই একটু নিয়ে যাবি তো? আর এক বুড়ি বলল, শোন শুধু মারণ নয়—বশীকরণেরও ওষুধ আছে।

না—না, আমার কিছু দরকার নেই, বলেই ছুটে নেমে গেলাম। ওষুধের উৎকট গন্ধে আমি সেখানে আর থাকতে পারছিলাম না।

বাহন আমাকে দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে এল শয়তানের সেই প্রমোদগৃহ বা ব্লকুলায়। তারপরে, বলাবাহুল্য, আমার করুণ এবং মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল। অবশ্যই বলতে হবে সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আমার জীবনে হয়ে গিয়েছিল আশীর্বাদ। কিন্তু—

এখন থাক সেসব কথা। বলা দরকার, ব্লকুলায় আমার রোমাঞ্চকর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা—

নতুন ডাইনীদের (সদ্য দীক্ষিত) ভ্রমণের জন্য শয়তান শুধু যে মানুষ-বাহন দেয়, তা নয়। আমি দেখেছি, কোন কোন ডাইনীদের দিয়েছে গাধা, হায়েনা এবং ঘোড়া কি আর কোন ভারবাহী জন্তু। আবার সময় সময় বাঁশের লাঠি এবং লোহার শিকও দেওয়া হয়েছে। লাঠি কি লোহার শিকের ওপরে সওয়ারী চেপে বসলেই কে জানে কোন মন্ত্রপূত রহস্যময় কৌশলে সেগুলো উল্কার গতিতে ছুটতে থাকে। নদী নালা খাল পেরিয়ে চলে যায় চোখের পলকে।

কিন্তু ছাগল যখন বাহন তখন তার একটা সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে। ছাগলকে ডাইনীরা বলে অ্যাজাজেল (AZAZEL)। অ্যাজাজেল বাহন হলে তাদের সঙ্গে থাকে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। এই শিশুসন্তানদের বসার জন্যে ছাগলের পিঠের ডানদিকে থাকে লোহার শিক দিয়ে তৈরি একটা দোলনা! এই দোলনা বা বসার অভিনব ব্যবস্থা কিন্তু একমাত্র অ্যাজাজেলের ক্ষেত্রেই থাকে। ছেলেমেয়েদের মা-বাবার হাতে থাকে একটি শিশিতে ক্রিজম (CHRESM) বা মন্ত্রপূত তেল। এই তেলকে ডাইনীরা কনসিক্রেটেড অয়েলও (Consecrated Oil) বলে। শিশুদের বসানোর আগে দোলনার শিকগুলোকে সেই তেল দিয়ে মালিশ করে নেয়। কিন্তু—

তাদের এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দূরদূরান্তরে যাত্রার নিয়মকানুন একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। যেতে যেতে যদি কোন শিশু দৈবাৎ মিশরীয় যাদুকরের কথা

বলে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যায়—

বিদ্যুতগতিতে অ্যাজাজেল দিক পরিবর্তন করে আর ঝড়ের গতিতে অনেক—অনেক দূরে অজানা দেশে নিয়ে যায়। বলাবাহুল্য এসবই হয় যাদুর প্রভাবে।

বহু—বহু দূরের সেই দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা আর ফিরে আসতে পারে না। সময় সময় সেই অচেনা অজানা দেশে ছোট ছোট শিশুরা অদৃশ্য শক্তির হাতে মর্মান্তিকভাবে প্রহৃত হয়। কেউ কেউ আবার প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মারাও যায়।

আমার ওপর ভার পড়ল অ্যাজাজেলে করে দুইটি শিশুকে নিয়ে যাওয়ার। আমি তাদের পই পই করে বলেছিলাম, ছাগলের পিঠে যতক্ষণ থাকবে, একটা কথাও বলবে না; তাহলে কিন্তু ভয়ানক বিপদ হবে—

কিছুই লাভ হলো না। অ্যাজাজেল যখন দুরন্ত গতিতে ছুটে অনেক বড় বড় নিঃসীম প্রান্তর পেরিয়ে চলেছিল ঠিক তখুনি একটি শিশু বলে ফেলল, যীশুর নাম!

সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল অ্যাজাজেল।

এক ঝাঁকি দিয়ে গা মোড়ামুড়ি করে বাচ্চাদের শুদ্ধো আমাকেও ফেলে দিল মাটিতে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল শয়তান। যে শিশুটি যীশুর নাম বলেছিল তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল

তোর এত বড় সাহস—আমারই আশ্রয়ে থেকে যীশুর ভজনা করিস তুই, তোকে আমি টিপে মেরে ফেলবো, বলেই ছেলেটির গলাটা খপ করে ধরল। ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সাত আটবছরের সেই ছেলেটি। দ্রুত হাতে তার গলার ভেতর কাপড় গুঁজে দিয়ে তার কান্না থামিয়ে দিল শয়তান! তারপরেই করে বসল সেই ভয়ানক নৃশংস কাণ্ড—

ছেলেটিকে মাথার ওপর তুলে ধরে শূন্যে তিন চারটা পাক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল অদূরে উত্তাল সমুদ্রে। ঝপ করে একটা শব্দ হলো। আর সাগরের কাজলকালো জলে বিন্দুরই মতই মিলিয়ে গেল সে।

এইবার শয়তান পায়ে পায়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। রক্ত চোখ দুটো নাচিয়ে বলল, ছোট ছোট ছেলেরা কেমন করে ওই নরাধম পশু যীশুটার নাম জানতে পারল?

আমি কিছু জানি না হুজুর—আমি কিছু বলিনি ওদের, আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার পিঠে পড়ল শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক। মর্মান্তিক

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম। ডাইনী হিসেবে কোথাও তোর যোগ্যতা প্রমাণিত করতে পারিসনি, বলেই আবার চাবুক মারে শয়তান। একটু থেমে আবার বলে, ডাইনীদের মারন ওষুধে তোর গন্ধ লাগে—তুই আর পাঁচটা ডাইনীমেয়ের মত ন্যাংটো হয়ে নাচতে পারিস না—তোকে দিয়ে আমার কি হবে, বলেই এলোপাথড়ি চাবুক চালাতে লাগল। আমার চোখের সামনে ঘনিয়ে এল পুঞ্জ পুঞ্জ কালো অন্ধকার! আর আমার মনে হলো, আমি যেন গভীর অন্ধকার একটা খাদের ভেতরে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছি।

তারপরে আর কিছু আমার মনে নেই। জ্ঞান যখন হলো, তখন দেখলাম আমার গ্রামে আমারই বাড়ির বারান্দায় শুয়ে আছি—আমাকে ঘিরে মা-বাবার এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের উৎসুক বেদনাতুর মুখ।

সুইডিশ রয়্যাল কমিশনের কাছে ডোরার জবানবন্দী এইখানেই শেষ হলো।

রয়্যাল সুইডিশ কমিশনের কমিশনাররা খুব যত্ন নিয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। তাই জানতে পেরেছিলেন ডাইনীদের অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং অনেক রোমাঞ্চকর স্বীকারোক্তি! গুপ্তবিদ্যার কুশীলবদের প্রত্যেকের বিবৃতি এবং কমিশনারদের মন্তব্য—ইত্যাদি বিশদ রেকর্ড করা হয়েছিল পাবলিক রেজিষ্টারে।

স্টকহলমের মিউজিয়ামে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে সুইডেনের সপ্তদশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনের শোচনীয় অবক্ষয়ের সেই দলিল—পাবলিক রেজিষ্টার! গুপ্তবিদ্যার অনুশীলনে লিপ্ত বিপুলসংখ্যক নারীপুরুষ শিশুবৃন্দের জবানবন্দী, এবং কমিশনারদের জেরা ও জিজ্ঞাসাবাদ আর তাদের শাস্তির ইতিবৃত্তের ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সুইডেনের তদানীন্তনকালের সমাজের প্রতিচ্ছবি।

বিশদভাবে প্রতিটি কেসের তদন্ত হয়ে যাওয়ার পর কমিশনাররা কাকে কি করকম শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন তারই বিবরণ এখানে দেওয়া হলো—

ক) ২৩ জন সাবালক মেয়েপুরুষকে দীর্ঘ একমাসের প্রতিদিন বেত্রাঘাত এবং ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

খ) ১৫জন শিশুকে একমাসের কারাবাস।

গ) ২০জন শিশুকে গীর্জার সামনে পর পর তিনবার করে চাবুক।

আরও অনেকের অনেক রকম শাস্তি দিয়েছিল—সেই বৃত্তান্তের আগে বলা দরকার মোহরার এক অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহস্থবধূ রোজালিণ্ডের কথা।

রোজালিণ্ড খুব শান্ত, নম্র আর মিষ্টি চেহারার মেয়ে। দুইটি সন্তানের জননী। স্বামীর ভালবাসা আর শিশুর কলকণ্ঠ দিয়ে ঘেরা তার সুখের সংসার। তবুও—

তবুও কেন যেন ডাইনীবিদ্যা শেখার দুর্বাসনা জেগেছিল তার। এক প্রতিবেশী বন্ধ্যা মহিলার প্ররোচনায় সে বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছিল।

গভীর রাতের অন্ধকারে শয়তানের প্রতিনিধি রোজালিণ্ডকে হায়েনার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল ব্রকুলায়। এই অঞ্চলের প্রমোদগৃহের আবার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল।

ঘনসবুজের ছবির মত নরম আর স্নিগ্ধ ঘাসে আচ্ছন্ন বিশাল এক প্রান্তর তার শেষটা যেন কুয়াশাঘেরা সুদূর দিগন্তে উধাও হয়ে গিয়েছে। সেই নিঃসীম প্রান্তরের মাঝখানে সুরম্য এক অতিকায় প্রাসাদ। বহুবর্ণে রঞ্জিত তার প্রধান তোরণ। আর সেই প্রধান তোরণের দুইপাশে পাহারারত বাঘের মত বিশাল কালো কুচকুচে দুইটি কুকুর। কিন্তু তাদের চোখ দুটো কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঘুমের ভাবে তারা শরীর এলিয়ে দিয়েছে দেওয়ালের গায়ে।

কিন্তু তাদের পায়ের শব্দ পাওয়ামাত্র কুকুর দুটো লাফিয়ে উঠে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। শয়তানের লোক হাত তুলতে তারা শান্ত হলো। তারা ভেতরে এল।

নানারঙের ফুলের সমারোহে ভরা এক মনোরম উদ্যান। বাগানে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাদের বা তারা দাঁড়িয়ে গেল।

মধুর এক বাঁশীর মিষ্টি সুরের মূর্চ্ছনা যেন মনে হলো কোন সুদূর এক অজানা জগত থেকে বাতাসে ভেসে আসছে।

তারা কৌতূহলী হয়ে এদিকে ওদিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। তারা ধীর পায়ে এগিয়ে এল। শয়তানের প্রতিনিধির নির্দেশে তারা এল বিশাল একটা হলঘরে। ঘরটাকে প্রাচীনযুগের রাজরাজড়াদের দরবার কক্ষ বলে মনে হয়।

রোজালিণ্ড এবং তার অন্যান্য সঙ্গীনিদের চোখে অজানা আশঙ্কার ছায়া থর থর করে কাঁপছে। তারপর কোথায় নিয়ে যাবে—কি করতে বলবে?

ঘরের মাঝখানে প্রায় দুইশোজন মুখোমুখি বসতে পারে এমন একটা বিশাল টেবিল। তার দুদিকে সারি সারি সাজানো আছে চেয়ার। রোজালিণ্ডরা এই চেয়ারে একে একে বসল।

বাঁশী তখনো বেজে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল বাঁশীর আওয়াজ। বেজে উঠল ড্রাম

ড্রুম-ড্রুম্-ড্রুম—তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শোনা গেল বিউগলের দূরাগত আওয়াজ। আর সেই ড্রাম ও বিউগলের সুমধুর ঐকতানের ভেতরে যেন কোন বিখ্যাত ও দোর্দণ্ডপ্রতাপ কোন ব্যক্তির আবির্ভাবের সঙ্কেত সূচিত হলো।

খট্—খট্—খট্—দ্রুত পদশব্দ বেজে উঠল নেপথ্যে।

পাত্রমিত্র অনুচরদের নিয়ে ব্লকুলার অধীশ্বর শয়তান প্রবেশ করলেন সেই দরবারকক্ষে! তার গায়ের দীর্ঘ কালো আলখাল্লায় সোনালীরঙ করা মাছের আঁশের চুমকি বসানো। গলায় ঝুলছে নানাবর্ণের পুঁতির মালার মাঝখানে করোটি কঙ্কালের এক টুকরো হাড়। মাথায় রক্তবর্ণ লম্বা টুপি। পরণে কাপালিকের মত লাল টকটকে রক্তাম্বর। তার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গায়ের রঙে লাল টুপি, লাল কাপড়ে তাকে রোজালিণ্ডের মনে হয়েছিল যেন মৃত্যুলোক থেকে নেমে এসেছে কোন কালান্তক যমদূত।

রোজালিণ্ডের বুকটা আশঙ্কায় ভারী হয়ে উঠল।

শয়তান ধীর পায়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। আর সেই বিশাল টেবিলের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। হ...তা ...রিপ করলেন কে কতটা যৌবনপুষ্ট, কে কতটা সুন্দরী!

কিন্তু কারো সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। আবার মঞ্চে ফিরে গেলেন। বললেন খুব আস্তে আস্তে আর মৃদুকণ্ঠে—খুব বিপদসঙ্কুল আর দুরূহ সাধনায় তোমরা অগ্রসর হচ্ছো। তাই তোমাদের বলছি, কয়েকটি খুব জরুরী কথা—

প্রথমতঃ আমি ডাইনীবিদ্যার সাধনায় দীক্ষা দেওয়ার পর তোমরা আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। সমাজ, সংসার, তোমাদের সাবেক জীবনের সব স্মৃতি বেমালুম ভুলে যেতে হবে—

দ্বিতীয়তঃ বলা দরকার, তোমাদের ভেতরে কে ইহুদী, কে খ্রীষ্টান—আমি জানি না—জানতে চাই না। ধর্ম নিয়ে আমি কোন প্রশ্ন করবো না। তবে জেনে রাখবে খৃষ্টধর্মকে আমরা শয়তানের উপাসকরা সমর্থন করি না। আমরা পৌত্তলিক—আমাদের দেবতা অ্যাজাজেল। পরে আমি তাঁর কাছে তোমাদের নিয়ে যাবো—

মনে রাখবে, ডাইনীতে দীক্ষিত হওয়ার পর ইহুদী ছোকরা সেই ভণ্ড যীশুর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারবে না! দৈবক্রমে হঠাৎ যদি কেউ যীশুর নাম বলে ফেলে তাহলে তাকে ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে—এই পর্যন্ত বলে থামলেন শয়তান।

কিছুক্ষণ পর আবার আস্তে আস্তে বললেন, এইবার তোমরা চক্র

অ্যাজাজেলের মন্দিরে। সেখানে দেবতার সামনে তোমাদের দীক্ষা হবে—

আমরা সারি বেঁধে গেলাম—শ্বেতপাথরের তৈরি এক সুদৃশ্য মন্দিরে। সেখানে রাশি রাশি রঙবেরঙের ফুলে আর গন্ধধূপের ধোঁয়ায় এক শান্ত গম্ভীর আরত্রিক পবিত্রতা বিরাজ করছে। কিন্তু দেবতার বিচিত্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রোজালিণ্ড!

এ কী অদ্ভুত মূর্তি!

কালো পাথরে তৈরি দেবতার নিম্নাঙ্গ ছাগলের মত আর উর্দ্ধাঙ্গে মানুষের আকৃতি। খোঁচা খোঁচা চুলেভরা মাথার দু'দিকে দুটো বড় বড় শিং! তাঁর দুই হাতে দুটো নরমুণ্ড ঝুলছে। আর তাঁর সামনে মেঝেতে শোভা পাচ্ছে করোটি কঙ্কালের ভেতরে তাজা রক্ত—হয়তো অ্যাজাজেলের পূজার উপাচার।

এইবার তোমরা অ্যাজাজেলের* পাদস্পর্শ করে শপথ করো—যতদিন বেঁচে থাকবে সমস্ত সত্তা ঢেলে দিয়ে শয়তানের (আমার) সেবা করবে এবং তার আনুগত্য স্বীকার করবে—

রোজালিণ্ড এবং তার সঙ্গিনীরা নিঃশব্দে এবং বিনা প্রতিবাদে শয়তানের নির্দেশ অনুযায়ী শপথ করল। আর তারপরেই শয়তানের এক অনুচর এসে প্রত্যেকের কপালে পরিয়ে দিল রক্তচন্দনের তিলক।

শেষ হলো তাদের গুপ্তবিদ্যায় দীক্ষা।

কিন্তু সেই নরমুণ্ড, সেই তাজা রক্ত এবং দেবতার সেই কিম্ভুতকিমাকার

*ডাইনীবিদ্যা বা ব্ল্যাকমাসের কুশীলবদের উপাস্যদেবতা হলো—অ্যাজাজেল। সুইটজারল্যাণ্ডে, ডেনমার্কে, স্পেনে, ইটালীতে ডাইনীরা এই দেবতার পুজো করে। ইংল্যাণ্ডে যে দেবতা অ্যানিজা—সেই দেবতাই সুইডেনে হয়েছে অ্যাজাজেল। তারা-প্যাগান বা পৌত্তলিক। ইতিহাসে আছে ডাইনী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে—Witches are rebels against established social creed and custom. আরও বলেছে স্পষ্ট করে They do not accept the christianity. অর্থাৎ ডাইনীরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং তারা কখনো খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকার করে না। প্রতিটি দেশের দূরদূরান্তরে শহরে এবং গ্রামেগঞ্জে ডাইনীদের বীভৎস কার্যকলাপের ভেতরে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরোধীতার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই জন্যেই সপ্তদশ শতাব্দীতে শুধু সুইটজ্যারল্যাণ্ডেই নয় ইউরোপের প্রায় সব দেশেই পুলিশ এদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার ডাইনীকে গ্রেপ্তার করেছিল।

মূর্তি সব-সব মিলিয়ে কেমন গা-ছম ছম করা একটা অস্বস্তি রোজালিণ্ডের মনের ভেতরে একটু একটু করে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু—

সে জানতো না। আরও অনেক বেশি পীড়াদায়ক অস্বস্তি, অনেক বিরক্তি আর লজ্জা তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

এইবার রোজালিণ্ডদের মন্দির থেকে নিয়ে এল আবার সেই হলঘরে! সেই বড় ঘরের একপাশে ছোট ছোট এক একটি সুদৃশ্য কক্ষ। প্রতিটি ঘরের ভিতরে শ্বেতশুভ্র শয্যা শোভা পাচ্ছে! প্রতিটি ঘর গন্ধধূপের মিষ্টি ধোঁয়ায় আমোদিত।

হলঘরের গেটের সম্মুখে বসেছে ঐকতানের আসর। বাঁশী বাজছে। বাঁশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বেজে চলেছে সানাই। সানাইয়ের দূরাগত সেই মিষ্টি সুর যেন আহ্বান জানাচ্ছে লোকান্তপারের অশরীরিদের!

মেয়েদের ভেতরে রোজালিণ্ডকেই আগে ডেকে নিয়ে গেল শয়তান একটি সুরম্য প্রকোষ্ঠে। আর ঘরে পা দিয়েই ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে দিল।

কি করছেন—কি করছেন আপনি? নিদারুণ ভয়ে ককিয়ে চিৎকার করে উঠল অসহায় রোজালিণ্ড। তাকে বুকের ভেতরে সজোরে জাপটে ধরে একতাল ময়দার মত নিপিষ্ট করতে করতে শয়তান ফিস ফিস করে বলল, বাধা দিও না—বাধা দিও না লক্ষীটি—তুমি জানো না—তোমার কত মঙ্গল হবে—কামনার জ্বালায় তার চোখদুটো হিংস্র শ্বাপদের মত দপ দপ করছিল। তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরেই নিয়ে এল শয্যায়। কিন্তু বিছানা থেকে আহত বাঘিনীর মত চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল রোজালিণ্ড—আপনি—আপনাকে আমার সর্বনাশ করতে দেব না, বলেই দরজার দিকে ছুটে যেয়ে খিল খুলতে গেল সে।

এইবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল শয়তান। একটা কবুতরের মত রোজালিণ্ডের গলাটা খিমচে ধরে এক ধাক্কা দিয়ে বিছানায় আছড়ে ফেলল। আর উত্তুঙ্গ বুকে একটা নদী হয়ে মিশে গেল ব্লকুলার অধীশ্বর।

বাইরে সানাইয়ের মৃদু করুণ সুরে শীর্তাত রাত্রিটা মধুর অনুভবের সুখে আবিষ্ট হয়ে গেল।

তীব্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল রোজালিণ্ড। তার কান্না থরো থরো বিহ্বল মূর্তির দিকে তাকিয়ে শয়তান বলেছিল ডাইনী হতে গেলে যৌনজ্ঞানে (Sex knowledge) সমৃদ্ধ হতে হয়—তাই—ডাইনীবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে যৌনকার্যালাপের আছে নিবিড় যোগাযোগ—Witchcraft cuit has got intimate relation with amourous activities—গুপ্তবিদ্যার ইতিহাসেই

এই তথ্যটি লেখা আছে।

আর সুইডিশ রয়্যাল কমিশন রোজালিণ্ডের প্রসঙ্গেই রিপোর্টেও লিখেছেন —He (Devil) had committed venerous acts with them (girls). He had carnel knowledge of them. অর্থাৎ ডাইনী হওয়ার দুর্বাসনা নিয়ে যারা এসেছিল শয়তান তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল। প্রতিটি যৌবনবতী রমনীর নিটোল ও নিরাবরণ দেহের অন্ধিসন্ধি সম্বন্ধে তার (শয়তানের) বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল।

পাবলিক রেজিষ্টারে উল্লিখিত রিপোর্টে আরও আছে রোজালিণ্ডরা জানিয়েছিল—শয়তানের সেই ব্লকুলায় বা প্রমোদ গৃহের প্রাঙ্গণে অনেক ছোট ছেলেমেয়েদের বাগানে খেলা করতে বা ছুটোছুটি করতে দেখা যেত। এরা প্রত্যেকই শয়তানের ঔরসজাত সন্তান!

দুর্ভাগিনী রোজালিণ্ড কমিশনের কাছে তার বিবৃতিতে আরও জানিয়েছিল —শয়তানের প্রমোদ ভবনে তার হয়েছিল আরও অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা— শয়তান তার একটা আঙ্গুল চিরে কিছুটা রক্ত বের করে নিয়েছিল। তারপরেই লাল টকটকে মলাটের একটা লম্বা খাতা বের করেছিল। সেই খাতার ওপরে বড় বড় কালো হরফে লেখা ছিল রেজিষ্টার অফ রিভিলেশানস—

Register of Revelations বা দৈব সত্য প্রকাশের তালিকা সম্বলিত খাতা। রোজালিণ্ডের আঙ্গুলের রক্ত দিয়ে সেই খাতায় নাম লেখা হয়েছিল। অর্থাৎ পাকাপোক্ত ভাবে সেই ডাইনী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিল। আরও জানিয়েছিল রোজালিণ্ড—শয়তান তাদের এমন প্রবীন পুরোহিতদের দিয়ে দীক্ষা দিয়েছিল যাতে তারা খৃষ্টধর্ম বিরোধী অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হয়ে ওঠে।

এখানে বলে রাখা ভাল খৃষ্টধর্ম বিরোধী অনুশাসন বা অনুষ্ঠানকে কমিশনাররা বলেছেন অ্যান্টিক্রায়েস্ট সেক্রামেন্ট!

এইখানে হয়েছিল বিপদ। রোজালিণ্ড কমিশনকে বলেছিল রিভিলেশানের রেজিষ্টারে ঘটা করে নাম লিখলেই তো হয় না। সে গোঁড়া খ্রীষ্টান পরিবারের মেয়ে। আশৈশব সে খৃষ্টধর্মের আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিল।

যখন ডাইনী সম্প্রদায়ের দেবতা অ্যাজাজেলের সামনে তাকে দীক্ষিত করা হচ্ছিল তখুনি তার মনের ভেতরে তীব্র একটা অস্বস্তি ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। সে শয়তানের নির্দেশে সব কাজই করছিল। করতে হচ্ছিল—তাই করছিল। কিন্তু নিবিড় মনযোগে যীশুর নাম জপ করে চলেছিল খুব নিঃশব্দে!

যীশুর এই নাম থেকেই ঘনিয়ে এসেছিল বিপদের কালো মেঘ! শয়তান

রোজালিণ্ডকে বলেছিল এখানকার ব্রকুলায় তোমার সব কাজ এবং ক্রিয়াপ্রকরণ শেষ। এবার তোমাকে যেতে হবে অনেক —অনেক দূরে আমাদের আর এক ক্যাম্পে—একটু থেমেছিল শয়তান। কেমন স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল কয়েকমুহূর্ত। তারপর আরও কাছে এসে অন্তরঙ্গ হয়ে ফিস ফিস করে বলেছিল, তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছে করছে না—কী করবো বড় শয়তানের হুকুম—তারপরেই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে আবার বলল, সেখানে তোমাকে শিখতে হবে ডাইনীবিদ্যার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াপ্রকরণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই বিদ্যার প্রয়োগ—

রোজালিণ্ড পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি কিছু বলবে? সস্নেহে প্রশ্ন করল শয়তান।

রোজালিণ্ড নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো।

তোমাকে পাঠানো হচ্ছে বহু—বহু দূরে। শয়তান আবার হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল সারা রাতের পথ। খুব সাবধানে যাবে—কখনো অ্যাজাজেল ছাড়া অন্য কোন দেবতার চিন্তা করবে না—

রাত্রির মধ্যযাম অতিক্রান্ত হলো।

রোজালিণ্ডের জন্য চারজন মানুষ বাহক এল। প্রত্যেকটা লোক লিকলিকে বাঁশের মত লম্বা রোগা আর সিড়িঙ্গে চেহারা। হয়তো ক্রীতদাস। তাদের কাঁধে কাঠের তৈরি একটা মাচা। তার চারিদিকে খুব অল্প উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা —যাতে সওয়ারী মাটিতে না পড়ে যায়। তারপর—

তারপরের ঘটনা রোজালিণ্ডের জবানীতেই শুনুন—ওরা আমাকে সেই অভিনব পালকিতে উঠতে বলল ইসারা করে! হয়তো বোবা—কে জানে।

আমি উঠে বসামাত্র বিদ্যুতগতিতে ছুটতে লাগল সেই চৌদোলা। কোন মানুষের পক্ষে কি এত জোরে চলা সম্ভব! কারা এরা? মানুষ না দৈত্য। কোন মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবেই ওরা অমন করে ছুটছে না তো?

রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে ওরা ঝড়ের গতিতে ছুটে চলছে। আমার মনে হলো আমি যেন কোন অন্ধকার আর রহস্যময় আর সুদূর কোন অজানা জগতে চলেছি।

আমি দুই হাতে শক্ত করে দুইদিকের রেলিং ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে আছি। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশে জ্বলছে রাশি রাশি তারা। তার ভেতরেই কোনটা ক্যাসিওপিয়া, কোনটা সপ্তর্ষি আবার কোনটা বা ধ্রুবতারা—মনে পড়ল, বাবা ছোটবেলায় আকাশের নক্ষত্র চেনাতেন।

আর বলতেন মানবপুত্র করুণাময় যীশুও দূর আকাশে কালপুরুষ কি ধ্রুবতারার মতন নক্ষত্র হয়ে জ্বলছে। পৃথিবীর দিকভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখাচ্ছেন। আরও কত সুন্দর সুন্দর কথাই যে বাবা বলতেন

দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ যীশুর কথা মনে হতেই তার বুকের ভেতরে অদৃশ্য সেতারের রাগিনীর মত বেজে উঠল মানবপুত্রের নাম। কিন্তু সাবধান। মনের ভেতরে যত খুশি বেজে যাক—উচ্চারিত যেন না হয় তাঁর সেই নাম।

তাহলেই না কি ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে আসবে—কি সেই বিপদ—

এবারে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চলতে লাগল চৌদোলা। দুইপাশে গভীর খাদের ঘনকালো অন্ধকারে অনিবার্য মৃত্যুর হাতছানি।

যেতে যেতে আমার সামনের দিকের বাহকরা বোধহয় পাথরে ঠোক্কর খেল। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে খানিকটা উঁচুতে উঠে গেল পালকি। আমার মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে গেল—ও ক্রায়েস্ট !

সঙ্গে সঙ্গে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল। আমার বাহকরা একসঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে বলল—বিধর্মী ! !—শত্রু ! !

আর সঙ্গে সঙ্গে পালকি শুদ্ধো আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল অন্ধকার খাদে !

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

খাদ খুব গভীর ছিল না। খাদে ছিল সামান্য জল আর কাদা। তাই আঘাত বেশি লাগে নি। তবুও ভয়েই আমি জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম।

পরদিন জ্ঞান হতেই দেখলাম, সোনার মত নরম রোদে ভরে গিয়েছে পৃথিবী। আর সবচেয়ে সৌভাগ্য পাহাড়ের সেই খাদ ছিল আমার বাড়ির খুব কাছে। অনেক অভিজ্ঞতা আর অশুচি দেহে তীব্র গ্লানির অপচ্ছায়া বহন করে মাথা নীচু করে বাড়ি ফিরে এলাম—

এইরকম আরও ছত্রিশজন মহিলার জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছিল সুইডেনের পাবলিক রেজিষ্টারে। আর এরা ডাইনী হওয়ার অসাধু উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, সেই অপরাধে এদের প্রত্যেককে সপ্তাহে একবার করে একবছর ধরে চাবুক মারা হয়েছিল।

এবার একটি এগারো বছরের মেয়েকে গ্রেপ্তার করলেন কমিশনের সভ্যরা। মেয়েটি সুন্দরী। আর বয়সের তুলনায় রীতিমত বুদ্ধিমতী। কথাবার্তাতেও বেশ বাঁধুনি আছে। সে আস্তে আস্তে বলল, শয়তানের সেই আস্তানায় কত

কি যে দেখলাম—থেমে গেল সে। হয়তো ভাবতে শুরু করল, কোথা থেকে শুরু করবে—কি বলবে।

কি হলো, থেমে গেলে কেন, কমিশনের এক সভ্য সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি যেমন দেখেছো তেমনি বলে যাও—কোন লজ্জা করো না—

প্রথমেই বলি আমার বাহকের কথা, হাসতে হাসতে বলল, কিশোরী মেয়েটি সেখানে যাওয়ার পরেই শয়তান দিয়েছিল আমাকে দুটো বাহক—দুটো জন্তু!

—তাই নাকি! কি রকম দেখতে?

একটা দেখতে ঠিক বিড়ালের মত। কিন্তু বিড়ালের চেয়ে অনেক—অনেক বড়োসড়ো। আর একটা পাখি—বাজপাখির চেয়ে অনেক বড়, একটু থেমে আবার বলল, এই দুটো প্রাণীকে আমরা যেখানে খুশি পাঠাতে পারতাম। আমরা যখন যেখানে যেতাম—সেইখানে ওরাই আমাদের জিনিসপত্র বহন করে নিয়ে যেত—

কি এমন জিনিস ছিল তোমাদের—যেগুলো বহন করতে দুটো জন্তুর প্রয়োজন হতো?

ওমা! আমাদের বিছানাপাটি, মগ, থালাবাটি আর আমাদের 'রেশন'—রুটি, মাখন, পনীর, দুধ আর শূকরের লবনাক্ত মাংস তো ওরাই বয়ে নিয়ে আসতো—হঠাৎ থেমে গেল সে। কমিশনের সভ্যদের খুব কাছে গিয়ে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল, কিন্তু মনে রাখতে হবে-শয়তান কিন্তু সব খাবারই আমাদের দিত না। বিড়াল যেসব খাদ্য বয়ে নিয়ে আসতো সেগুলো শয়তান নিয়ে নিত। আর পাখিটা যা নিয়ে আসতো শুধু সেগুলোই তারা পেত—

বা! বেশ ব্যবস্থা তো! কমিশনের সভ্যরা হেসে উঠলেন। তারা হেসে হেসে বললেন, এবার শয়তানের ডেরায় তো তিনমাস কাটিয়ে এলে—কিছু ভেলকী টেলকি উই-মিন-কোন অলৌকিক ক্ষমতা দেখাও—

ওমা, না—না, দুহাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি। বলল শয়তানের ডেরায় থাকতে থাকতে একদিন আমার বন্ধুকে বলেছিলাম, বাড়িতে ফিরে গিয়ে লোককে যাদু দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেব। সেইদিনই রাত্রে ঘটে গেল অদ্ভুত একটা কাণ্ড—

কি-কি-হয়েছিল? কমিশনের সভ্যরা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

নাবালিকা মেয়েটি কখনো উত্তেজিত, কখনো ভীত হয়ে যা বলেছিল তার ভেতরে ছিল অনেক অসংলগ্নতা। এখানে বলা হলো সংক্ষেপে তার বক্তব্য—

যেদিন বন্ধুর সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিল

সেদিনই নিশি রাতে স্বপ্নের ভেতরে এসে উপস্থিত হলো ডেভিল বা শয়তান। তার দুই হাতে পায়ে ধারালো থাবা, মাথায় শিং, পিছনে লম্বা লেজ। হাতে একটি উত্তপ্ত লাল গনগনে লোহার শিক। সেই শিক বিঁধিয়ে রেখেছে একটি জওয়ান লোকের পিঠে!

শয়তান যেখানে এসে দাঁড়ালো সেখানে বিশাল এক গহ্বরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই লেলিহান আগুনের দিকে ইঙ্গিত করে শয়তান বলল, শোন—কাউকে যদি কখনো যাদুবিদ্যা দেখাবি—কি—তুই যে ডাইনী, এই কনফেশান বা স্বীকারোক্তি করবি তাহলে দেখছিস এই লোকটাকে যেমন আগুনের চুল্লিতে দিচ্ছি—তেমনি তোদের প্রত্যেককে দেব—জীবন্ত পুড়িয়ে মারব—হা, হা, হা—বিকট অট্টহাসির রেশ টেনে ঘেঙিয়ে বলল, আমার শেখানো বিদ্যা তোমাদের বাইরের কাউকে দেখাতে দেব না—হা, হা, হা—

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল মেয়েটি। মাথা নীচু করে অস্ফুটস্বরে বলেছিল আর আমি যখুনি আপনাদের কাছে স্বীকারোক্তি করছি তখুনি আমার ডাইনীবিদ্যার সব ক্ষমতা চলে গিয়েছে—All my Witchcraft gone—

তারপরে মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে কমিশনাররা জানতে পেরেছিলেন, এক বুড়ি ডাইনী না কি ব্লকুলার শয়তানকে বলেছিল—সে বড় শয়তান বা গ্রেট ডেভিলকে দেখেছে। দেখতে ড্র্যাগনের মত। তার চারদিকে আগুন জ্বলছে—Fire around him। সে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা।

ছোট শয়তান অর্থাৎ ব্লকুলার অধীশ্বর না কি সেই বুড়িকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, তারা যদি কখনো কমিশনারদের কাছে কোন স্বীকারোক্তি করে তাহলে বড় শয়তানকে ছেড়ে দেবে। তাহলে গোটা সুইডেনে মহাপ্রলয় নেমে আসবে—

শেষে মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলেছিল, জানেন স্যার, শয়তানের ব্লকুলার ভেতরে ঠিক আমাদের মোহারা গ্রামের মত একটা চার্চও ছিল। আমি বলেছিলাম শয়তানকে—থামল মেয়েটি।

কি বলেছিলে?

বলেছিলাম আপনাদের কথা। বলেছিলাম, আমাদের গাঁয়ের গীর্জাতে কমিশনাররা এসে গিয়েছেন। ডাইনীদের তদন্ত হচ্ছে—আপনাদের শাস্তি দেবে—

শাস্তি! আমাকে? হা-হা-হা—হো হো করে হেসে বলল শয়তান। আমাকে শাস্তি দেবে এমন লোক এখনও জন্মায় নি। আমিই তোদের

কমিশনারদের একে একে গলা টিপে হত্যা করবো—শুনে রাখ—ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে খুন করতে চেষ্টা করেছি—পারিনি—

এইবার স্থইডেনের রয়্যাল কমিশনের এজলাসে ডাক পড়ল নাটাশার। মাঝবয়সী মহিলা। অটুট স্বাস্থ্যে এখনও উদ্দাম যৌবন যেন বেলাশেষের স্থর্যের মত ঝিকমিক করছে। কিন্তু গোলগাল পুরন্ত মুখখানা কেমন ম্লান ও বিষণ্ন। বড় বড় দুটো চোখের কালো তারায় তারায় কে জানে—কিসের গভীর ব্যথা টলমল করছে।

তার তদন্ত শেষ করে বিচারকরা (কমিশনাররা) রায় দিলেন—আসামী যে কারণে ডাইনীবিদ্যার দিকে ঝুঁকেছিল সেই কারণটি অত্যন্ত মানবিক। তাই অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে তাকে দেওয়া হলো—লঘু শাস্তি—গীর্জার সামনের প্রাঙ্গণে পর পর তিন রবিবার তাকে চাবুক মারা হবে—

কি! সেই বেদনা ভরা বিষণ্ন চোখ দুটো-ই ধক্ করে জলে উঠল। আমার কী দোষ হুজুর তীক্ষ্ণ করুণ কণ্ঠে বলল নাটাশা, আমি দুর্ভাগিনী বলেই তো ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমি কি করে জানবো—ওরা এসব করে—

বড় করুণ নাটাশার ইতিবৃত্ত।

নাটাশা জমিদারের একমাত্র মেয়ে। সচ্ছল অবস্থাপন্ন পরিবেশে আবাল্য লালিত হয়েছে। তার যখন বাইশ বছর বয়স তখন হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার বাবা মারা গেলেন। নাটাশা হয়ে গেল বিশাল সম্পত্তির মালিক। কিন্তু হলে কি হবে?

সে ছিল দুর্ভাগিনী।

কে জানে কিসের অভিশাপে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তার জীবন!

বিপুল ঐশ্বর্যের অধিশ্বরী নাটাশা। সুন্দরী যুবতী। তাই মধুলোভী মৌমাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেরা তার চারিদিকে গুঞ্জন করতে লাগল।

স্বয়ম্বরার মত নাটাশা অনেক ভেবেচিন্তে পছন্দ করল একজনকে। টিম্বার মার্চেন্ট। সুদর্শন যুবক। তাদের দাম্পত্যজীবনের দিনগুলি উচ্ছল খুশির হাওয়ায় শরতের মেঘের মত উড়ে চলে যেতে লাগল।

একমাস পর।

দক্ষিণ স্থইটজারল্যাণ্ডের রিজার্ভ ফরেস্টে কাঠ কাটার কন্ট্রাক্ট এল। সে দলবল নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া হলো। খবর

এল, নিউমোনিয়ায় হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে সে।

নিঃসঙ্গজীবন। দুর্বহ।

আর তাছাড়া এতবড় প্রপার্টি দেখা শোনা করবে কে? তাই আবার বিয়ে করল নাটাশা। ভদ্রলোক শিল্পী। অভিনেতা। ভ্রাম্যমান থিয়েটারের দল নিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। নাটাশা তার অভিনেতা স্বামীর প্রেমে বিভোর হয়ে রইল কিছুদিন। আর তার পৃথিবী যেন কোন যাদু মন্ত্রে মায়াপুরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কিন্তু—

হলে কি হবে? নাটাশার কপালে সুখ ছিল না। থিয়েটারের দল নিয়ে ফিরছিলেন ভদ্রলোক। ষ্টকহলমের চল্লিশ মাইল দূরে গাড়ির এক ভয়াবহ অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেলেন তিনি।

শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল নাটাশা।

জানালা দরজায়, বাড়ির গেটে কালো কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে নিজেও কালো পোশাক পরে বসে রইল কয়েক সপ্তাহ।

ঠিক করল, আর বিয়ে করবে না।

কিন্তু শুনছে কে? আবার বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল। বিয়েও হলো। কিন্তু যথারীতি ছয়মাস যেতে না যেতে দুর্ভাগিনী নাটাশার তৃতীয় স্বামীও হার্টফেল করে মারা গেল।

নাটাশা ডাইনী!

জনরব উঠল গ্রামে। লোকের মুখে মুখে শুরু হলো গুঞ্জন—নাটাশা তুকতাক জানে। গুণমন্ত্র করেই এক একটা তরতাজা জওয়ান ছেলেকে কাঁচা খাচ্ছে।

নাটাশা ভয় পেল।

তার সম্বন্ধে এই নিদারুণ অপবাদ শুনে ভয়ে দুঃখে আর অনুশোচনায় সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

তুই ডাইনীদের সঙ্গে যোগাযোগ কর, প্রতিবেশী এক বর্ষীয়ান মহিলা নাটাশাকে পরামর্শ দিয়ে বলল, ওরা তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র জানে—শুনেছি মরা মানুষও বাঁচাতে পারে—

কোন কথা বলল না নাটাশা।

কিন্তু প্রস্তাবটা মনে ধরল।

একদিন গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে শয়তানের ডেরায় গেল।

আমি হুজুর সেই রহস্যময় ডেভিলের বাগানবাড়ির কি হায়েনার পিঠে,

সওয়ার হয়ে যাওয়ার বিবরণ দেব না। থেমে থেমে ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে শুরু করল, নাটাশা-এসব আপনারা ঢের শুনেছেন—থেমে গেল নাটাশা।

কয়েকমুহূর্ত পর আবার অস্ফুটস্বরে বলল, আমি গিয়েছিলাম—আমার নিজের জ্বালায়—আমার কথাই বলি, কমিশনারদের সেই নিস্তব্ধ সভাকক্ষে তার কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনালো।

লম্বা কালো আলখাল্লাপরা দড়ির মত পাকানো চেহারার একটা লোক (যাকে এরা শয়তান বলে) যখন আমাকে দীক্ষা দিতে এল, মাথা নীচু করে বলতে লাগল নাটাশা, আমি তাঁকে বললাম আমার দুর্ভাগ্যের কথা। তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে অনুনয় করে বললাম, এমন কোন বনৌষধি কি এমন মন্ত্র দিতে পারেন না যাতে আবার বিয়ে করলে আমার স্বামী অকালে না মারা যায়!

কোন কথাই বলল না লোকটা! কেমন অদ্ভুত দৃষ্টি আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগল। ঘসঘসে গলায় বলল, সব ব্যবস্থাই আছে আমার—কিন্তু দীক্ষা না নিলে তো এসব গুহ্যতত্ত্ব আমরা কখনও কাউকে বলি না—

ব্যবস্থা আছে! আনন্দে উত্তেজনায় আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। বললাম বেশ—নেব দীক্ষা—আপনি যা বলবেন করবো—

আপাতত আর কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু মিডিয়ার সঙ্গে মাঝরাত্রে এক জায়গায় যাবে, বলেই ডাইনীদের সেই পাণ্ডা কে জানে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কে মিডিয়া—কোথায় যাবো মধ্যরাত্রে, কিছুই বুঝতে পারলাম না, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপরে রহস্যময়ী মিডিয়ার সান্নিধ্যে নাটাশা তার বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছিল কখনো থেমে থেমে, কখনো তীব্র উত্তেজনায় আর আবেগে প্রায় অসংযত হয়ে। এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হলো তার সেই দীর্ঘ বক্তব্য :—

নাটাশা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল মিডিয়া এক ইহুদী যুবতী। ডাইনী এবং যাদুকরী। সে না কি দারুণ শক্তিশালী ওঝা। মরা মানুষকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিতে পারে।

নাটাশার বুকের ভেতরটা উল্লাসে গুরগুর করে উঠল। ঠিক জায়গায় এসেছে। এইবার এদের কাছ থেকে সঞ্জীবনী বনৌষধি নিয়ে যেয়ে তার ভাবী স্বামীকে খাইয়ে তার আয়ুকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করবে। আর পাঁচ দশটা মেয়ের মত সুখে ঘর সংসার করবে!

রাত এল। প্রহরে প্রহরে গভীরও হলো।

মিডিয়া এল। সঙ্গে তার সহকারী। তার বয়সী এক তরুণী! অসামান্য সুন্দরী মিডিয়া। কিন্তু তীব্র আর কেমন রুক্ষ সেই প্রখর সৌন্দর্য। চোখের কোলে কোলে গভীর কালির দাগ। তীব্র নেশাগ্রস্ত মানুষের মত চোখ দুটো কেমন ঢুলু ঢুলু। হাতে যাদুদণ্ড।

চলো আমার সঙ্গে, নাটাশার মুখের দিকে তাকিয়েই বলল মিডিয়া। বলেই ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল।

নাটাশা লক্ষ্য করল, মিডিয়া এবং তার সহকারীর পা দুটো খালি। চুল এল করে খোলা। কোথায় যাচ্ছে এরা—কোথায় যেতে পারে। কৌতূহলে পুড়ে যেতে লাগল তার বুকের ভেতরটা মনে হলো—হয়তো দূরের ওই পাহাড়ে যাচ্ছে তার জন্যই বনৌষধি সংগ্রহ করতে সে জোরে—আরও জোরে হাঁটতে শুরু করল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক থৈ থৈ করছে। মাঠের ভেতর দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলেছে তিনজন। তিনজনেরই তিনটি সচল ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে তাদের অনুসরণ করে চলেছে।

তারা এল এক সমাধিভূমিতে।

নাটাশা জিজ্ঞাসা করে জানল, এটা এসকুইয়িসিনের সমাধিভূমি। তারা চারিদিকে তাকিয়ে খুব সন্তর্পণে চুরি করে কবরখানায় প্রবেশ করল। কাছে দূরে যতদূর চোখ যায়, জ্যোৎস্নায় প্রতিটি কবরের সাদা ধবধবে সমাধিফলকগুলোকে মনে হয় যেন হাজারো প্রেতের একটা নিঃশব্দ শোভাযাত্রা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

এইখানেই আমার ওষুধ পাওয়া যাবে? ব্যাকুল হয়ে বলল নাটাশা, এমন বনৌষধি দেবেন—

আঃ চুপ করো, বলেছি তো দেব, চাপা গলায় গর্জন করে উঠল মিডিয়া। আবছা অন্ধকারে তার চোখ দুটো হিংস্র বাঘিনীর সবুজ চোখের মত জ্বলতে লাগল। বলল—

এখানকার ক্রিয়ানুষ্ঠানটা আগে করতে দাও—

আর একটা কথাও বলল না নাটাশা।

পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। মিডিয়া আর তার সহকারী মেয়েটি বিশাল সমাধিভূমির উদ্যানের এদিকে ওদিকে ব্যাকুল হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

নাটাশার মনে হলো, মৃত্যুঞ্জয়ী বনৌষধির মালমশলা খুঁজছে ওরা। এসব

ওষুধ তৈরি তো সোজা কথা নয়।

কিছুক্ষণ পর ওরা কিছু গাছগাছড়া এবং মানুষের চার পাঁচটা হাড় নিয়ে ফিরে এল সেসব নাটাশাকে দিয়ে বলল মিডিয়া—তোমার কাছে রেখে দাও—ফিরে গিয়ে ওষুধ তৈরি করে দেব—

এইবার মিডিয়া মাটিতে এক জায়গায় বসে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করল। আর তার সহকারী মেয়েটি সেইখানেই মাটিতে গর্ত খুঁড়তে লাগল। শেষ হলো মিডিয়ার মন্ত্র পড়া। বেশ বড় রকমের গর্ত খোঁড়ার পর সেই মেয়েটিও দাঁড়ালো।

মিডিয়া সেই গর্তের কালো গহ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ হয়েছে। ঠিক আছে। ওতেই হয়ে যাবে—

এবার তার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মহিলাটি ঘন অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে এল কোলে একটা ভেড়া নিয়ে। বড় নৃশংসভাবে তারা ভেড়াটাকে জবাই করল। সেই অসহায় পশুর আর্তচিৎকারে সমাধিভূমির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

তারা দ্রুত হাতে ভেড়ার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তার ধড়টাকে সেই গর্তের ভেতরে পুঁতে রাখল। পরলোকের বিদেহী আত্মাদের উদ্দেশ্যে নৈবদ্য।

এই হাড়গুলো আর গাছগাছড়া দিয়ে কি তোমরা ওষুধ তৈরি করে দেবে? ভয়ে ভয়ে বলল নাটাশা। তার কথার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করল না মিডিয়া। কিন্তু—

কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালো নাটাশার দিকে। আর তার মুখের রেখায় রেখায় কেমন একটা ধারালো হাসি মুহূর্তের জন্য ঝিকিয়ে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। মিডিয়া হাসল কেন? সে যাদুকরী। কে জানে বাবা, কার সঙ্গে কী ইন্দ্রজাল করছে আবার মনে হলো, মিডিয়া যেসব ক্রিয়াপ্রকরণ করছে এসব এসবই বুজরুগী নয় তো? শেষের এই কথাটা মনে হতেই তার বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে উঠল।

ওরা দুইজন।

যাদুকরী মিডিয়া আর তার সহকারী তাদের ঝুলি থেকে বের করল দুইটি মূর্তি। একটা বেশ বড়সড় আর এক মাথা কোঁকড়ানো চুল (ডাইনীর প্রতীক) আর একটি মোমের তৈরি যে শত্রুর ক্ষতি করতে হবে তার প্রতিমূর্তি। এই দুটো মূর্তি সামনে বসিয়ে রেখে অনেকক্ষণ একটানা মন্ত্র বলে চলে মিডিয়া।

রাত গভীর হয়।

চাঁদ ধীরে ধীরে পাণ্ডুর হয়ে অস্ত যায় পশ্চিমের আকাশে। অস্তমান চাঁদের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ে সমাধিভূমিতে। বিষাক্ত রক্তচোষা গিরগিটি আর গোক্ষুর সাপ এঁকেবেঁকে চলে যায় সেই গর্তের ওপর দিয়ে!

মিডিয়া সেখানে সেই গর্তের পাশে নেকড়ে বাঘের নাক ও মুখ এবং সাপের দাঁত পুঁতে রাখল। আর তারপরেই পরম উল্লাসে মোমের তৈরি সেই শত্রুর এবং মাটির তৈরি সেই ডাইনীর মূর্তি মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফেলে চলতে শুরু করল মিডিয়া।

আমার ওষুধ? অস্ফুট আর্তনাদ করে বলল নাটাশা।

রকুলায় চলো—দিচ্ছি—

মিডিয়া কি নাটাশাকে সত্যিই কোন সঞ্জীবনী মহৌষধি দিতে পেরেছিল? আর তাতে কি কোন উপকার হয়েছিল সেই দুর্ভাগিনীর!

দিয়েছিল। কিন্তু সে ওষুধ না দিলেই বোধহয় ভালো হতো।

শয়তানের ডেরায় ফিরে আসার পর মিডিয়া তাকে দিয়েছিল একটা হলদে মত শিকড়। বলেছিল শিকড়টাই মন্ত্রপূত। বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে—

আর দিয়েছিল কিছু সাদা সাদা গুঁড়ো ওষুধ। নির্দেশ দিয়ে বলেছিল শিকড় বাটা খাওয়ার তিনঘণ্টা পরে খেতে হবে সাদা গুঁড়োর ওষুধ।

নাটাশা যেন হাতে স্বর্গ পেল। ভাবী স্বামীর অক্ষয় রক্ষাকবচ তার কাছে। তার বুকের ভেতরে যেন রেলগাড়ির চাকা চলতে লাগল গুরগুর ধ্বনি তুলে। আর সেই অকাল মৃত্যু ছিনিয়ে নেবে না—নিতে পারবে না তার স্বামীকে!

যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে পরীর মত উড়ে এল নাটাশা তার বাড়িতে। বিশাল বাড়ির নির্জনতা যেন গিলে খেতে আসছে। এখানে সেখানে মাকড়সার ঝুল আর চামচিকের আস্তানা এবং আবর্জনা ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে গোটা বাড়ি রঙ করল নাটাশা। আর দুদিন পরেই আলোর মালা পরে রূপসী হয়ে গেল সেই বাড়ি।

উৎসবের বাড়ি!

খুব ধুমধাম করে বিয়ে করল নাটাশা।

বিয়ের তিনদিন পর থেকেই শুরু হয়ে গেল তার মনের ভেতরে যুদ্ধ—মিডিয়া যে যাদুকরী, তার প্রমাণ কি—কেন দেবে তার ওষুধ স্বামীকে। যদি

মারাত্মক কোন ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু মন্ত্রপূত ওষুধ তো অনেক সময় ইন্দ্রজালের মত কাজ করে। ব্লকুলার অনেকেই তো বলছিল মিডিয়া পিশাচসিদ্ধ যাদুকরা। তাদের অগাধ শ্রদ্ধা। কি হবে সেই খাইয়ে—

শিকড়ের ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটাশার স্বামী রক্তবমি করতে শুরু করল। তার মনে হলো, সাদা গুঁড়ো ওষুধ খাওয়ালে বুঝি যন্ত্রণার উপশম হবে। সেই ওষুধ খাওয়ানোর পর রক্তবমি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পেটের অসহ্য ব্যথায় আর্তনাদ করতে লাগল। সারারাত কাটা পাঁঠার মত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শেষ রাত্রে হার্টফেল করে মারা গেল সে। এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল নাটাশা।

তীব্র আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল কমিশনারদের, স্যার শুনে রাখুন সমস্ত বুজরুকি—সব মিথ্যা —সব ফাঁকি। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ঝেঁকে ঝেঁকে বলতে লাগল সে। শুধু মিডিয়া নয়—শয়তান নয়, ডাইনীবিদ্যা জিনিসটাই একটা ভাঁওতাবাজী—শুনে রাখুন স্যার—আমি জানি—আমি দেখেছি। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল নাটাশা।

কিন্তু শয়তান কে, কি তার স্বরূপ—হায়েনার পিঠে সওয়ারী হয়ে যাওয়ার ভেতরেই বা কি রহস্য আছে এবং যারা ডাইনী হয় তারা কোন শ্রেণীর মানুষ এসব সম্বন্ধেও নাটাশা অনেক কথাই বলেছিল। কিন্তু বলেছিল অত্যন্ত উত্তেজিত আর অসংলগ্নভাবে।

মোহারা গ্রামে সুইডেনের রয়্যাল কমিশনের ডাইনী তদন্ত বা উইচক্র্যাফট ইনভেস্টিগেশন এইখানেই শেষ হলো। প্রায় চৌরাশিজন মহিলা এবং ছত্রিশজন শিশু ও বৃদ্ধকে জেরা করা হয়েছিল। রেকর্ড করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের জবানবন্দী। তাদের বিবৃতির ওপর ভিত্তি করেই কমিশনাররা লিখেছিলেন প্রায় আশীপাতার একটি মন্তব্য—সুইডেনের সপ্তদশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের এক গভীর কলঙ্কময় অধ্যায়ের দলিল। এখানে সংক্ষেপে বলা হলো বিচারকদের বক্তব্য—

ডোরা রোজালিণ্ড, নাটাশা প্রভৃতি আরও অনেক মহিলাদের বিবৃতি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে শয়তান বা ডেভিল রূপকথার কোন দৈত্য নয়। নেহাতই রক্ত মাংসের মানুষ!

ব্ল্যাকআর্ট বা ডাইনীবিদ্যার অনুশীলনের নামে মেয়েদের সতীত্বনাশ

জনহত্যা ইত্যাদি জঘন্য সমাজবিরোধী কাজের প্রধান পাণ্ডা। বলাবাহুল্য এই লোকটি খৃষ্টধর্মের কট্টরবিরোধী। তার শত শত অনুগামীরাও শুধু যে খৃষ্টধর্মেরই প্রবল বিরোধীতা করে তা নয় তারা প্রত্যেকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিদ্রোহী।

দ্বিতীয়ত হায়েনার পিঠে চড়ে ডাইনীদের নৈশভ্রমণ একেবারে অবাস্তব এবং মিথ্যা। খুব তীব্র ও উত্তেজক কোন ওষুধ খাওয়ার পরে নেশাগ্রস্ত ডাইনীরা স্বপ্ন দেখত হায়নার পিঠে সওয়ার হয়ে চলছে দূরদূরান্তরে এটা নিছক ফ্যানটাসি (Fantasy) এবং স্বপ্ন (Dream)।

পরিশেষে বলতেই হয় দলে দলে মেয়েদের এই বিপদসঙ্কুল অজানা পথে পা বাড়ানো এবং শয়তানের সান্নিধ্যে আসার একমাত্র কারণ—যৌনপরিতৃপ্তির ঢালাও ব্যবস্থা আছে ডাইনীবিদ্যার অনুশীলনে।

দেশের দূরদূরান্তরে ছড়ানো শয়তানের আস্তানায় রেড করে ডাইনীদের গ্রেপ্তার করে এই দুষ্ট পাপচক্র বন্ধ করা উচিত।

আঠারো

একটি নীল প্রজাপতি কী দারুণ বিপর্যয় এনেছিল এক কৃষি খামারে। কোন ডাইনীই কি প্রজাপতির রূপ ধরে এসেছিল? সত্যিই কি ডাইনীদের দুটো আত্মা থাকে?

একটা প্রজাপতি উড়ছিল।

উড়ছিল ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে। ঘন সবুজের ছবির মত বিস্তীর্ণ গমের ক্ষেত ছাড়িয়ে কলঘরের (গম পেষাইয়ের কল) ওপর দিয়ে আলুর জমির পাশ কাটিয়ে উড়ছিল সে। তার ডানাদুটোতে স্বপ্নের মত ঘোর লাগা নীল রঙ।

সকালের সোনা ঝরানো রোদ তার সেই নীলাভ ডানায় ঠিকরে পড়ছিল। মাথার ওপরে বিপুলব্যাপ্ত ঘন নীল আকাশ, চারিদিকে আবির রাঙা রোদের পটভূমিতে সেই নীলবর্ণ প্রজাপতিকে মনে হচ্ছিল যেন নীল আকাশেরই একটা টুকরো ছিটকে নেমে এসেছে পৃথিবীতে।

বেলা বাড়ে।

কিন্তু তার ওড়া শেষ হয় না। ক্লান্তিহীন নিরবিচ্ছিন্ন আর নিরন্তন সেই ওড়া।

বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে গমের নধর পুষ্ট এক একটা সবুজ শীষ। আলুর ছোট ছোট গাছগুলোও বাতাসে ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। আশ্চর্য! গমের শীষের ভেতরে উদ্গত দানার মধু খেতে এক মুহূর্তের জন্যেও বসছে না সেই রহস্যময় প্রজাপতি। বসছে না কোথাও। আলুর গাছের ডালে ডালে ঝিরিঝিরি পাতায় কত পোকা ঘুরছে। কে না জানে, এইসব ছোট ছোট পোকামাকড় কীটপতঙ্গের উপাদেয় খাদ্যসম্ভার। কিন্তু—

তাদের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করছে না সেই নীল প্রজাপতি। যেন মনে হয় বহু—বহু দূরের কোন অজানা লোক থেকে সে এসেছে মানুষের চলমান জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনাকে প্রত্যক্ষ করতে! কিন্তু—

শুধু কি তাই!

গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় খামারে। কি উদ্দেশ্যে প্রজাপতিটা শুধু উড়েই চলেছে! এ কেমন পতঙ্গ? কোথাও মুহূর্তের জন্যও স্থিতি হয়ে বসে না। কিছু খায় না।

যেন মনে হয়—শুধু ওড়ার জন্যই তার জন্ম হয়েছে!

বেলা পড়ে এল।

শেষ সূর্যাস্তের রক্তরঙে সেই প্রজাপতির নীল ডানাদুটো বেগুনীবর্ণ ধারণ করল। কেন যেন ধীরে ধীরে তার ওড়ার গতি কমে এল। ক্লান্ত ডানাদুটো আর যেন বাতাসের সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারছে না!

দেখতে দেখতে আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে এল চারিদিকের দিগন্ত। বহু—বহু দূরের সেই আবছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন কোন দূর চক্রবালে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই নীলবর্ণ প্রজাপতি।

আবার পুবের আকাশে ভোরের রেখা জেগে ওঠে। খামারবাড়িতে শুরু হয়ে যায় দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ। তারা কেউ কাজ করে গমের ক্ষেতে, কেউ বা আলুর জমিতে নিড়ানি দেয়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি থেকে থেকেই আছড়ে পড়ছে নীল আকাশের দিকে। কখন—কখন আসবে সেই প্রজাপতি? তীব্র উদ্বেগে ভেঙ্গে পড়ে তাদের বুক!

আকাশে রঙের সমুদ্রে ডুব দিয়ে সূর্য ওঠে।

রাঙ্গা আলোর রেখা বাঁকা হয়ে পড়ে দিগন্তপ্রসারী সবুজ গমের ক্ষেতে। আর ঠিক তখুনি দেখা যায় নীলডানায় সকালের নরম মিষ্টি রোদের গন্ধ বহন করে এসে পড়েছে সেই প্রজাপতি।

চঞ্চল হয়ে ওঠে খামারের কৃষকরা।

তারা চোখদুটো কুঞ্চিত করে তাকিয়ে থাকে সেই উড়ন্ত পতঙ্গের দিকে। গতকালের মত আজও সে চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে উড়তে লাগল গমের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কখনো বা আলুর জমিতে, আবার কখনো মেশিন ঘরের চালের ওপরে।

আমার মনে হয় কোন অশুভ ইঙ্গিত, কলঘরের হাস্কিং মেশিন অপারেটার জেমস প্রজাপতির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, অনেক সময় এইসব পতঙ্গ ভয়ানক কোন অমঙ্গলের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসে—

যাঃ কী বলছেন আপনি, ছোকরা স্টোরকীপার ম্যাকলিন হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, যতসব কুসংস্কার আই মীন সুপারিস্টেশান—একটু থেমে আবার সে বলল, এমনি কোন প্রজাপতি আসতে পারে না?

কোন কথা বলে না জেমস।

তার রেখাজটিল মুখে কোন দুশ্চিন্তার ছায়া থমথম করে।

খুব আস্তে আস্তে বলে, তোমরা ছেলেমানুষ—কী আর বলবো তোমাদের,

বলেই থেমে গিয়েছিল সে। আর তারপরেই সে কোন কোন জন্তুজানোয়ার যে সর্বনাশা কোন বিপদের সূচনা করে থাকে—সে সম্বন্ধে বলেছিল একটি সত্য ঘটনা—

১১ই এপ্রিল, ১৬৪৫, এই দিনে একটি গ্রামে দেখা গেল রাস্তায় আনাগোনা করছে একটি কুকুর। সাদা ধবধবে তার গায়ের রঙ। যেন মনে হয় টুকরো টুকরো বরফ দিয়ে গড়া হয়েছে বিচিত্র কুকুরটির দেহ।

সেই অদ্ভুত আগন্তুক কুকুরটিকে দেখে, বলাবাহুল্য গ্রামের কুকুররা দল বেধে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল। কিন্তু—

অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। হিংস্র আক্রোশে ফুঁসে উঠল সেই শ্বেতশুভ্র সারমেয়। কুতকুতে দুটো চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। আর—

ঠায় দাঁড়িয়ে গেল গ্রামের কুকুরের দল। তাদের কারো মুখে কোন টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। কোন যাদুমন্ত্রে যেন কুকুরগুলো নিশ্চল আর বোবা হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারের পটভূমিতে স্থিরচিত্রের মত আঁকা গ্রামের হতভাগ্য কুকুরদের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বীরদর্পে সম্রাটের মত চলতে শুরু করল সেই শ্বেত সারমেয়। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ সে একটা লাফ দিয়ে হাত তিনেক উঁচুতে উঠেই মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হলো যেন এক টুকরো সাদা জ্যোৎস্না যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেই আবার অন্ধকারে তলিয়ে গেল। পরদিন।

সেই গ্রামেরই এক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ভিক্টরের একমাত্র শিশুসন্তান মারা গেল। জ্বর নেই, জাড়ি নেই, এমন কি এতটুকু কাশি পর্যন্ত নেই। তবুও ছেলেটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল হঠাৎ আর কিছুক্ষণ ছটফট করে মারা গেল। এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল জেমস।

আপনি কি বলতে চাইছেন, সেই সাদা কুকুরের সঙ্গে ছেলেটার মৃত্যুর কোন যোগাযোগ আছে? ম্যাকলিন খরচোখে বৃদ্ধ জেমসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

সেসব কিছুই বলতে পারবো না, অস্ফুটস্বরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জেমস আর সত্যিই কি বলা যায়? একটু থেমে আবার পরিস্কার গলায় বলল, আগে সবটা শোনো—

কয়েকদিন পর আবার একদিন সন্ধ্যায় ম্লান অন্ধকারে আচ্ছন্ন গ্রামের রাস্তায় সেই সাদা কুকুরের ছবি ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক লাঠি সোঁটা নিয়ে তাড়া করে গেল। কুকুরটিও তীব্রগতিতে ছুটতে লাগল। ঠিক

তখুনি গ্রামেরই একজন তার উল্টো দিক থেকে এসে তাকে বস্তাচাপা দিয়ে ধরে ফেলল। আশ্চর্য! কুকুরটা একবারও ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল না। বন্দী হয়ে যেন নিঃশব্দে মজা দেখতে লাগল।

গ্রামের অধিকাংশ লোকের ধারনা, ভিক্টরের ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী এই কুকুরটি। সে কালান্তক যমদূতের মতই মৃত্যুর বার্তা বহন করে নিয়ে আসে। আর সকলের চোখের অলক্ষ্যে কোন ডাইনী একে চালনা করছে। অতএব—

মেরে ফেলতে হবে সেই ভয়ানক কুকুরটাকে। শীতের সেই রাত্রে নদীর সেই হিমশীতল জলে বস্তাশুদ্ধো তাকে চুবিয়ে ময়দার মত ঠাসতে লাগল গ্রামের ছেলে ছোকরারা, যাতে দম বন্ধ হয়েই সে ভবলীলা সাঙ্গ করে। কিন্তু—

এমন বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না। আর সেই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কোন বুদ্ধিজীবি কি পণ্ডিত দিতে পারেনি। হঠাৎ থেমে গিয়েছিল জেমস।

থামলেন যে? কি ঘটেছিল? কৌতুহলী হয়ে ওঠে ম্যাকলিন।

জেমস দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে বলল, কি হবে এসব বলে, তোমরা একালের ছেলেছোকরা মানুষ—তোমরা তো এসব বিশ্বাস করো না—

তবুও ঘটনাটাই আগে শুনি না—

প্রায় আধঘণ্টা জলের নিচে চুবিয়ে রাখার পর কেমন স্থির হয়ে গেল কুকুরটি। ছেলেরা মনে করল, নিশ্চয়ই নিশ্বাস বন্ধ হয়েই মারা গিয়েছে। কোন প্রাণীই এতক্ষণ জলের নিচে থাকতে পারে না। কিন্তু—

কিসের? হঠাৎ ছেলেরা হাত আলগা দিল, অমনি জলের ভেতর থেকে সেই কুকুরটা তিড়িং করে হাত দশেক উঁচুতে লাফ দিয়ে উঠেই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেইদিনই শেষরাতে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ডেভিডের দুটো গরু একসঙ্গে মারা গেল।

গ্রামের লোক পুলিশে ডায়েরী করল। নালিশের বক্তব্য ছিল—সর্বনাশা সেই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের বাহন সাদা কুকুর নিশ্চয়ই কোন ডাইনীর কুকুর—আর এসব ক্ষয়ক্ষতি আর মৃত্যুর জন্যে দায়ী সেই কুকুরের মালিক—

শুরু হলো তল্লাসী।

গ্রামের শেষপ্রান্তে এক বিধবা মহিলার বাড়ির সামনে যেতেই জানালা দিয়ে পুলিশ দেখল, সেই সাদা ধবধবে কুকুরটাকে কোলে নিয়ে তিনি খুব আদর করছেন—

এই কুকুর আপনার? আপনি ডাইনী! পুলিশ জেরা শুরু করল। কোন কথা বলল না সেই প্রৌঢ়া মহিলা। কেমন তীব্র কোন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন দুটো চোখ তুলে অস্ফুটস্বরে বলল, কুকুরটা আমার—কিন্তু আমি ডাইনী কি না তা তো বলতে পারবো না—

ভদ্রমহিলা এবং তার সেই রহস্যময় কুকুরটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। বলাবাহুল্য কুকুরটি পুলিশের চোখের সামনেই জেলের গরাদের ভেতর দিয়ে গলিয়ে মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই অভিজ্ঞাত মহিলা পুলিশের কাছে বলেছিল তার জবানবন্দীতে—তাঁর নাম হেলেন ক্লার্ক। প্রতিদিন রাত্রে শয়তান তার কাছে সাদা কুকুরের রূপ ধরে আসে। তার এই বাহন বা ইমপের (শাবক) নাম রেখেছেন এলিম্যাঞ্জলার।

এলিম্যাঞ্জলারকে তিনি নিজের হাতে মিল্কপট থেকে দুধ খাওয়ান। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেন। শুনলে আশ্চর্য হবেন তার ইম্প তাকে বলিষ্ঠ গলায় বলে—যীশুকে অস্বীকার করতে—bade her to deny christ—

সবই তো বুঝলাম ম্যাডাম, পুলিশের বড়কর্তা চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ভিক্টরের ছেলে যে হঠাৎ মারা গেল। ডেভিডের দুটো গরু যে মরে গেল—এসবের আড়ালে আপনার বাহনের কোন হাত আছে না কি? একটু থেমে আবার অত্যন্ত রূঢ় গলায় বললেন, সত্যি কথা বলবেন কিন্তু—

মাথা নীচু করল হেলেন ক্লার্ক। ঝাপসা গলায় বলল, কি বলি বলুন তো—আমি ডাইনী স্যার! ডাইনী হলেই শিশুর কচি মাংসের ওপর প্রচণ্ড লোভ হয়—আমারই আত্মা এলিম্যাঞ্জলার রূপ ধরে কখনো, আবার কখনো শয়তান কখনো সাদা কুকুরের রূপ নিয়ে শিশু এবং গবাদি পশু হত্যা করে—একটু থেমে আবার অস্ফুটস্বরে ভিক্টরের ছেলে এবং ডেভিডের গরুর মৃত্যুর জন্য আমিই—

থামল জেমস।

কোয়াইট অ্যাবসার্ড! মন্তব্য করল ম্যাকলিন।

আমি তো জানি তুমি বিশ্বাস করবে না, থেমে থেমে জেমস বলল, আমার

কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে না। ১৬ই এপ্রিল, ১৬৪৫, তারিখে চেমসফোর্ড এসেকসের আদালতে শুরু হয়েছিল হেলেন ক্লার্কের মামলা, একটু থেমে চোখ দুটো নাচিয়ে বলল, ইচ্ছে করলে তুমি কোর্টের সেই রেকর্ড দেখে আসতে পারো—

কোর্টের নথিপত্র দেখতে গিয়েছিল কি না ম্যাকলিন, তা জানা যায় না তবে দিনে দিনে কমে আসতে লাগল তার মনের জোর। তার মনে হয় গম ভাঙানো কলের অপারেটার বুড়ো জেমস হয়তো ঠিক কথাই বলেছে! তা নাহলে তার চোখের সামনেই এসব কি হচ্ছে!

দিনের পরদিন ওড়ে নীল প্রজাপতি।

আর হতে থাকে একটার পর একটা ক্ষয়ক্ষতি। দিগন্তবিসারী ক্ষেতে ছিল সবুজ ফসলের অফুরন্ত সম্ভার। সতেজ ও পুষ্ট নধর এক একটা গমের শীষে পোকা ধরল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে খামারের ডিরেক্টর। ওষুধপত্র দিয়ে বহু চেষ্টা করা হলো—কিন্তু কিছু হলো না! অকালে গাছ শুকিয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করল।

সেই প্রজাপতি তীব্র নীল বিষের মত ডানায় ভর করে নিয়মিত উড়ে বেড়ায়। খামারের কৃষকরা তীক্ষ্ণ আগুন ঝরা চোখে তাকিয়ে থাকে সেই অভিশপ্ত পতঙ্গের দিকে। যেন হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত তারা দেখছে তাদের জন্মশত্রুকে।

দিন কাটে।

মাস যায়। বিরাম নেই প্রজাপতির ওড়ার। আলুর ক্ষেতেও শনি ঢুকল। প্রতিটি গাছে বিষাক্ত পোকা কিলবিল করতে শুরু করল। আলুর গাছের পাতাগুলো খেয়ে ফেলতে লাগল। মাটি খুঁড়ে আলু তুলতেই দেখা গেল—প্রতিটি আলুই পোকায় খেয়ে নিয়েছে।

খামারের অধিকাংশ কর্মীদের মনে হলো, ফসলের এই প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী ওই সর্বনাশা নীল প্রজাপতি। কিন্তু—

কি করা যায়—কি করা যেতে পারে—কেমন করে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। এই নীল পতঙ্গের বিভীষিকা থেকে?

নীল প্রজাপতি।

দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে চলে আসে সেই নীল বিভীষিকা। কোনদিক থেকে আসে—কোথায় কোন গাছের কোটরে ওর বাসা। খামারের

কৃষকরা ঠিক করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে ওর ডেরা।

ঠিক হলো—দেখতে হবে সন্ধ্যাবেলা কোনদিকে ফিরে যায় সেই ডাইনী প্রজাপতি। কিন্তু তাদের নজরে পড়ল সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক দৃশ্য।

কার্মের কর্মীরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল গমের ক্ষেতে। প্রজাপতি চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছিল। যেমন ঘোরে। ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসছিল। রক্তচন্দনের মত রোদ পড়ছিল বাঁকা হয়ে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে। দূরদিগন্তে আসন্ন রাত্রির ইঙ্গিত দিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। এইবার আস্তে আস্তে নেমে এল এক টুকরো নীল বিষের মত সেই পতঙ্গ। চারিদিকে ধ্বংসের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে তার কাজ শেষ করে এখন সে চলে যাবে! কোনদিকে যায় দেখতে হবে! কিন্তু—

কৃষকরা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। যেতে হলো। তাদের নজরে পড়ল গমের ক্ষেতের পাশেই রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি। তারা কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এসে দেখল, এক বুড়ি। জটপাকানো গুটিসুতোর মত অজস্র রেখা আঁকা মুখ। পরণে নীলস্কার্ট, গায়ে নীল ব্লাউজ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ম্লানায়মান সন্ধ্যার অন্ধকার দিয়েই যেন তিলে তিলে গড়া হয়েছে সেই রহস্যময়ীর মূর্তি।

কে আপনি?

কোন কথা বলল না বৃদ্ধা। কর্মীদের মুখের দিকে পর্যন্ত তাকালো না। তারা লক্ষ্য করল, বুড়ি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে অপস্রিয়মান সেই নীল প্রজাপতির দিকে।

কি দেখছেন, জানেন ওই প্রজাপতির প্রতিনিধি নয় তো বুড়ি? চেমসফোর্ড এসেকসের সেই ডাইনী মামলার আসামী হেলেন ক্লার্ক আর সাদা কুকুরের ঘটনাটা খামারের মনে আনাগোনা করে। হাস্কিং মেশিন অপারেটার বৃদ্ধ জেমস খুক খুক করে হেসে বলল, গরীবের কথা বাসি হলে ফলে হে— তোমরা তো এসব বিশ্বাস করো না—

আপনি কি বলতে চাইছেন, বলুন না?

ওই প্রজাপতি নিশ্চয়ই কোন ডাইনীর দূত। শুধু প্রজাপতিটাকে মারলে চলবে না—তোমাদের নিতে হবে ডবল অ্যাকশান, থেমে গেল জেমস।

ডবল অ্যাকশান। সেটা কি রকম? কর্মীরা ভয়ে এগিয়ে আসে।

বলবো—সব বলে দেব, হঠাৎ থেমে গেল জেমস। তন্ময় হয়ে কে জানে কিসের চিন্তার ভেতরে ডুব দিল সে।

সব—সব ভাঁওতাবাজী, তুড়ি মেরে বলল ছোকরা ম্যাকলিন। আমি এসব বিশ্বাস করি না—একটু থেমে আবার বলল, যতই প্রজাপতিটাকে মারো কি বুড়িকে খুন করো ; ফার্মের যেমন ক্ষতি হচ্ছিল তেমন হবেই—

কেন ?

আরে বাপু, ন্যাচারাল ক্যালামিটি আছে না। গাছে কি কোথাও পোকা লাগে না, লাগতে পারে না।

কর্মীরা কেউ ম্যাকলিনের মুখের ওপর কোন কথা বলে না। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দুই প্রান্তে তাদের মন দুলতে থাকে। আলুর কোল্ডস্টোরেজের ইনচার্জ বহুদর্শী ও প্রবীন ম্যাকফারসান আস্তে আস্তে বলে, এসব ঘটনা তো প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে চায় না ম্যাকলিন—একটু থেমে আবার বলল। নিজেরা ঘা খেলে তবে—

আপনি কি বলতে চাইছেন ?

আমি জানি—একটা ঘটনা—শেফিল্ডে একবার হলো কি, শেষরাত্রের আবছায়া অন্ধকারে কতগুলো কালো কালো ছায়ার মত কয়েকটা ছোট ছোট খড়গোস ছানাকে বাড়ির দরজায় আনাগোনা করতে দেখা যেত। বাড়ির পোষা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাদের দিকে তাড়া করে যেত—আচমকা থেমে গেল ম্যাকফারসান।

তারপর ?

তারপর আর কি, কুকুরগুলোকে দেখা যেত দরজার গোড়ায় মরে পড়ে আছে—

খড়গোসগুলোকে শেফিল্ডের লোক মেরে ফেলতে চেষ্টা করতো না ?

করে নি আবার। বস্তায় পুরে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছে। ম্যাকফারসান বলল, নদীর জল থেকে লাফিয়ে উঠে তারা পালিয়েছে। আগুনে ফেলে দিয়েছে—জ্বলন্ত আগুন থেকে দিব্যি বেরিয়ে এসে ছুট দিয়েছে—

ওদের কখনো মারা যায় না হে, জেমস উৎসাহিত হয়ে বলল, ওরা ডাইনীদের মন্ত্রপূত—

তারপর শেফিল্ডে কি হলো ?

শেফিল্ডের লোক পুলিশে ডায়েরী করল! পুলিশ ওয়াচ করে দেখল, খড়গোস ছানাগুলো এক ভদ্রমহিলার বাড়ি থেকে প্রতিদিন শেষরাত্রে বেরিয়ে আসে। পুলিশ সেই বাড়ি ঘেরাও করল। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল সেই মহিলাকে—থামল ম্যাকফারসান।

ম্যাকফারসান বর্ণিত এই ঘটনাটিও শেফিল্ডের এক বিখ্যাত উইচ কেস বা ডাইনী মামলা। ১৬ই এপ্রিল ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে আসামী সেই মহিলা সুস্যান স্প্যারো তার জবানবন্দীতে বলেছিল, খড়গোস ছানার রূপ ধরে তার কাছে প্রতিদিন শেষ রাত্রে শয়তান আসে। তারপর তার নির্দেশেই সেই শয়তান বা খড়গোস কুকুর নিধন করতে বেরিয়ে যায়—

সুস্যান স্প্যারোর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। আর শেষরাত্রে কালান্তক যমদূতের মত সেই খড়গোসদের দেখা যায় নি। কোন বাড়ির কোন পোষা কুকুরও মরেনি।

আমি জানি আর একটা ঘটনা—সেই ডাইনীর নাম মার্গারেট মুনে, ফার্মের অফিসের অ্যাকাউন্টেন্ট সেই বৈঠকে বসে খুব আস্তে আস্তে বললেন, শুনেছি মিস মার্গারেট মুনের নামেও পুলিশ কেস হয়েছিল।

শুধু ডাইনী হওয়াই তার অপরাধ? টিপ্পনী কাটল ম্যাকলিন।

অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব কোন কথা বললেন না। কেন যেন খুব কঠিন গাম্ভীর্যের ছায়া থমথম করতে লাগল তার মুখে। ম্যাকলিনের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ে অস্ফুটস্বরে বলল—কিছু বলতাম না—এরা সব বিশ্বাস করে না কি না?

ওসব ছাড়ুন, আপনি মার্গারেট মুনের কীর্তিকলাপ বলুন। একমাত্র ম্যাকলিন ছাড়া উপস্থিত আর সকলে সমবেত গলায় বলল।

শুধু অ্যাকাউন্ট্যান্ট কেন—লিভারপুলের আদালতের নথিপত্রেও রয়েছে মিস মার্গারেটের নানা দুষ্কৃতির বীভৎস ইতিবৃত্ত। সে ইতিহাসই খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব—

মিস মার্গারেট মুনে। ছাব্বিশ বছরের খরযৌবনবতী এক তরুণী। থাকতো লিভারপুল শহরের একপ্রান্তে। এই যুবতীর দীর্ঘ পুরুষালী চেহারা। জবাফুলের মত রক্তবর্ণ দুটো চোখের কোলে কোলে গভীর কালির দাগ। তাকে দেখে মনে হতো নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যেন কোন দূরের অজানা জগতে বাস করছে।

পাড়ার কারো সঙ্গে সে একটা কথা বলে না।

কেউ তেমনি তার সঙ্গেও কখনো বাক্যালাপ করে না। পাড়ায় বাস করেও সে একঘরে। সমাজচ্যুত। আর কেনই বা হবে না? সারাদিন দরজা

বন্ধ করে সে ঘুমোয়। নিশিরাত্রে নাকি এক অভিশপ্ত প্রেতিনীর মত বাইরে বেরিয়ে আসে। কোথায় যায়—কেন যায়, কেউ কিছু বলতে পারে না। তার জীবনযাত্রা রহস্যময় বলেই প্রতিবেশীরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখতো।

একদিন লিভারপুলের মোটর কারখানার মালিকের একমাত্র ছেলে মারা গেল। দশ এগারো বছরের ছেলে। বর্ষীয়ান এক আয়ার সঙ্গে একঘরে থাকতো। এই আয়ার জবানবন্দীতে জানা যায় মাঝরাতে ঘরের ভেতরে কিসের যেন খুট-খুট শব্দ হলো। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখি, ঘরের ঘন অন্ধকারে আরও এক ছোপ নিকষ কালো ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট কাল কেউটের মত তার রুক্ষ চুল উড়ছে বাতাসে। আর অন্ধকারে তার চোখদুটো জোনাকির মত মিট মিট করে জ্বলছে—

কে?—কে আপনি? ভয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলাম আমি। কোন কথা বলল না সে।

কিন্তু আমি যখন সেই রহস্যময় ছায়ামূর্তির সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলাম, তখুনি ঘটে গেল সর্বনাশ—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল সেই আয়া।

কি সর্বনাশ হয়েছিল, কোর্টের রেকর্ডে কী আছে? শ্রোতারা কৌতূহলে অস্থির হয়ে ওঠে।

আদালতের নথিপত্রে যেমন ছিল হুবহু তেমনি বলেছিলেন ফার্মের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। এখানে তার সারাংশ দেওয়া হলো—

ঘরের অন্ধকারে সেই ছায়াদেহের দিকে তাকিয়ে আয়া যখন চিৎকার করছিল তখুনি ছেলেটি ঘুমের ভেতরে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠেছিল। আয়া ছুটে এসে দেখে ঠিক ইঁদুরের মত কিন্তু দেখতে খুব মোটাসোটা এবং বড়সড়ো একটি জন্তু ছেলেটির বুকের রক্ত শুষে পান করছে। আয়া চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে! জন্তুটি যেন পিছলে নেমে এসে সেই ছায়ামূর্তির পায়ের কাছে বসে পড়ল। সেই ছায়াদেহ খুব মৃদুকণ্ঠে ডাকল, যীশু—চলো—

তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিছানায় পড়ে রইল ছেলেটির প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ।

আরো একদিন। লিভারপুলের উপকণ্ঠে একটি গ্রামের রাস্তায় মাঝরাতে কেমন একটা সন্দেহজনক আওয়াজ শোনা গেল। মনে হলো, কেউ যেন খুব নীচু গলায় আদর করে ডাকছে—জকি—মঁসিয়ে—আণ্ডি—ই-ই-ই—সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল বিশাল ইঁদুরের মত তিনটি জন্তু। তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল পুরুষালী চেহারার এক যুবতী! তারপরই তারই

ইঙ্গিতে জানোয়ার তিনটি ঢুকে পড়ল রাস্তার ধারে একটি বাড়ির গোয়াল ঘরে।

কিছুক্ষণ পরই তিনটি গরুর সমবেত আর্তনাদে রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। পরদিন দেখা গেল, তিনটি গরু গোয়ালঘরের কোণে মরে পড়ে রয়েছে।

লিভারপুলের মোটর কারখানার মালিক এবং যার গরু মরে গিয়েছে তারা পুলিশে ডায়েরী করল। সেই সঙ্গে নিশীথ রাত্রির সেই আততায়ীর চেহারার বিবরণও জানিয়ে দিল। সেই দীর্ঘাঙ্গী, ঋজু, কঠোর পুরুষালী চেহারা এবং ধূসর রঙের ইঁদুরের মত এক ধরনের জন্তু তার বাহন—ইত্যাদি সম্বন্ধেও যেটুকু তারা জানেন ভাসা ভাসা রিপোর্ট করে এল পুলিশে।

সারা শহর তোলপাড় করে খুঁজতে লাগল পুলিশ। বলাবাহুল্য প্রথমেই সন্দেহ হলো মিস মার্গারেট মুনের ওপরে। কিন্তু যেহেতু সে দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমোয় তাই পুলিশ ঠিক করল, গভীর রাত্রে যখন সেই ডাকিনী তার বাহনদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে বেরোবে তখুনি তাকে হাতে নাতে ধরতে হবে। কিন্তু—

রাত্রে মিস মুনের বাড়িতে রেড করতে গিয়ে হলো সম্পূর্ণ অন্য এক অভিজ্ঞতা।

পুলিশ সাদা পোশাকে দূর থেকে ওয়াচ করছিল, কখন—কখন অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে বেরিয়ে আসবে সর্বনাশা বহু অপঘটনার সেই নায়িকা। কিন্তু—

আশ্চর্য! চাঁদ ধীরে ধীরে মাঝের আকাশে উঠে এল। মধ্যরাত্রির প্রহর ঘোষণা করে থানা থেকে কারফিউয়ের সঙ্কেতের বাঁশী বেজে উঠল। আশ্চর্য! মিস মার্গারেট মুনের বাড়িটা যেন কালিঢালা ঘন অন্ধকারে ডুবে আছে। কোথাও নেই জীবনের এতটুকু চিহ্ন!

দুঃসাহসী এক পুলিশ অফিসার অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে গেল খোলা জানালার নিচে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখদুটো ধাঁধিয়ে গেল।

ঘরের কড়িকাঠে সুদৃশ্য ঝাড়বাতি জ্বলছে। তার জোরালো আলোয় দেখা যায়, মিস মার্গারেট মুনের ঘরে বসেছে বারোবাসরের লীলা। পাঁচ-ছয়জন মস্তপ এবং উচ্ছৃঙ্খল চেহারার ছোকরাদের মাঝখানে আসর আলো করে বসে রয়েছে মক্ষিরানীর মত মিস মুনে। ছেলেদের কারো মাথায় চাঁটি মেরে, কারো চিবুক আলতো করে ছুঁয়ে আদর করছে সে। আর তারপরেই অকারণেই খিল খিল করে হেসে তার উগ্র যৌবনপুষ্ট দেহটাকে ছেলেদের গায়ে ঢেলে দিচ্ছে।

আমোদ আহ্লাদ করতে করতেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল মুনে। তার নাগরদের একজনকে বলল, তুমি আফিংটা ঠিক জায়গা মত দিয়েছো—

হ্যাঁ—ডার্লিং—

তোমাকে যে বারো গ্যালন চোলাই মদ ডেলিভারী দিতে বলেছিলাম, আবার আর একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল মুনে, সেগুলো—

আঃ—হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতার বুক চিরে একটা তীব্র আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। জানালার নিচে বসে যে পুলিশ অফিসার মুনের নারকীয় কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন তিনিই নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। তার দুই পা বেয়ে তুর তুর করে উঠে এল মুনের শাবক বা ইম্প—সেই ধূসর রঙের তিনটি বড় বড় ইঁদুর!

ঠিক হয়েছে—উচিত শাস্তি হয়েছে—জানালা দিয়ে একপলক দৃশ্যটা দেখে নিয়েই হাততালি দিয়ে বলে উঠল মার্গারেট—আমার জানালায় আড়িপাতা—বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল। তার আকস্মিক হাসির শব্দটা ঘরের বাতাসে একগোছা চাবুকের মত লিকলিক করে উঠল। সে মুখে ডান হাতের করতল চাপা দিয়ে তীক্ষ্ণ চাপা গলায় ডাকল তার আর সব শাবকদের—স্যা-ণ্ডি—এ-লি-জা-বেথ—ক-পি-ন—জ-কি—ই-ই—কিন্তু—

পারল না। মুনের ইম্প বা শাবকরা শেষ রক্ষা করতে পারল না। তিন চারজন সেপাইকে তারা ঘায়েল করেছিল। কিন্তু—

ডাইনীকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল তিনশো পুলিশের বিশাল রেডিং পার্টি। তারা বাড়ি ঘেরাও করে মার মার করে দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ল। জিনিসপত্র তছনচ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তল্লাসী করে পাওয়া গেল মদ চোলাইয়ের সাজসরঞ্জাম, কিছু চোরাই আফিং-এর কেক। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তার সেই রহস্যময় খুনে শাবকদের!

গ্রেপ্তার করা হলো মিস মার্গারেট মুনেকে।

দীর্ঘদিন ধরে মামলার শুনানী চলেছিল লিভারপুলের আদালতে। তার শুনানীতে উদ্ঘাটিত হয়েছিল, এমন জঘন্য কুকাজ নেই যাতে এই তরুণী লিপ্ত ছিল না। তার বীভৎস কর্মযজ্ঞের রোমহর্ষক বিবরণ শুনে শিউরে উঠেছিল জনসাধারণ।

অসংখ্য শিশুসন্তান এবং গোহত্যার অপরাধে বিচারক তাকে ফাঁসী দিয়েছিল। ছত্রিশপাতা ব্যাপী রায়তে তিনি বলেছিলেন—The accused Miss Margaret Moone was a woman of every bad fame, who

confessed many crimes especially causing death of animals and Children.

ওদিকে সেই নীল প্রজাপতি উড়ে চলেছে।

উড়ে চলেছে যথা নিয়মে। ক্ষেতের ওপরে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে সে। খামারের কর্মীদের মনে হলো, আতঙ্ক আর বিভীষিকার মত সেই নীল প্রজাপতিটা যেন একটু বেশি নীচু দিয়ে উড়ছে। হয়তো প্রচুর ক্ষতি করতে পারছে বলে উৎসাহ এবং সাহস বেড়ে গিয়েছে তার—

ফসলের ধ্বংসযজ্ঞও সমানে চলেছে। আলুর যে গাছগুলোতে পোকা ধরেছিল, সেগুলো শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে মরে গেল। তার ঝুলে পড়া ছোট ছোট ডালে ডালে দুপুরের শাঁ শাঁ বাতাস হাহাকারের মত বেজে যেতে লাগল।

গমের ক্ষেতের দিকেও তাকানো যায় না। যে শীষগুলোতে পোকা ধরেছিল তার একটাও রক্ষা করা গেল না। গমের গাছগুলোও হলুদ হয়ে শুকিয়ে মরে যেতে লাগল। যতদূর চোখ যায় মাঠজুড়ে শুকনো হলুদ গাছগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় যেন দিগন্তবিসারী সেই প্রান্তরে এক নিঃশব্দ অগ্নিকাণ্ড হয়ে চলেছে।

এবার এককণা ফসলেরও কোন আশা নেই। খামারের ডিরেক্টর ব্যাকুল হয়ে বলল কর্মীদের, আপনারা যা হোক—একটা ব্যবস্থা করুন—

কি করবো স্যার—কি করলে ভাল হয় বলুন—

ডিরেক্টর কথা বলে না। দূরে রৌদ্রালোকিত ফসলের ক্ষেতে উড়ন্ত সর্বনাশা সেই নীলপ্রজাপতির দিকে চোখ কুঞ্চিত করে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলে, আপনাদের যদি মনে হয়—ফসলের এই নিদারুণ সর্বনাশের মূলে—ওই প্রজাপতি, তাহলে ওটাকেই মারার ব্যবস্থা করুন—

ফার্মের কর্মীরা গুটি গুটি এগিয়ে এসে ডিরেক্টরকে ঘিরে ধরে দাঁড়ায়। ম্যাকলিন বেশ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, স্যার আপনি যদি বলেন তাহলে প্রজাপতিটাকে আমরা মেরে ফেলি—

হ্যাঁ-হ্যাঁ-দুষ্টু পতঙ্গটাকে টিপে মেরে ফেলা হোক ম্যাকলিনের সমর্থক যুবক কর্মীরা সমবেত গলায় বলে ওঠে! কিন্তু—

একটু দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করে হাস্কিং মেশিন ইনচার্জ বৃদ্ধ জেমস, আলুর হিমঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ম্যাকফারসান এবং অ্যাকাউন্টেন্ট ও আরও কয়েকজন প্রবীন বয়সী। জেমস অস্ফুটস্বরে বলে, কি যে সব করছে—ওরা জানে

না—আগুন নিয়ে খেলা করছে—

আরে পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে—জানো না? ম্যাকফারসান গজরায়।

ওই প্রজাপতিটাকে মারতে গেলেই সাংঘাতিক বিপদে পড়বে—অ্যাকাউন্টেন্ট মনে মনে হিসাব কষে বলে, আর ঠিক দুইমাসের ভেতরে এই ফার্মে লালবাতি জ্বলবে—

ওই বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিলের হাসি ফোটে ছোকরাদের মুখে। তারা ম্যাকলিনের পরিচালনায় তৈরি হয় প্রজাপতি নিধনে। কে কোনদিকে দাঁড়াবে, কে কোনদিক থেকে এগিয়ে আসবে—কাগজে তার ছক কাটে ম্যাকলিন। ঠিক হয় পরদিন সকাল থেকেই শুরু হবে অভিযান।

স্যার সর্বনাশ হবে—ওদের বাধা দিন, পরম আবেগে ডিরেক্টারের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলে জেমস, আমি আপনার পিতার বয়সী—আমার একটা কথা রাখুন—খবরদার—প্রজাপতিটাকে মারতে দেবেন না—

স্যার—ম্যাকলিনের অভিযানে কিন্তু আমরা সহযোগীতা করতে পারবো না। বলল ম্যাকফারসান, আপনি কোন অপরাধ নেবেন না—

কোন কথা বলে না খামারের অধ্যক্ষ।

তার মনে হয় দু-দিক থেকে দুটো তীক্ষ্ণধার তীর এসে বিঁধে গিয়েছে।

বেলা শেষ হয়ে এল। দূরে বহুদূরে পশ্চিমের আকাশের রক্ত রঙের দিকপ্লাবী বন্যার নিচেই একটু একটু করে পুঞ্জীভূত হচ্ছে আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার। সেই আবছায়া অন্ধকার আর শেষ সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা গায়ে মেখে নিয়ে উড়ছে তখনো সেই প্রজাপতি। কর্মীরা লক্ষ্য করল, আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে সেই সর্বনাশা অভিশাপ। আর ঠিক তখুনি—

ফার্মের প্রাচীরের গা ঘেঁসে রাস্তার ওপরে দেখা গেল সেই নীল স্কার্ট নীল ব্লাউজ পরা সেই দুরভিসন্ধির মূর্তির সেই বুড়ি! খামারের কর্মীরা তার দিকে ছুটে আসতেই সে চোখের নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামল।

ফার্মের ক্লাবঘরে আলো জ্বলে উঠল। একটা ঘরে জেমস, ম্যাকফারসান, অ্যাকাউন্টেন্ট এবং অন্যান্য প্রধান কর্মীরা বসছে। আর তার পাশের ঘরে ছেলেরা হুল্লোড় করে কেউ ক্যারম, কেউ বা তাস খেলছে। তাদের অকারণ উচ্ছ্বসিত হাসির ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথায় আগামী দিনে প্রজাপতি ধরার কৌশল বা টেকনিকের আগাম আভাস পাওয়া যাচ্ছে—

মরবে মরবে এরা মরবে মিঃ ম্যাকফারসান, আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ল জেমস, নিজেরাও মরবে—আমাদেরও মারবে—একটু থেমে ভেতরের তীব্র যন্ত্রণাকে সংযত করে শান্ত কণ্ঠে বলল, এতকালের পুরানো খামারটা এবার ধ্বংস হয়ে যাবে—

চলুন কোথাও চলে যাই—এই ফার্মের চাকরী ছেড়ে দিয়ে—

আরে আপনারা অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন একটু থেমে অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব মনে মনে অঙ্ক কষে বলল, কালকে আগে প্রজাপতিটাকে ধরুক না—তারপরে দেখুন কি হয়—হঠাৎ থেমে গেল সে। আবার নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলল, ওরা তো বালখিল্য—ওরা জানে না—ডাইনীর মন্ত্রপূত পতঙ্গ কী সর্বনাশ করতে পারে—

অস্বস্তিকর একটা নিস্তব্ধতায় থম থম করতে লাগল ঘরটা।

কারো মুখে একটা কথা নেই। ঘরের অন্ধকার দূর কোণ থেকে একটা পোকা ডেকে উঠল—চিপ্-চিপ্-চিপ্—বৃদ্ধরা এ ওর মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো—

আমস্টারডামের কাক-ডাকার ঘটনাটা জানেন মিঃ জেমস, বলল অ্যাকাউণ্টেণ্ট, শুধু কাকডাকা নয়, কুকুরের মত ডাকা, রবিন পাখির মত গান করার সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনুন—

অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেবের সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার অকারণ ও ক্লান্তিকর বিবরণ এখানে সংক্ষেপে বলা হলো। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার—এই রোমহর্ষক খুনের ঘটনাটিও আমস্টারডামের ছোট কাউন্টি আদালত থেকে গড়িয়ে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিল।

দুটো বাড়ি।

দুই বন্ধুর দুটো পাশাপাশি বাড়ি। দুজনেরই জীবিকা কাঠের মিস্ত্রীগিরি! আমস্টারডামের বিখ্যাত ছুতার মিস্ত্রী তারা। তাদের হাতের কাজের আশ্চর্য বৈচিত্র দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। তাই দুজনেরই নামডাক আছে বলেই যথেষ্ঠ রোজগার। বেশ সুখেই তাদের দিন কাটছিল। কিন্তু—

বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হাসছিলেন। একদিন তাদের একজন রবার্ট টার্ণারের ঘরের চালে উড়ে এসে বসল একটি কালো কাক। সকালবেলা সবে টার্ণার চায়ের বাটিটা নিয়ে বসেছে, চা খেয়ে কাজে বেরোবে। এমন সময় ওই কাকটাকে দেখেই খুব বিরক্ত হল টার্ণার। কিন্তু—

কিছুই বলল না। কি হবে বলে, পশুপাখির খেয়াল। কিন্তু আর ধৈর্য

রাখতে পারল না টার্ণার—তখন, যখন কাকটা কর্কশকণ্ঠে কা-কা-কা—করে ডাকতে লাগল। পাশের বাড়ি থেকে বন্ধু সেভান্টসিক মস্ত একটা লাঠি উঁচিয়ে কাকটাকে তাড়া করল। কাকটা উড়ে পালালো।

দুই বন্ধু কাজে বেরিয়ে গেল। আর কাজের চাপে বেমালুম ভুলে গেল কাকের ঘটনাটা। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিল টার্ণারের স্ত্রী ক্ল্যারা। বলল, জানো ছেলেটার জ্বর এসেছে—যখুনি সকালে ওই কাকটা ওরকম কর্কশস্বরে ডাকছিল তখুনি জানি—একটা অমঙ্গল—

ছাড়ো তো সব বাজে কথা, ঝাঁঝিয়ে উঠল টার্ণার। যত সব কুসংস্কার—

পরদিন সকাল হলো। আর যেই টার্ণার চায়ের কাপ নিয়ে বসল অমনি শুরু হলো সেই কাকের চিৎকার—কা-কা-কা—ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল টার্ণার।

চা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কয়েকমুহূর্ত সে কাকটার দিকে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত তাকিয়ে রইল। ছুটে এল ক্ল্যারা—তোমার পায়ে পড়ি—এই কাকটা তুমি মের না—

যাও তো এখান থেকে, চাপা বিষাক্ত গলায় বলল টার্ণার। তার মাথার ভেতরে মনে হলো একটা আগুনের চাকা নিঃশব্দে আবর্তিত হয়ে চলেছে। ছুটে গিয়ে কারখানা ঘর থেকে একটা লম্বা করাত নিয়ে এল।

কাকটা একটানা ডেকে চলেছে—কা-কা-কা -ভয়ানক ধূর্ত পাখি। অতএব খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে কাকটা যেখানে বসে ডাকছে তার পিছন দিকে এগিয়ে এল।

ক্ল্যারার বুকে ভয়ের ধুকুপুক। কী নিদারুন সর্বনাশ যে হতে চলেছে। শুধু ডাকার আনন্দেই বিভোর হয়ে ডেকে চলেছে কাকটা। আচমকা বিদ্যুৎ-গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে টার্ণার কাকটাকে দিল একটা ঘা! সঙ্গে সঙ্গে কাকটার মাথাটা থেঁতলে নেতিয়ে পড়ল। স্তব্ধ হয়ে গেল তার ডাক।

ঝম্—ঝম্—ঝম্—হঠাৎ বাইরে রাস্তায় ঝাঁঝরের শব্দ বেজে উঠল। কৌতূহলী হয়ে টার্ণার এবং ক্ল্যারা এল বাইরে। আর চমকে উঠল তাদের চোখের দৃষ্টি। তাদের মনে হলো, রক্তবর্ণ দুটো ক্রিসানথিয়াম যেন রাস্তা আলো করে ফুটে রয়েছে।

দুই তরুণী।

অসামান্য সুন্দরী। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রঙ। পরনে আগুনের মত টকটকে হলুদ রঙের ঘাঘরা। গায়ে ঘন নীল ব্লাউজ। দুইজনেরই মাথায় লাল রুমালের ফেটী বাঁধা। কাঁধে ঝুলি।

তোমরা কোথা থেকে আসছ ?

কোন কথাই বলল না তারা। বাঁধভাঙ্গা ঝরণার মত কলকল করে হেসে একজন আর একজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পরেই গম্ভীর হয়ে গেল তারা। সুর্মাটানা চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল ঘরের সেই চালের দিকে যেখানে কাকটা বসে ছিল।

তোমরা কথা বলছ না কেন ? কে তোমরা ?

আমরা জড়িবুটি বিক্রি করি স্যার, বলেই তীক্ষ্ণ হাসি ছড়িয়ে চারিদিক মোহাচ্ছন্ন করে দিয়ে চলে গেল।

এইবার টার্ণার নিশ্চিন্ত। কাকটার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। এইবার সকালে চায়ের বাটি নিয়ে বসল সে। আর ঘরের শূন্য চালের দিকে তবুও একবার তাকালো। না-আর কোন কাক আসে নি। কা-কা-কা-করে কর্কশ কণ্ঠের চিৎকার নেই। চারিদিকে সকালের প্রসন্ন শুদ্ধতা।

কিন্তু খুশি হয়ে চা খেয়ে যেই বেরোতে যাবে দেখল দরজার গোড়ায় বসে আছে একটি কালো কুকুর। টার্ণারকে দেখে কুকুরটা কুঁই কুঁই করে ডেকে উঠল। সে কুকুরটার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল। কিন্তু—

ভরদুপুরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল কুকুরটা। ক্যারা অতিষ্ঠ হয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল। টার্ণার বাড়িতে এসে সব বৃত্তান্ত শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পরদিন ভোরে আবার চা খাওয়ার সময় কুকুরটা আসতেই ক্ষিপ্রগতি উঠে দাঁড়ালো টার্ণার। লোহার রড দিয়ে এক বাড়ি দিতেই কুকুরটার মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। আর দেখতে দেখতে অসাড় হয়ে গেল তার প্রাণহীন দেহটা।

জড়িবুটি নেবেন স্যার, খিল খিল হাসিতে নুয়ে পড়ে এসে দাঁড়াল সেই দুই তরুণী। মরা কুকুরটার দিকে একবার তাকিয়েই তারা মুখ ঘুরিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল একজন, আপনি স্যার জন্তু-জানোয়ার একেবারে পছন্দ করেন না—বলেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে চারিদিক মুখরিত করে তারা চলে গেল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল টার্ণার।

মনের অন্ধকার গহনে দুলে উঠল ক্ষীণ একটা সন্দেহ—এই কাক এবং কুকুরের সঙ্গে এই মেয়েদের কোন যোগাযোগ নেই তো ?

এবার উপদ্রব শুরু হলো সেভাণ্টসিকের বাড়িতে।

তার বাইরের বারান্দার রেলিং-এ বসল একটা রবিন পাখি। এই পাখি নাকি গান গায়। কিন্তু কিসের? কা কা করে চিৎকার করতে শুরু করল। অসহ্য হয়ে উঠল সেভান্টসিকের। সে গোঁয়ার মানুষ। পিছন দিক থেকে আস্তে আস্তে যেয়ে তোয়ালে চাপা দিয়ে ধরে ফেলল পাখিটাকে। তীব্র আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করে বলল পাখিকে,—কি—আর চেঁচাবি—বল?—বলেই একটানে ছিঁড়ে ফেলল মুণ্ডুটা।

ক্রা-চ—ক্রাচ—ক্রাচ—একটি নাম না জানা পাখি কর্কশ কণ্ঠে ডেকে দূর আকাশে মিশিয়ে গেল।

পরদিনই টার্ণারের জ্বর হলো। অল্প-অল্প জ্বর—ঠাণ্ডা গরমে হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই বলে ডাক্তার ওষুধ দিল। কিন্তু সেই ওষুধে টার্ণারের জ্বর তো কমলই না বরং জ্বর যেমন তেমনি মাথার যন্ত্রণাও বেড়ে গেল। জ্বরের জোরে বেহুঁস হয়ে গেল টার্ণার। প্রলাপের ঘোরে কাকের মত চিৎকার করে—কা-কা-কা করে ডাকতে লাগল।

কা-কা-কা করে ডাকতে ডাকতে বিছানা ছেড়ে ছুটে বাইরে চলে যায়। চার পাঁচজন জওয়ান তাকে চেপে ধরে আটকাতে পারে না। কিন্তু—

আবার হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। দুচোখে কেমন শূন্য আর নিষ্পলক দৃষ্টি। হঠাৎ আবার ফুঁসে উঠে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে থাকে। আর দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে ফেলে কপালটা। সেইদিনই শেষরাত্রে মারা গেল টার্ণার।

আর সেদিন বিকেল থেকেই সেভান্টসিকের তীব্র পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেল। পেটের ব্যথায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করে। আর যন্ত্রণা যত বাড়ে ততই রবিন পাখির মত ডাকে—

ডাকতে ডাকতে হাঁপিয়ে ওঠে সেভান্টসিক। তখন ফিস ফিস করে ডাকে। আর তীব্র যন্ত্রণায় সারা দেহ এঁকে বেঁকে দুমড়ে যায়। অনেক ডাক্তার এল—অনেক রকম ওষুধ বিষুধ দিল। কিছুতেই কিছু হলো না। সাতদিন এইভাবে থাকার পর সেভান্টসিক চোখদুটো বুজে শান্তি পেল—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল অ্যাকাউন্টেন্ট।

তাহলে জড়িবুটি ফেরী করে বেড়ানো মেয়ে দুটোই কি ওদের মৃত্যুর জন্য দায়ী?

ওরা কি ডাইনী?

কোন কথা বলল না অ্যাকাউন্টেন্ট। দূরে রাত্রির কালিঢালা অন্ধকারে

আচ্ছন্ন গমের মাঠের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে একটা পাথুরে মূর্তির মত বসে রইল। তার মনের ভেতরে চিন্তার ঢেউ ওঠানামা করতে লাগল। আগামীকাল সকালে প্রজাপতি নিধনের সঙ্গে সঙ্গে যে ভয়ানক সর্বনাশ নেমে যাবে তার থেকে রক্ষা পাবে কি করে ওই অবাচীনরা—

শোন প্রজাপতিটাকে ধরতে পারলে তার ডানা একটা একটা করে ছিঁড়বো—পাশের ঘরে ছোকরাদের আড্ডায় আলোচনা হয়।

আমি তো ভেবেছি। প্রজাপতিটার জন্য একটা সমাধি তৈরি করবো—ওর সেই কবরের দিকে তাকালে লোকে বুঝবে—একটা পতঙ্গ কী প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে—

তোমরা কি ধরেই নিয়েছ, এই নীল প্রজাপতির জন্যই খামারের এত ক্ষতি হচ্ছে? ম্যাকলিনের বলিষ্ঠ গলার আওয়াজ গম গম করে, আমি বলছি ওসব কিছু না।

তাহলে প্রজাপতিটাকে মারার জন্য এত তোড়জোড় করছেন কেন?

সকলের স্যাটিশফ্যাকশনের জন্য—

পরদিন।

ভোর হতে না হতে গমের ক্ষেতে প্রজাপতি শিকারের উৎসব শুরু হয়ে গেল। মাঠের দুদিকে তরুণ বয়সী কৃষকরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেকের হাতে ভিজে তোয়ালে। তাদের সকলের দৃষ্টি আকাশের দিকে—কখন-কখন আসবে সেই বিষাক্ত নীল অভিশাপ। কিন্তু—

পূবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠল। সোনার মত হলদে নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল গমের ক্ষেতে। কিন্তু এল না সেই নীল পতঙ্গ। ম্যাকলিনও হতাশ হলো। কিন্তু কিছু বলল না। চোখদুটো কুঞ্চিত করে রোদজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

এবারে বীরপুরুষ খুব জব্দ হয়েছে বলেই ক্লাবঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুক খুক করে হাসল হাস্কিং মেশিনের অপারেটার বৃদ্ধ জেমস।

দেখুন না—এখুনি হয়েছে কি, আলুর হিমঘরের ইনচার্জ ম্যাকফারসান বলল, ওর জব্দ হওয়ার এখনও অনেক বাকী আছে—

কোন কথা বলল না অ্যাকাউন্টেন্ট। শুধু দূরে গমের ক্ষেতে প্রজাপতি শিকারীর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের এক টুকরো চাপা হাসিটা ফুটে উঠল তার মুখে।

বেলা বাড়তে লাগল। বেড়ে উঠল রোদের তাত। যখন শিকারীরা প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিল তখন দিগবিস্তীর্ণ প্রান্তরের নিস্তব্ধতায় যেন বন্যার ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল সমবেত কণ্ঠের উচ্চকিত চিৎকার—এসেছে—সেই নীল প্রজাপতি এসেছে—

মুহূর্তে গোটা খামারে যেন উল্লাসের সাড়া জেগে উঠল। হেঁকে বলল ম্যাকলিন।

এই ছেলেরা তোমরা দুদিকে দাঁড়িয়ে না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ো—

সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছেলেরা ভাগ হয়ে ক্ষেতের উত্তরে এবং দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকের হাতে ভিজে তোয়ালে। চোখ উড়ন্ত প্রজাপতির দিকে স্থির নিবদ্ধ। কিন্তু—

আশ্চর্য! সেই নীল প্রজাপতি ক্রমশঃ ওপরে উঠে গেল। নিশ্চয়ই তাকে গ্রেপ্তারের এই বিরাট চক্রান্ত তাকে ভীত করে তুলেছে। হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রজাপতি শিকারীর দল।

সেদিন অনেক বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল তারা। কিন্তু ধূর্ত সেই নীল প্রজাপতি আর এল-ই না। কালো-হয়ে গেল ম্যাকলিনের মুখখানা।

আরে বাবা—অত সোজা?' দূরে ক্লাবঘরের বারান্দা থেকে টিপ্পনী কাটল জেমস।

ওরা একটা জিনিস কিছুতেই বুঝছে না, নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল বৃদ্ধ ম্যাকফারসন, সাধারণ প্রজাপতি নয় ওটা—কোন অশুভ আত্মাই প্রজাপতির রূপ ধরে এসেছে—

আঃ চুপ করে থাকুন তো বিরক্ত হয়ে খুব চাপা গলায় বলল অ্যাকাউন্টেন্ট —চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী—আবার একটু থেমে নিজের মনেই অস্ফুট-স্বরে বলল, এই রকমই টার্ণার আর সেভান্টাসিকও কাক এবং রবিন পাখিকে বিশ্বাস করেনি শুনলেন না? কী করুণ পরিণতি হয়েছিল তাদের—

আচ্ছা ওরা কাকের ডাক ডাকতে ডাকতে মারা গেল কেন? বলল জেমস, এসব তো কেউ বিশ্বাস করে না অ্যাকাউন্টেন্ট বলল। আমষ্টারডাম আদালতের নথিপত্রে আছে—সেই রোমহর্ষক ঘটনার বিশদ বিবরণ। থামল সে। এখানে সংক্ষেপে বলা হলো হতভাগ্য টার্ণারদের ইতিবৃত্ত—

টার্ণার মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী ক্যারা এবং সেভান্টসিকের স্ত্রী সেই

জড়িবুটি ফেরীওয়ালী মহিলা দুটির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে পুলিশে ডায়েরী করেছিল। পুলিশ তন্ন তন্ন করে অনেক খুঁজে পেয়েছিল তাদের শহরের একপ্রান্তে। তাদের কুঁড়েঘরে অনেক কাক, কুকুর এবং রবিন পাখি ইত্যাদি জন্তু জানোয়ারের মেলা। পুলিশের জেরার উত্তরে তারা জানিয়েছিল তারা রোমান জিপসী (যাযাবর)। মাস দুয়েক হলো এখানে এসেছে। তাদের একজনের নাম মিস হ্যালিব্রেড আর একজন জয়েস বুয়োনেস। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করল না তারাই টার্ণার এবং সেভাণ্টসিকের মৃত্যুর কারণ। পুলিশ শুরু করল অকথ্য অত্যাচার।

শেষে হ্যালিব্রেড বলেছিল, হ্যাঁ মন্ত্রপুত কাক পাঠিয়ে আমিই টার্ণারকে কাকের মত চিৎকার করিয়েছিলাম। আর বুয়োনেস রবিন পাখির মত চিৎকার করিয়েছিল সেভাণ্টসিককে। আর ওদের মৃত্যুর জন্য আমরাই দায়ী হুজুর—তবে বলেই রূপসী হ্যালিব্রেড হঠাৎ থেমে গিয়েছিল।

কী থামলে কেন? হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল পুলিশের বড়কর্তা।

তবে ওরা যদি কাক এবং রবিন পাখিকে না মেরে ফেলতো তাহলে ওদের মরতে হতো না। মাথা নীচু করে বলল হ্যালিব্রেড—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল অ্যাকাউণ্টেণ্ট। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল ক্লাবঘরে।

তাই তো ওদের কতবার বলেছি—এই প্রজাপতিকে ঘাঁটিও না। বলল জেমস, কে জানে কোন ডাইনীর অশুভ আত্মা বহন করে নিয়ে এসেছে।

ওরা যা খুশি করছে করুক—ওদের ব্যাপারে আমরা নেই, বলল ম্যাকফারসান। ডিরেক্টরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেব আমরা—

কোন কথা বলল না অ্যাকাউণ্টেণ্ট।

পরদিন ভোর হতে না হতে ম্যাকলিনের নেতৃত্বে ছেলেরা এসে দাঁড়াল মাঠে। প্রত্যেকের হাতে ভিজে তোয়ালে তো আছেই আর আছে চারিদিকে চারজন কৃষকের হাতে উঁচু করে টাঙানো মশারীর মত প্রায় স্বচ্ছ দীর্ঘ রঙীন কাপড়।

পূবের আকাশ রাঙিয়ে পা টেনে টেনে সূর্য উঠল। সিল্কের ওড়নার মত হলদে নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল দিগন্তপ্রসারী ক্ষেতে। এখুনি—এখুনি তো ডানা মেলে উড়ে আসবে সেই নীল অভিশাপ। কিন্তু—কোথায়—কোথায় সেই পতঙ্গ! কিন্তু এখুনি এই তো আসার সময় তার!

শিকারীরা চোখদুটো কুঞ্চিত করে তাকিয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে।

আর তাদের উৎসুক দৃষ্টি আকুল হয়ে খুঁজতে থাকে একটি নীল বিন্দু! কয়েক মুহূর্ত পরই হঠাৎ পূবদিক থেকে আছড়ে পড়ল একটা উল্লসিত চিৎকার—ওই যে আসছে—আসছে—পশ্চিমদিক থেকে আসছে—

সত্যিই দেখা গেল, পশ্চিমদিক থেকে বাতাসে ভেসে আসছে সেই নীল প্রজাপতি। সঙ্গে সঙ্গে তার উল্টোদিকে অর্থাৎ পূবের দিকের ছেলেরা হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। হেঁকে তাদের বলল ম্যাকলিন, সাবধান তোমাদের দিকে যাচ্ছে প্রজাপতি—খবরদার তোমরা কেউ উঠে দাঁড়াবে না। আগে ওটাকে কোথাও বসতে দাও।

তীব্র উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়ছে ছেলেদের বুক। তাদের মাথার ভেতরে আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে। পশ্চিমদিক থেকে একটানা চিৎকার—যাচ্ছে—যাচ্ছে—খুব সাবধান—নিশ্চয়ই কোথাও বসবে—এই কথাগুলো সকলের স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়িয়ে দিচ্ছে! কিন্তু—

কোথাও বসে না সেই ধূর্ত প্রজাপতি। মাঠ জুড়ে গমের শীষগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে শুধু ওড়ে। যখনি যে গমের গাছটির শীষের ওপরে ওড়ে সেইখানেই শিকারী বাঘের মত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় ছেলেরা। কিন্তু—

বৃথা—

গম গাছ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাসে ভাসছে। কিন্তু কোথাও সে বসছে না এক মুহূর্তের জন্য। ছেলেরা দীর্ঘ সেই কাপড় আর তোয়ালে হাতে নিয়ে শিকারী বাঘের মত উড়ন্ত সেই পতঙ্গের পিছু পিছু ঘুরছে—

না বসুক, হেঁকে বলল ম্যাকলিন, ওকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে পশ্চিমদিকে পাঠিয়ে দাও—এদিকে ওকে বসতেই হবে—

হা-হা-হু-হু—ছেলেরা সমবেত গলায় নানারকম শব্দ করে কখনো বা হাততালি বাজিয়ে প্রজাপতিটাকে তাড়া দিতে শুরু করল। সতর্ক হয়ে গেল পশ্চিমদিকের শিকারীর দল। এইবার দেখা গেল সেই পতঙ্গ সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠে গিয়ে পশ্চিমদিকে যেতে শুরু করল।

আসছে—আসছে—এইদিকে আসছে—

হু-র্-রে!—আমাদের হাতেই শয়তান ধরা পড়বে—

সাবধান, দেখবে যেন ফসকে না যায়—তারস্বরে চিৎকার করে ম্যাকলিন, তোমরা বসে পড়ো—বসে পড়ো—

তোমাদের দিকেই যাচ্ছে—লক্ষ্য করো—ওর মুভমেণ্ট—

ওই যে—ওই যে কোণের দিকের গাছটায় বসার চেষ্টা করছে—

উল্লসিত চিৎকারে, হাঁকে ডাকে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল গমের ক্ষেতে।

কিন্তু সে বসল না। বসতে গিয়েও বসছে না। অধৈর্য হয়ে উঠছে ছেলেরা। বেলা বাড়তে লাগল। রোদের তাতে ছেলেদের মাথার চাঁদি ফেটে যাচ্ছে।

শেষপর্যন্ত ওদের কষ্ট দেখেই বুঝি বিধাতার দয়া হলো। একটি গমের শীষের ডগায় যেই বসল সেই প্রজাপতি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিজে তোয়ালে আর কাপড়ের ডাঁই এসে ঝপাঝপ পড়ল তার ওপরে। আকাশ কাঁপিয়ে উল্লসিত ধ্বনি উঠল—ধরা পড়েছে—ধরা পড়েছে—

করতালির প্রচণ্ড শব্দে খুশির উচ্ছ্বাস ভেঙ্গে পড়ল। আনন্দে একেবারে ছেলেমানুষের মত ধেই ধেই করে নাচতে লাগল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ম্যাকলিন। এইবার—এইবার শত্রুর মুণ্ডুচ্ছেদ হবে। তারপরে লেলিহান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে ওর অভিশপ্ত দুটো নীল ডানা। কিন্তু—

কর্মীরা হৈ হৈ করে একবার শত্রুকে দেখবে বলে ভিজে তোয়ালে আর কাপড়ের কারাগারের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তোয়ালেরই কোন ফাঁক দিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালালো সেই নীল প্রজাপতি।

বাজ পড়ল গমের ক্ষেতে। ম্যাকলিন আর ছেলেদের মাথাগুলো যেন খেঁতলে গুঁড়িয়ে গেল। কারো মুখে একটা কথা নেই!

শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল সেই প্রান্তরে। শুধু তীব্র ব্যঙ্গের হাসির হা-হা ধ্বনির মত বাতাস বেজে যেতে লাগল তাদের কানের কাছে।

কারোই নজরে পড়ল না, ঠিক সেই সময়—

সেইসময় যখন কিছুক্ষণের জন্য প্রজাপতিটাকে বন্দী করা হয়েছিল তখন খামারের পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল এক ছায়ামূর্তি। নীল স্কার্ট আর নীল ব্লাউজ পরা সেই বৃদ্ধা দূরে দিগন্তপ্রসারী গমের ক্ষেতের দিকে একবার আগুন ঝরা চোখে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল। তীব্র কোন যন্ত্রনায় আগুনে পোড়া সাপের মত ছটফট করতে করতে এঁকে বেঁকে দুমড়ে হাঁটতে লাগল।

খুক-খুক-খুক—দূরে ক্লাবঘরের বারান্দায় বৃদ্ধদের আড্ডার চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। তারা এতক্ষণ ডাইনীর মন্ত্রপূত প্রজাপতির চরম ও বেদনাদায়ক পরিণতির জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল আর উইচের শাবকের মৃত্যুর পর ভয়াবহ ও অনিবার্য বিপর্যয়ের কথা ভেবেই তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু

সব দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে উড়ে পালিয়েছে অপঘটনার নায়িকা সেই নীল প্রজাপতি—

বুঝলেন মিঃ জেমস, একেই বলে উইচেস ইম্প, বলেই হো হো করে হেসে উঠল ম্যাকফারস্যান। তার অট্টহাসির শব্দ ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল দূরে। হাসির রেশ কমলে গম্ভীর হয়ে আবার বলল ম্যাকফারস্যান, জানেন সারা জীবন ধরে চেষ্টা করলেও ওরা এই প্রজাপতি কখনো ধরতে পারবে না; একটু থেমে আবার চাপা গলায় যেন নিজের মনেই বলল, এরা তো কোন ছার—অত বড় দুঁদে, উইচফাইণ্ডার জেনারেল হপকিনসই* পারে নি ডাইনীর ইম্পকে মারতে—

আকাশে সোনার থালার মত চাঁদ উঠেছিল। জ্যোৎস্নায় চারিদিক দিনমানের মত হয়ে উঠেছিল। সেই চাঁদের আলো গায়ে মেখে মন্থরগতিতে হাঁটছিলেন এক দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তার আগে আগে চলছিল তার প্রিয়-পোষা কুকুর—অতিকায় বাঘের মত চেহারার কালো কুচকুচে গ্রে হাউণ্ড! তার এবং তার কুকুরের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে তাদের দ্রুত অনুসরণ করছিল।

কাছে দূরের জ্যোৎস্নার আলো আঁধারিতে থেকে থেকেই তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন সেই ভদ্রলোক। যদি কোথাও কোন ডাইনীর ইম্প কোন সাদা বিড়াল কি কুকুর বা আর কোন প্রাণী দেখা যায়! কিন্তু—

না। বৃথা—এই হিমঝরা নিশিরাত্রে মরা শকুনের ঘোলা চোখের মত এই জ্যোৎস্নায় কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে না। এই সব ভাবনা যখন তার মনের ভেতরে টালমাটাল করছিল। ঠিক সেই সময়ই ঘটে গেল কাণ্ডটা।

ফিকে জ্যোৎস্নায় তার নজরে পড়ল তার গ্রে হাউণ্ডটা হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে উঠেই বিদ্যুত বেগে ছুটে গেল দূরে ঘন কুয়াশায় অদৃশ্য নিশ্চয়ই কোন জন্তুজানোয়ারের দিকে। কিন্তু কেন যেন যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেই গ্রে হাউণ্ড। ততক্ষণে জোর পায়ে হেঁটে ভদ্রলোকও চলে এসেছে। তিনি দেখলেন, কুয়াশা আর চাঁদের আলোয় ঝাপসা সাদা রঙের কি একটা প্রাণী চুপটি

* ডাইনী নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ অত্যাচারী হপকিনসের ইতিবৃত্ত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই জন্তুটার কাছে থেকে একটু তফাতে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে তার গ্রে হাউণ্ড। আরো কাছে এসে ভদ্রলোক দেখলেন, সাদা ধবধবে একটি বিড়াল ছানা। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, নির্ঘাত ডাইনীর বাহন বা ইম্প।

গ্রে হাউণ্ড তার সামনে গেলই না। জন্তুটির সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল। কিন্তু বিড়াল তার দিকে ভ্রূক্ষেপই করল না। সে সেই বাঘা কুকুরটার চারদিকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। হঠাৎ নাচ থামিয়ে কুকুরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে ধরে তার (গ্রে হাউণ্ডের) কিছু মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার লোক নন। তিনি বিখ্যাত ডাইনী সন্ধানী বিশেষজ্ঞ মাষ্টার উইচফাইণ্ডার জেনারেল ম্যাথ্‌ হপকিনস। এবার তাঁর ওপরে এসেছে সরকারী নির্দেশ—কোন্ কোন্ ডাইনী তাদের ইম্প বা শাবক লেলিয়ে দিয়ে মানুষের ক্ষতি করছে তাদের খোঁজ করে গ্রেপ্তার করতে হবে—অতএব তাঁর গ্রে হাউণ্ড নিয়ে সেই সাদা বিড়ালকে অনুসরণ করে ছুটলেন তিনি। কিছুদূরে যেতেই দেখলেন, একটা স্ট্রবেরী গাছের শুকনো পাতার ওপরে চুপটি করে বসে আছে সেই সাদা বিড়াল ছানা। জলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হপকিনসের মনে হলো, বুঝি এখুনি তার দিকে ছুটে আসবে। কিন্তু জন্তুটা তা করল না।

হপকিনস সুযোগ বুঝে নিঃশব্দে গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে বিড়ালটার পিঠে বসিয়ে দিল এক ঘা! লাগল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠল আর ছুটে পালাতে চেষ্টা করল সেই বিড়াল। হপকিনস আর গ্রে হাউণ্ডটাও ছুটল। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তার কুকুর ফিরে এল। হপকিনসের কাছে এসে থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর ঝড়ের পাখির মত ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগল সে।

কুকুরের ওই অবস্থা দেখে হপকিনসকেও থেমে যেতে হলো। অতবড় দুর্ধর্ষ শিকারী এবং হিংস্র স্বভাবের কুকুর। কিসে এত ভয় পেয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে! রাত্রির এই শেষযামে তিনি কোন দুষ্ট প্রেতাত্মার খপ্পরে পড়েন নি তো। তার বুকের ভেতরটা শির শির করে ওঠে।

কিন্তু চুপ করে থাকলে তো চলবে না। যা হয় হবে। কুকুরটাকে রেখে দিয়ে হপকিনস আবার সেই রহস্যময় বিড়ালটার দিকে যেতে শুরু করল।

কিছু দূরে যেতেই তার নজরে পড়ল আবছায়া অন্ধকারে একটা ঝাপড়া উইলো গাছের নিচে ভূতুড়ে অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ভগ্ন ও জীর্ণ প্রাসাদ। এই বাড়ির গেটের কাছেই প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই সাদা বিড়াল।

আবার মরিয়া হয়ে হপকিনস বিড়ালটাকে একটা ঘা মারতেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল তার জায়গায় ফুটে উঠল একটা সাদা কুকুরের ছবি। কুকুরটির দেহে হলদে লাল গোল গোল দাগ। কুকুরটি বেশ মোটা এবং গোলগাল পৃথুলদেহী। ক্ষিপ্ত হয়ে হপকিনস তার পিঠে বসিয়ে দিল এক ঘা। যন্ত্রণায় মোটা কুকুরটা আর্তনাদ করে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে এল স্ত্রীকণ্ঠের এক বুকফাটা আর্তস্বর। চমকে উঠল হপকিনস। কিন্তু কিছু চিন্তা করার অবসর পেল না। তার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর একটা কুকুর। লম্বা লম্বা পা। গ্রে হাউণ্ডের মত দেখতে। সেই কুকুরটা হপকিনসের বুকের খানিকটা মাংস খুবলে তুলে নিল। তাকে সরিয়ে দিতে না দিতেই তাঁর কাঁধের ওপর লাফিয়ে উঠল মেরু বিড়ালের মত একটা প্রাণী! সে কামড়ে আঁচড়ে রক্তাক্ত করে ফেলল হপকিনসের দেহ। ঠিক সেই মুহূর্তে ওই দুটো কুকুর দুদিক থেকে এসে তার ওপরে যেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অমনি আর্তনাদ করে উঠল হপকিনস —ও-গড !—বলেই তাড়া খাওয়া জন্তুর মত ছুটতে লাগল।

আর মেয়েলী গলার খিলখিল হাসিতে সচকিত হয়ে উঠল শেষ রাতে নির্জন বনভূমি।

পরদিন খুব ভোরে হপকিনস এক বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে সেই পুরানো প্রাসাদ ঘেরাও করল। কড়া নেড়ে ডাকতে হলো না। দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক তরুণী। মনে হয়, প্রাসাদের অধিশ্বরী। তার দীঘল দেহে উদগ্র যৌবনের রূঢ় পরিপুষ্টি। অপূর্ব সুন্দরী সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় রুক্ষ সেই সৌন্দর্য।

কি চাই আপনাদের? নেশার ঘোরে টলমলে শরীরটাকে কোনরকমে সামলে নিয়ে বলল সেই যুবতী।

নাম কি আপনার?

কোন কথা বলল না সে। কেমন একটা গভীর আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে রইল। পুলিশ অফিসার আবার কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, আপনি কথা বলছেন না কেন—

আপনার নাম বলুন—

এলিজাবেথ ক্লার্ক—

এই বাড়ি আপনার ?

হ্যাঁ—

আচ্ছা, সাদা একটা বিড়ালছানা, গোলগাল মোটাসোটা একটা কুকুর, আর মেরু বিড়ালের মত দেখতে একটা বিড়াল আপনার ?

হ্যাঁ।

আপনি ডাইনী ? এরা আপনার ইম্প—সত্যি কথা বলবেন ?

এবারে একটা কথাও বলল না এলিজাবেথ। শুধু মাথা নীচু করে কে জানে কিসের এত চিন্তার ভেতরে ডুবে রইল। আর নেশারক্ত চোখদুটোর দৃষ্টি ক্রমশঃ গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।

কি হলো ? কথা বলছেন না কেন ?

কি বলবো বলুন, অস্ফুটস্বরে বলল এলিজাবেথ, ওই জন্তু জানোয়ারগুলো আমার সন্তান—আমি ওদের বুকে পিঠে করে বড় করেছি।

ওরা তাহলে আপনার ইম্প—চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উইচ ফাইণ্ডার জেনারেল ম্যাথু হপকিনস, আপনি স্বীকার করছেন—আপনি ডাইনী ?

দেখুন—ডাইনী কি না বলতে পারবো না। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলল এলিজাবেথ, তবে এইটুকু বলতে পারবো, ওই কুকুর বিড়াল—ওরা আমারই দেহের এক একটি অংশ।

মানে ?

মানে, এই দেখুন, এলিজাবেথ বলেই পিঠের নিচে জামা তুলে দেখিয়ে দিল, আড়াআড়ি একটা কালশিরের দাগ। অস্ফুটস্বরে বলল, কাল রাত্রে, মনে হয় ওই ভদ্রলোক (হপকিনস) আমার বাহন—একটা মোটাসোটা গোলগাল কুকুর টম ভিনেগারকে লাঠি দিয়ে মেরেছিল তার পিঠে, সেই আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠেছে আমার পিঠে—

কোন কথা নেই পুলিশ অফিসারের মুখে। অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে রহস্যময়ী ডাইনী এলিজাবেথের দিকে। বিস্ময়ের কুয়াশায় তার চোখদুটো ছটফট করে। হপকিনসের কানের কাছে বেজে ওঠে বিগত রাত্রির সেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

আপনারা কোন কথা বলছেন না কেন ? মুখ টিপে টিপে হাসে এলিজাবেথ। বিনম্রকণ্ঠে বলে, আর কি জানতে চান বলুন—

কতগুলো জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে আপনার দেহ মন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা,

হপকিনস বলল, আমি তো এই রহস্যই বুঝতে পারছি না ম্যাডাম—

আপনাকে আমি চিনি, থেমে থেমে কটু গলায় বলল এলিজাবেথ আপনি বহু নিরপরাধ মেয়েকে ডাইনী সন্দেহ করে তাদের সর্বনাশ করেছেন—একটিও প্রকৃত ডাইনীর সন্ধান কখনও পান নি।

মিঃ হপকিনসের প্রসঙ্গ ছাড়ুন, পুলিশ অফিসার আদেশের সুরে বলল, আপনার বাহনদের রহস্যটা বুঝিয়ে বলুন ম্যাডাম—

কি করে আপনাকে বোঝাবো স্যার, খুব ক্লান্ত এবং করুণ কণ্ঠে যেন অনেক—অনেকদূর থেকে আস্তে আস্তে বলল এলিজাবেথ, ডাইনীবিদ্যা আমার সুদীর্ঘকালের সাধনা! থামল সে। আবার মৃদুকণ্ঠে বলল, যারা গুপ্তবিদ্যা বা ডাইনীতন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেছে এমন যাদুকর বা ডাইনীদের থাকে দুটো আত্মা। কুকুর বা বিড়াল কিম্বা অন্য কোন প্রাণীর রূপ দিয়ে তারা তাদের দ্বিতীয় আত্মাকে পাঠিয়ে দেয় হিংসা এবং দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে। আর নিজে কিন্তু মানুষের রূপ নিয়ে বাড়িতেই থাকে।

আশ্চর্য তো! অস্ফুটস্বরে বলল পুলিশ অফিসার।

এ পর্যন্ত কতগুলো গরু, মোষ এবং মানুষ হত্যা করেছেন। ঝাঁঝালো গলায় বলে হপকিনস।

হত্যা? আমি! ব্যঙ্গের একটুকরো ধারালো হাসি জ্বলজ্বল করে এলিজাবেথের ঠোঁটে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে আমি গরু, মোষ এবং মানুষ হত্যা করেছি—এমন কথা কেউ বলেছে নাকি মিঃ হপপিনস?

হপকিনস কথা বলে না। এলিজাবেথ খর চোখে হপকিনসের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি কাল রাত্রে আমার কুকুরটাকে মেরেছিলেন—

আর একটু বাড়াবাড়ি করলেই আপনাকে আর ফিরে যেতে হতো না—

আপনি তো গুপ্তবিদ্যায় সিদ্ধ ডাইনী পুলিশ অফিসার বলল, অনায়াসেই দারুণ ক্ষতি করতে পারেন মানুষের—এতদিন করেন নি কেন?

দেখুন স্যার, বিদ্যা আয়ত্তে থাকলেই যখন তখন তার প্রয়োগ করতে নেই। এলিজাবেথ বলে, আর আমরা যারা ইম্প নিয়ে নাড়াচাড়া করি তাদের খুব সাবধানে থাকতে হয়—

কেন?

বাহন বা শবকের পরমায়ু ডাইনীর আয়ুর সঙ্গে অটুট বন্ধনে বাঁধা থাকে বলল, এমন কি দেখেছেন তো, ইম্পদের দেহের কোথাও আঘাত লাগলে ডাইনীও তার দেহের অবিকল সেই জায়গায় আঘাত পায়। বাহনের মৃত্যু হলে

ডাইনীরও অনিবার্যভাবেই মৃত্যু হয়, একটু থেমে আবার বলল, অনেকেই ডাইনী আর তার শাবকদের একসঙ্গে অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়—আর একটা কথাও বলল না এলিজাবেথ। মাথা নীচু করে বসে রইল।

যদিও অত্যন্ত ভদ্র এবং অভিজাত। কথাবার্তাও খুব ডিগনিফায়েড—প্রাথমিক রিপোর্টে (প্রিলিমিনারী রিপোর্ট) লিখল পুলিশ অফিসার, তবুও কুমারী এলিজাবেথ ক্লার্ক নিজে ডাইনী বলে স্বীকার করেছেন। আর সাধনায় সিদ্ধ যাদুকরীর মত কুকুর কি বিড়ালের রূপ দিয়ে তার দ্বিতীয় আত্মাকে নিয়মিত বাইরে পাঠিয়ে থাকেন—অতএব এই ধরনের স্ত্রীলোক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি ডাইনী এবং গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী—শুধু এই অপরাধেই তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে—

চেমসফোর্ড এসেক্সের আদালতে এলিজাবেথ ক্লার্কের মামলা উঠেছিল। বিচারে তার একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। মামলার রায় বেরিয়েছিল—

২৯ শে জুলাই, ১৬৪৫!

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গিয়েছিল ম্যাকফারসান। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে আবার বলেছিল, শোনা যায়, উইচফাইণ্ডার জেনারেল সেই হপকিনস সাহেব নাকি এই ঘটনায় এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে আর কখনও কোন ডাইনী কি তার ইম্পের পিছনে লাগতে যান নি, বলেই খিক খিক করে হাসল সে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সেই কথায় বলে না—হাতী ঘোড়া হল তল—মশা বলে কত জল।

যত হাসি ঠাট্টাই করুক বৃদ্ধরা, ছেলেরা কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতে দ্বিগুণ উৎসাহে মাঠে নেমে পড়ল। যেমন করেই হোক ধরতেই হবে সেই নীল প্রজাপতিকে। রক্ষা করতে হবে তাদের বহু পরিশ্রম, রক্ত আর ঘাম দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা এই খামারকে।

তবে এবার ম্যাকলিনের নেতৃত্বে প্রজাপতি শিকারের এই অভিযানে একটু অভিনবত্ব আছে। প্রতিটি ছেলের পরণে সবুজ পোশাক। তাদের হাতের ভিজে তোয়ালের রঙ সবুজ। সবুজ রঙের বড় কাপড়। বিস্তীর্ণ গমের ক্ষেতের অফুরন্ত সবুজ বিস্তারের সঙ্গে যেন মিশে একাকার হয়ে আত্মগোপন করে

থাকতে পারে। জন্মশত্রু সেই প্রজাপতি যেন বুঝতে না পারে তারই অনিবার্য মৃত্যুর নিশানা নিয়ে শিকারীরা ওৎ পেতে রয়েছে।

বেলা বাড়ে। ছেলেরা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কখন কখন আসবে ডানা মেলে সেই ভয়ানক অভিশাপ। সূর্য ওঠার পর পরই তো সে আসে—আজ কি হলো? তবে কি তাকে ধরার এই চক্রান্ত সে জেনে ফেলেছে।

অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে ছেলেরা। রণনিপুণ সৈনিকের নিষ্ঠায় তাদের অস্ত্র সেই তোয়ালে আর কাপড় হাতে নিয়ে এক একটি পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষেতের আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছে ম্যাকলিন—কেউ নড়বে না—খবরদার অন্যমনস্ক হবে না—যে কোন সময় এসে পড়বে—

আর তোমার এসেছে! চাপা বিষাক্ত গলায় বলল অ্যাকাউন্টেন্ট, এ যে কী দারুণ সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ফার্মকে, বলেই হঠাৎ কি একটা মনে পড়েছে এমন করে বলল, আপনারা একটু দাঁড়ান তো—আমি এখুনি আসছি—কে জানে কিসের যেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে খামারের এলাকা ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

রোদ জ্বলা ধুসর আকাশ থেকে তাপ ছড়ায়। সেই তাপ আর রোদ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিকারীরা। হঠাৎ তাদের বুকের ভেতরে আছড়ে পড়ল রক্তের কলোচ্ছ্বাস! পুবের আকাশে দেখা গেল একটা নীল বিন্দু—নীল একটা তারার মতই ছুটে আসছে।

আসছে—আসছে রে—শিকারীদের চাপাগলায় উচ্ছ্বাসের একটা ঝড় উঠল। এই চুপ—কেউ একটা কথা বলবে না—সতর্ক করে দিল ম্যাকলিন।

ক্ষেতের অনেক—অনেক ওপরে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে সেই প্রজাপতি। একটুও নিচে নামছে না। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে ম্যাকলিন অস্ফুট স্বরে বলল—ঘোর কতক্ষণ আর ঘুরবি। তোমাকে নামতেই হবে।

যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরে এল অ্যাকাউন্টেন্ট। উল্লসিত কণ্ঠে বলল, এই যে এই দেখুন আপনাদের ফার্মের মৃত্যুবাণ, বলেই প্যান্টের বাঁদিকের পকেট থেকে বাঁহাতে একটা নোংরা নীল রুমাল বের করে বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

জেমস, ম্যাকফারসান প্রমুখরা দেখল, রুমালটা শুধু নোংরা নয়—কেমন ভিজে ভিজেও।

কি ব্যাপার—আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না অ্যাকাউন্টেণ্ট সাহেব আমতা আমতা করে বলল জেমস।

দেখুন আপনাদের মত আমারও অনেকদিন ধরে মনে হচ্ছে—আমাদের খামারে ওই নীল প্রজাপতির নিয়মিত আনাগোনার আড়ালে আছে কোন দুষ্ট ডাইনীর চক্রান্ত—একটু থামল অ্যাকাউন্টেণ্ট। আবার নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বলল, আজই কেন যেন মনে হলো, ওই প্রজাপতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই ডাইনী আসে। তাই আমি ছুটে বাইরে গিয়ে দেখি—আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই···

কি দেখলেন?

ওই যে নিচে নামছে রে নি-চে-না-ম-ছে-তীব্র একটা উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল ছেলেদের ভেতরে। তীক্ষ্ণ চাপাগলায় চিৎকার করে বলল ম্যাকলিন···খুব সাবধান—এবার ধরা চাই···

আরো-আরো নিচে নেমে এল সেই প্রজাপতি। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল ম্যাকলিন। দুহাতে বুক চেপে ধরে·· উবু হয়ে বসে চাপাগলায় বলল···এখুনি তোয়ালে কি কাপড় ফেলবে না···আগে ওকে স্থির হয়ে বসতে দাও।

তার কথা শেষ হতে না হতেই আবার ছেলেদের ভেতর থেকে রব উঠল —ওই যে বসেছে—বসেছে রে—ক্ষেতের ওইদিকে গমের শীষের ওপরে—বসেছে—

সঙ্গে সঙ্গে ঝপা ঝপ ভিজে তোয়ালে আর কাপড়ের ঝাঁক এসে পড়ল প্রজাপতির ওপরে। অতি উৎসাহী একজন বুঝি প্রজাপতির ওপরে স্তূপাকৃতি হয়ে ওঠা তোয়ালের সবচেয়ে নিচের তোয়ালেটা দু'হাতে পেঁচিয়ে গোল করে ফেলল যাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শত্রু পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধবিজয়ের কলরব উঠল শিকারীদের ভেতরে—মরেছে—প্রজাপতিটা মরেছে—তাদের উল্লাসের উচ্চকিত ধ্বনি ফাঁকা মাঠের শাঁ শাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে চলে গেল দূরে ক্ষেতের শেষপ্রান্তে। কিন্তু—

গোল করে প্যাঁচানো সেই তোয়ালের ফাঁদ খুলতেই শিকারীদের হাস্যোজ্জ্বল উদ্দীপ্ত মুখে অন্ধকার নেমে এল। শত্রু নেই। পালিয়েছে। শুধু তার নীল

ডানায় কিছু ভগ্নাংশ লেপটে রয়েছে সবুজ তোয়ালের গায়ে। শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল গমের ক্ষেতে।

ওরা যে কি সর্বোনেশে নেশায় মেতে উঠেছে, সহানুভূতির সুরে বলল জেমস। বৃদ্ধরা কেউই এবার হাসিমস্করা কি ঠাট্টা তামাসা করল না। গভীর সমবেদনার ছায়া ফুটে উঠল তাদের চোখেমুখে।

ওরা যে কোনদিনই প্রজাপতিটাকে মারতে পারবে না—তার প্রমাণ তো আজ পেলাম, আস্তে আস্তে বলল অ্যাকাউন্টেণ্ট, আমি ফার্মের বাউণ্ডারীর বাইরে যেতে দেখি প্রাচীরের দেওয়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে এক বুড়ি— একটু থেমে আবার বলল তার গায়ে নীল ব্লাউজ পরণে নীল স্কার্ট।—

হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—ওই বুড়ি প্রায়ই আমাদের খামারের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়—ম্যাকফারসান বলল।

আমাকে দেখেই একটা আশ্চর্য কাণ্ড করল সেই বুড়ি—

কি? কি?

এই নীল রুমালটার একবার গন্ধ শুঁকেই ফার্মের প্রাচীরের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চোখের পলকে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল আর দেখতে পেলাম না—

নীল রুমালের সঙ্গে প্রজাপতির কি যোগাযোগ?

তাহলে শুনুন একটা ঘটনা বলি। তাহলেই বুঝতে পারবেন ডাইনীর রুমাল কী ভয়ানক সর্বনাশ করতে পারে, অ্যাকাউন্টেণ্ট একটু থামল। আবার বলতে শুরু করল—খুব ধীরে ধীরে—

অনেক—অনেকদিন আগে বেলভয়েরে বাস করতো দুই ডাইনী। দুই যুবতী। মার্গারেট আর ফ্লাওয়ার ফিলিপ। ওরা দুইজন কাউণ্ট অফ রাটল্যাণ্ডের প্রাসাদের দূর কোণে বাস করতো। কাউণ্ট বা কাউণ্টেস ঘুণাক্ষরেও জানতেন না—ওরা খুব গোপনে ডাইনীবিদ্যার অনুশীলন করে, এই পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন অ্যাকাউন্টেণ্ট।

তারপর? শ্রোতারা উৎসুক হয়ে ওঠে।

কোন কারণে বুঝি কাউণ্টেস ওদের ওপরে বিরূপ হয়েছিল। কয়েকদিন পরে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিল! ডাইনীরা আক্রোশে সাপিনীর মত ফুসতে লাগল।

ওরা জানতো কাউণ্ট দম্পতি নিঃসন্তান বলে তাদের গভীর ব্যথা আছে। অতএব আঘাতটা করতে হবে ব্যথার জায়গাতেই।

ডাইনী মার্গারেট আর ফ্লাওয়ার অনেক কৌশল করে কাউণ্টসের একটা পুরানো গ্লাভস জোগাড় করল। এক গামলা গরমজলে চুবিয়ে দিল সেই দস্তানা। তার সঙ্গে মিশিয়ে দিল কিছু রক্ত। তারপর গামলাটাকে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল কিছুক্ষণ ধরে—এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল অ্যাকাউণ্টেণ্ট। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার পরিশ্রমে হাঁফাতে লাগল।

তারপর ?

তারপর আর কি, রক্ত মেশানো গরমজলের ভেতর থেকে দস্তানাটা তুলে নিয়ে মার্গারেট বিড় বিড় করে, কে জানে কিসের মন্ত্র পড়তে লাগল। মন্ত্র বলা শেষ হলে সেই দস্তানাটা তার ইম্প—একটা সাদা বিড়াল —রাটারকিনের পিঠে ঘসে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল সে—যাও—দেখবে কাউণ্টসের সন্তান না হয়—একটু থেমে অ্যাকাউণ্টেণ্ট যেন কি চিন্তা করল। আবার বলল, রাটারকিন মুখে করে সেই মন্ত্রপূত দস্তানাটা নিয়ে কাউণ্টের বিশাল প্রাসাদের কোন কোণে ফেলে রেখেছিল।

আর কাউণ্টেস কখনো সন্তানের মুখ দেখতে পান নি—গাঢ় স্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল ক্লাবঘর। নীরবতা ভঙ্গ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলল ম্যাকফারসন, মানুষের ক্ষতি করার কী অপরিসীম ক্ষমতা ওদের—

বৃদ্ধরা সেই নীল রুমাল নিয়ে গিয়ে ডিরেক্টারকে দেখিয়ে দিল। নীল স্কার্ট পরা বুড়ির রহস্যময় চালচলনের কথাও বলল। সব শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। বললেন, আগে প্রজাপতি ধরা পড়ুক তো—পরের ব্যবস্থা পরে হবে—

পরদিন খুব সকালে সবুজ পোষাক পরে শিকারীর দল মাঠের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের চোখে মুখে জ্বলজ্বল করছে দুর্জয় একটা প্রতিজ্ঞার আভাস। তাদের পেশীতে পেশীতে আলোড়িত হয়ে উঠছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। এইবার ম্যাকলিন শিকারীর সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। চারদিকে মাত্র দুইজন করে খুব শক্তসমর্থ জওয়ান কর্মী। তাদের হাতে ভিজে তোয়ালে আর কাপড়।

সকালের সোনার মত রোদ ছড়িয়ে পড়ল গমের ক্ষেতে। আর বাতাসে ডানা মেলে দিয়ে এল সেই নীল প্রজাপতি। তীব্র উত্তেজনায় ভেঙে পড়ছে শিকারীদের বুক। নিষেধ করা সত্ত্বেও একজন চেঁচিয়ে বলল প্রজাপতি এসেছে রে এসেছে—

এই ও—চুপ, বাঘের মত গর্জন করে উঠল ম্যাকলিন। আবার প্রশান্ত

স্তব্ধতা নেমে এল সেই প্রান্তরে। শিকারীদের প্রত্যেকের দৃষ্টি উড়ন্ত সেই প্রজাপতির দিকে স্থিরনিবদ্ধ।

ধীরে ধীরে নেমে আসছে সেই ধূর্ত প্রজাপতি। আসছে শস্যসম্ভারের ওপরে অভিশাপের বিষ ছড়িয়ে দিতে। শিকারীদের ভেতরে চাপা উত্তেজনার ঝড় বয়ে চলেছে। কে একজন ফিস ফিস করে বলল, এইবার—এইবার বসবে রে—

এই—চুপ কর—বিষাক্ত গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল ম্যাকলিন। সঙ্গে সঙ্গে বেশ নিশ্চিন্তে সেই প্রজাপতি এসে বসল ক্ষেতের বাঁদিকে একটি পুষ্ট গমের শীষের ওপরে। বাতাসে দুলছে সেই শীষ। সেই সঙ্গে দুলছে সেই প্রজাপতি।

হঠাৎ বিদ্যুত বেগে তার ওপর ঝপা ঝপ পড়ল ভিজে তোয়ালে আর কাপড়ের ডাঁই। ম্যাকলিন ঝড়ের বেগে এসে সবচেয়ে নিচের তোয়ালে দুহাতে ধরে টিপে টিপে কচলাতে লাগল মর্মান্তিক আক্রোশে। খোলা হলো তোয়ালে—

হু—র্—রে!—আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠল।

তোয়ালের গায়ে পিষে রয়েছে খামারের কর্মীদের অনেক বিনিদ্র রাত্রির দুশ্চিন্তা—অনেক ক্ষোভ আর যন্ত্রণার সেই পতঙ্গ! মথ জাতীয় অনেক বড় প্রজাপতি। তার ঘন নীল ডানার জরির মত সোনালী ফুটকি! হুমড়ি খেয়ে পড়ে কর্মীরা দেখতে লাগল তাদের অভিশাপকে। এল বৃদ্ধ জেমস—ম্যাকফারশন এবং অ্যাকাউন্টেণ্ট প্রমুখরাও!

না। বাজ পড়ল না। নেমে এল না আকাশ থেকে আগুনের বৃষ্টি। ডাইনীর শাবক, সেই প্রজাপতিকে হত্যার ফলে ঝড়—বজ্র—বিদ্যুতে পৃথিবী রসাতলেও গেল না। কিন্তু—

ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। খামারের প্রাচীরের বাইরে নারীকণ্ঠের তীব্র ও করুণ আর্তনাদ শোনা গেল। কর্মীরা ছুটে গিয়ে দেখল নীল স্কার্ট আর নীল ব্লাউজ পরা সেই বুড়ি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে! দেখতে দেখতে তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল ঊর্দ্ধমুখী। থেমে গেল তার হৃদস্পন্দন!

নীল প্রজাপতি আর খামারের ইতিবৃত্ত বলে পশুপাখি এবং ডাইনীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ফ্র্যাঙ্ক হ্যামেল জানিয়েছেন—নির্ভুলভাবে ডবল অ্যাকশান হয়েছিল —After the double event there was no further trouble in that firm···

· · ·

বলা দরকার ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক হ্যামেল শুধু ডাইনীদের ইম্প বা শাবক বিশেষজ্ঞই

নন। তিনি ডাইনীদের পশুপাখিতে রূপান্তরিত হওয়া, উন্মাদ হয়ে গিয়ে নিজেকে জানোয়ার ভেবে জন্তুর মত আচরণ করা এবং কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে পশুর মত ডাকা—অর্থাৎ এক কথায় লিক্যানথ্রপির মস্ত পণ্ডিত। লিক্যানথ্রপি শব্দটির জন্ম হয়েছে গ্রীক শব্দ লুকানথ্রপিয়া থেকে। লুকুস অর্থাৎ উলফ বা নেকড়ে বাঘ আর অ্যানথ্রপোজ অর্থে মানুষ। এই অ্যানথ্রপোজ আর লুকুস নিয়ে হয়েছে লিক্যানথ্রপিয়া!

ডক্টর হ্যামেল দেশ দেশান্তরে ঘুরে ডাইনী এবং তাদের শাবকদের সঙ্গে সম্বন্ধে নিয়ে গবেষনা করেছেন সুদীর্ঘ তিনদশক ধরে। 'ফ্যামিলিয়ার' বা ডাইনীরদের শাবক—তাঁর বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সেই বই থেকেই বলা হলো এই ঘটনাটি—

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৬৪৫,

একটি তরুণীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। দুদিকে দুই পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে তাকে জেরা করতে শুরু করল। জেরার উত্তরে সেই যুবতী যা বলেছিল তার সারাংশ এখানে দেওয়া হলো—

মাস তিনেক আগে সে তার বিছানায় পরম নিশ্চিন্তে আরামের ঘুমে তলিয়েছিল; রাত তখন বারোটা হবে। হঠাৎ তার মনে হলো তার বুকের ওপরে খুব নরম কি একটা নড়াচড়া করছে। ভয় পেয়ে সে জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে। কেন যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হলো যেন পরম করুণাময় ঈশ্বরকেই দূরে নিক্ষেপ করল সে।

এইরকম অদ্ভুত ধারনা করার কারণ?

কারণ—তারপর থেকে আমি আর অখণ্ড ও নিবিড় মনযোগে প্রার্থনা করতে পারছি না। থেমে থেমে সে আরও বলেছিল—কেন যেন আমার মনে হতো—যাকে ছুঁড়ে ফেলেছি—সে ছিল জীবন্ত কোন প্রাণী—

পরদিন আবার জেরা শুরু হয়েছিল। জেরার উত্তরে সে বলেছিল, সেদিন কালো লোমে আচ্ছন্ন কুকুরের ছদ্মবেশে তার কাছে এসেছিল শয়তান! তারপর থেকে প্রায় প্রতি রাত্রেই সে আসে। নিঃশব্দে তার বিছানায় প্রবেশ করে শয্যাসঙ্গী হয়ে যায়। তার সঙ্গে মিষ্টি এবং মৃদু গলায় কথা বলে। শয়তান প্রতিদিনই তাকে অনুরোধ করে বলতো,—যীশুকে পরিত্যাগ করে তাকে ভজনা করতে······

ডেভিলের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে—এই অপরাধে তার একবছরের

সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। তরুণীর নাম—জন কার্ডিণ!

ডক্টর হ্যামেলের ডায়েরীতে আছে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা।

শেষরাতের আকাশে রাশি রাশি তারার দীপালি জ্বলছে। জনমানবহীন রাস্তার ধারে একটি ঘরে জোরালো আলো জ্বলছে।

নৈশপ্রহরীদের অধিনায়ক নিকোলাস ল্যামবার্টের কেমন সন্দেহ হলো। জানালা দিয়ে তাকাতেই তার নজরে পড়ল আলোকোজ্জ্বল ঘরের মাঝখানে একটি সোফায় বসে আছে তরুণী। তরুণী উদ্ভিন্নযৌবনা। জানালার দিক মুখ করে দুহাতে বই ধরে নিবিড় মনযোগে পড়ছে। বইয়ের আড়ালে যে মুখখানা ঢাকা পড়েছে তার সৌন্দর্যও হবে অপরিসীম।

হাবিলদার আশ্চর্য হয়ে দেখল, একটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, চকচকে একটা রূপালী মাছি মহিলার মাথার চুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে বোঁ বোঁ করে তার মাথার ওপরে উড়তে লাগল। মাছিটি প্রায় এক ইঞ্চি মত লম্বা। কিছুক্ষণ পর মাছিটা চিমনীর ভেতর দিয়ে উড়ে চলে গেল। কিন্তু—

মিনিট পনের পরই আবার এল দু-দুটো মাছি। এরা আকৃতিতে ছোট। মাত্র আধ ইঞ্চি লম্বা। কালো কুচকুচে তাদের রং। এইবার তরুণী কি একটা অসহ্য আবেগে আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার গায়ের রঙও ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে দুধে আলতা রঙ কেমন কালো হয়ে উঠল। তার মাথার চুলগুলোও খাড়া খাড়া হয়ে উঠল। তীব্র কোন যন্ত্রণায় সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

এই ভদ্রমহিলার নাম—এলিজাবেথ স্টাইলি। পরে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছিল—এই মাছিগুলো তার ইম্প বা শাবক! শাবকরা আসার সময় কখনো কখনো ডাইনীকে বিপর্যস্ত করে দেয়—

ডাইনীর সঙ্গে তার শাবকদের কতরকমের বিচিত্র সম্বন্ধই যে আছে!

গুপ্তবিদ্যার এই কুশীলবের নাম—অ্যালিশ ডিউক। ডাকনাম—ম্যানিং। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছিল তার ইম্প নাকি—ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় বিড়ালের রূপ ধরে আসে। আর এসেই তার বুকের দুধ খেতে শুরু করে। যতক্ষণ তার শাবক খেতে থাকে ততক্ষণ তীব্র নেশার মিষ্টি মৌতাতের মত একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে থাকে সে।

ক্যাম্পাডিওনিসের এক যুবক খুব দ্রুত বিস্তীর্ণ অরণ্য অতিক্রম করছিল। উদ্দেশ্য সন্ধ্যাবেলাটা বন্ধুর বাড়িতে বেশ হুল্লোড় করে কাটাবে!

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল। বনের গাছপালার নিচে অন্ধকার আরো ঘন এবং আরো জমাট হয়ে উঠেছিল। সে যেতে যেতে রাস্তায় পড়ল একটি নালা। নালাটা লাফ দিয়ে পেরোতে যেতেই তার ঘাড়ের ওপরে ধপাস করে কি একটা পড়ল। তাকিয়ে দেখে, তার ঘাড়ের ওপরে বসে রয়েছে বানরের মত দেখতে একটা জন্তু। সে যেতে যেতে—জন্তুটাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে ঘাড় থেকে নামাতে চাইল। কিন্তু পারল না।

যুবক এবার মরিয়া হয়ে দুহাতে টেনে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে নামিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। জন্তুটির পাগুলো দুমড়ে দিয়ে গলা টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সে মরার মত মাটিতে পড়ে রইল। যুবকটি নিশ্চিন্ত হলো। তখুনি তার মনে এল লোভ—এই দৈত্যের চেহারাটা বন্ধুর বাড়ির সবাইকে দেখানোর। তখন একেবার জোরালো মোমের আলোয় ওর চেহারাটাও দেখে নেবে।

তার কাছে যেতেই জন্তুটা আবার তড়াক করে যুবকের ঘাড়ে উঠে বসে জানিয়ে দিল—সে মরেনি! আর কোন বাধা না দিয়ে কোন প্রতিবাদ না করে সে তাকে নিয়ে এসে পৌছল বন্ধুর বাড়ি!

আরে—! তোর ঘাড়ে ওটা কি? বন্ধু প্রশ্ন করে। বলেই বাতিদান তুলে ধরল জন্তুটার মুখের দিকে। কিছুটা বানর আর গরিলার সংমিশ্রনে সৃষ্টি বিচিত্র একটা প্রাণী।

আমার মনে হয়, আগন্তুক যুবকটি বলল কোন যাদুকর জন্তুর রূপ ধরে আমার ঘাড়ে বসেছে—

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই, বন্ধু বলে।

এখুনি সব বুঝতে পারবে—জন্তুটাকে চুল্লীর আগুনের ভেতরে দেবো—তাহলেই জানতে পারবো—প্রাণীটার স্বরূপ কি।

সেই ঘরেরই এক কোণে সোফায় বসা গৃহকর্ত্রী, কে জানে কিসের যন্ত্রণায় এঁকে বেঁকে দুমড়ে দুমড়ে উঠতে লাগল। হাত দুটো মুঠো করে কাঁপতে লাগল থর থর করে। তার হাত থেকে উলের কাঁটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

কি হয়েছে তোমার? সদ্য আগত যুবকের বন্ধু—এই বাড়ির একমাত্র ছেলে বলল তার মা-কে।

কিছু না—আমার শরীরটা একটু খারাপ লাগছে বাবা, বলে সেই ভদ্রমহিলা বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল। আর

কেমন উদাস আর করুণ চোখে জন্তুটার দিকে তাকিয়ে রইল।

দুই বন্ধু কিছুক্ষণ খুব নীচু গলায় আলোচনা করে নিয়ে ফেলল সেই ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা সিদ্ধান্ত—জলন্ত আগুনের চিমনীর ভেতরে নিক্ষেপ করবে ওই জন্তুটা!

তাদের সিদ্ধান্ত কানে যেতেই সোফা থেকে তীরের মত সোজা উঠে দাঁড়ালো ভদ্রমহিলা। থর থর করে কাঁপছে সে।

তার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করল না সেই দুই বন্ধু। কিন্তু সেই জানোয়ারের পা দুটো ধরে শূন্যে দু'একবার দোল দিয়েই গনগনে জলন্ত আগুনের লাল চিমনির মধ্যে যেই নিক্ষেপ করল, অমনি দুহাতে বুক চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন বাড়ির গৃহকর্ত্রী।

কি হয়েছে—তুমি অমন করে আর্তনাদ করে উঠলে কেন? ছেলে বিস্মিত হয়ে মা-কে প্রশ্ন করে।

কি আর বলবো বাবা, আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে বলল, সেই মহিলা, আমি আমিই বানর আর গরিলার মাঝামাঝি একটা প্রাণীর রূপ ধরে বনের ভেতরে ঘুরছিলাম। তোর বন্ধু ছেলেটি দেখতে প্রায় তোর মত বলেই হয়তো আমাকে আকর্ষণ করল—একটু থেমে আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, The youngman captured her double···অর্থাৎ যুবক ডাইনীর দুটো আত্মাকেই বন্দী করেছে—

এই ডাইনীর মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল কিনা কিম্বা কারো ক্ষতি করেছে কিনা জানা যায় না।

ডক্টর ফ্রাঙ্ক হ্যামেল আরও জানিয়েছেন, ডাইনী বা যাদুকরীদের সঙ্গে জন্তুজানোয়ারের সম্বন্ধ প্রায় অচ্ছেদ্য। তাদের ভেতরে এমন অনেক অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে, বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না।

পরিশেষে বলেছেন হ্যামেল, ফ্যামিলিয়ার বা শাবকরা যে সবসময় মানুষের অকল্যাণই করে তা নয়। ফ্যামিলিয়ারদের ভেতরে সব উন্নত ও মহিমান্বিত স্পিরিট বা আত্মা হলো—ডেমন বা দৈত্য এবং প্রতিভা (জিনিয়াস)। প্রাচীন পৃথিবীর মানুষদের বিশ্বাস ছিল সমগ্র মানবজাতির বহু বৈচিত্র্যময় কর্মযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক হলো প্রতিভা। মানুষের ভাল ও মন্দ দুই স্পিরিটই থাকে কর্মমুখর। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে মানবমনীষার আদিগুরু অ্যারিষ্টোটলের স্পিরিট বা প্রতিভা সর্বদা তাঁকে গূঢ় তথ্য জানাতো এবং আপদবিপদ ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করতো।

উনিশ

আফ্রিকার টটসাভানির সঙ্গে কোন পার্থক্যই নেই এই উপমহাদেশের ডাইনী—বালুরঘাটের সেই 'ভৈরবী'—সেই রহস্যময়ী স্ত্রীলোকটির—কোন পার্থক্যই নেই বাঁকুড়ার সেই বৃদ্ধা ধানীবালা কিসকুর—

দেশ-কালের ব্যবধান এড়িয়ে যুগ-যুগান্তর থেকে অশুভ এবং অমঙ্গলের প্রতীক এই ডাইনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস নদীর স্রোতের মত প্রবহমান।

এই তো সেদিন (৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩) ডাইনীবিদ্যার মালমশলা খুঁজতে গিয়েছিলাম পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে। শুনলাম, শহরের উপকণ্ঠে খাদিমপুরে নাকি এক পিশাচসিদ্ধ ডাইনী আছে।

আত্রাই নদীর পাড়ে খাদিমপুর শ্মশান। বর্ষার দিনে যাতে চিতা সাজাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য সারি সারি গোটা চারেক লোহার ফ্রেম করা আছে—সেসব ছাড়িয়ে এক বুড়ো ঝাপড়া বটগাছের নিচে একটি কুঁড়েঘর। কিন্তু তার ভেতরে যেতেই থমকে গেলাম।

কোথায় ডাইনী? মাঝবয়সী সাধাসিধে এক মহিলা। পরণে জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া আধময়লা থান। গরিবঘরের হিন্দু ঘরের নিরীহ এক বিধবার মত।

আপনি ডাইনীবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু যদি বলেন অনুগ্রহ—আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো। গলা চিরে ককিয়ে চিৎকার করে বলল—না—না—ওসব কিছু জানি না—জানি না। কেন আপনারা আমাকে বিরক্ত করতে আসেন? তীব্র যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখখানা।

চলে আসুন—ও কিছু বলবে না, আমার সঙ্গী, স্থানীয় ছেলে প্রভাস হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা উত্তেজিত গলায় ফিস ফিস করে বলল, এখন সতী হয়েছে—হুঁ—এখনও প্রত্যেকদিন থানায় হাজিরা দিতে হয় কেন?

পুলিশ রেকরডে জেনেছিলাম তাঁর বিচিত্র বৃত্তান্ত:

দেশ ভাগের কয়েক বছর পরে কাঁটাবাড়ি থেকে এসেছিল এই রহস্যময়

স্ত্রীলোক। চূড়ো করে চুল বাঁধা। তাতে জড়ানো জবাফুলের মালা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। নিজেকে ভৈরবী পরিচয় দিয়ে ডেরা করল নদীর ওপারে আঁখিয়াপাড়ার শীতলা মন্দিরের বেলগাছের নিচে। তার জন্য জায়গাটির নামই হয়ে গেল ভৈরবীতলা।

গভীর রাত পর্যন্ত ধুনি জেলে সাধনভজন করে। আর রাতের শেষ প্রহরে চলে যায় কাছেই বনতুলসী আর ধুতরার ঘন জঙ্গলে। কে জানে, কী করে সেখানে। যাই হোক, তার অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল শহর ছাড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে। কেউ আসে দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে। কেউ বা আসে বশীকরণের ওষুধ নিতে, আসে আরও কত রকমের অভিসন্ধি নিয়ে।

হোসেনপুরের ইটখোলার মালিক সুরেশ চৌধুরীর স্ত্রী তরঙ্গিণী নিয়ে এল সর্বনাশা প্রস্তাব—তার একমাত্র মেয়ে যে ছেলেটিকে বিয়ে করবে বলে বায়না ধরেছে, সে-ছেলের স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মেয়ে—আমরা দেখেশুনে বিয়ে দেব। মেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করবে কেন—অতএব—মা ভৈরবী—তুমি ছেলেটাকে···। চোখের কোণ দিয়ে তাকাল তরঙ্গিণী।

শোন—মৃগশিরা নক্ষত্রে রক্তকরবীর মূল, চোখ দুটো বুজে বুজেই ভৈরবী গম্ভীর হয়ে বলল, আর কুঙ্কুম, অগুরু রক্তচন্দন ও গো-চোনা চাই—তাহলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারব।

কয়েকদিন পরেই সেই ছেলেকে ঘুসঘুসে জ্বরে ধরল। শুকিয়ে কাঁটা হয়ে যেতে লাগল।

ডাক্তাররাও ধরতে পারে না রোগ। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেলে কবুল করল, সুরেশবাবু স্ত্রী এবং তার মেয়ে তাকে কটু-তিতো মত শরবত খেতে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের বাবা ফুটানিগঞ্জের দুঁদে মোক্তার চুনী দত্ত দিল থানায় এজাহার। পুলিশী জেরায় তরঙ্গিণী বলে ফেলল, ভৈরবীর কাছ থেকে ওষুধ এনে শরবত মিশিয়ে দিয়েছিল। ভৈরবীর আস্তানা ঘেরাও করল পুলিশ। ভৈরবী দোষ স্বীকার করে জানাল—তরঙ্গিণী যে কটি জিনিস নিয়ে আসতে বলেছিল তার সঙ্গে কালো প্যাঁচার রক্ত এবং শ্মশানের অঙ্গার মিশিয়ে—সেই মিশ্রিত বস্তুটিকে শৃগালকে দিয়ে উচ্ছিষ্ট করিয়েছিল।

তল্লাশি করেও তার ডেরায় পাওয়া গিয়েছিল, কালো প্যাঁচার হৃদপিণ্ড, চটক পাখির চোখ, শ্মশানের মাটিতে জন্মানো মহানালী বৃক্ষের মূল ইত্যাদি মারণ, উচাটন এবং বশীকরণের আরও নানারকমের বিচিত্র উপকরণ।

বিচারে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল ভৈরবীর। জেল থেকে ফিরে আসতেই নদী পারের বাসিন্দারা তাকে দিল তাড়িয়ে। সে এসে ডেরা বাঁধল খাদিমপুরের শ্মশানে। ভৈরবী নাম মুছে গিয়ে হয়ে গেল 'ডাইনী'।

আজও বাঁকুড়ার এস ডি ও কোরটে চলছে এক ডাইনীর চাঞ্চল্যকর মামলা। মামলাটির নমবর ৪৯/১৯৭৭। মামলার বিবরণে জানা যায়—১৪ এপ্রিল ১৯৭৭ সালে গভীর রাত্রে দিবাকর কিসকুর ঘরের দরজায় খুব জোরে কারা যেন ধাক্কা দিল। আর বাইরে থেকে শুনতে পেল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সাঁওতালী ভাষায় মর্মান্তিক আক্রোশের এই কথাগুলো—'দেলা এঙ্গামপে হিজুপেহাঁলাং মাঃ গচপেয়া দলা তোয়া আরও যতে কো কপাট। এঙ্গাতে নকো ডান ভূত আরও নওয়া দিশোমখন' অর্থাৎ আজ শালাদের একেবারেই কেটে ফেলব। আয় তোরা সব জানলা দরজা ভেঙে ফেল। ডানভূত না তাড়ালে গ্রাম থেকে রোগ জ্বালা যাবে না।

দিবাকরের মা ধানীবালা বলল, দরজা খুলে দে দিবাকর, দেখি কী বলে।

তুমি ডাইনী,—কুল কিসকুর অল্পবয়সী বৌটাকে সুতিকায় ধরেছে, সুকরার বেটির ঘুসঘুসে জ্বর হয়েছে—যাকে যা একবার ধরছে, একেবারে জেঁকে ধরে বসে থাকছে—মর্মান্তিক আক্ষেপে ধানীবালাকে বলতে লাগল পাড়ার মোড়ল মংলু কিসকু এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

বলাবাহুল্য ধানীবালা অস্বীকার করল। গ্রামের লোক শুরু করল অকথ্য অত্যাচার। পুলিশ এল।

তল্লাশি করতেই দিবাকরের ঘরে পাওয়া গেল তিনটি গরুর মাথা, একটি মানুষের মাথার খুলি আর কিছু খৈ! ধানীবালা দোষ স্বীকার করে জানাল—তিনটি গোমুণ্ড দিয়ে উনুন তৈরি করে মড়ার মাথার খুলিতে খৈ ভাজতে হয়—সেই খৈ-এর চূর্ণের সঙ্গে কালো প্যাঁচার দুটো কান ও ঘৃতকুমারীর পাতা বেটে যদি কাউকে খাওয়ানো যায়, তাহলে তার দুরারোগ্য ব্যাধি হয়।

কুড়ি

মাটিতে ধানের ডোলের ছবি এঁকে তাতে কড়ি বসিয়ে মোক্ষবুড়ি যেমন গৃহস্থের ভয়ানক ক্ষতি করে তেমনি ডাইনীর সর্বনাশা প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে রামশরণ, তুষ্টচরণ—

ইউরোপে যেমন ব্ল্যাক উইচ আর হোয়াইট উইচ তেমনি এই দেশেও আছে দুই শ্রেণীর ডাইনী! প্রথমে অনিষ্টকারী ডাইনীর কথাই বলা যাক—

স্থান—পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট থেকে ছয়মাইল দূরে গ্রাম—সোদপুর।

কাল—২৫শে অক্টোবর, ১৯৮৩।

রাত্রি নেমেছিল ঘন হয়ে। দূরে—বহুদূরে বোয়ালদাড়ের দিগবিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন কালো অন্ধকারের সমুদ্রের মতই এক একটা আলেয়ার আলো দপ করে জ্বলে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে! যেন অজানা সেই অশরীরি প্রেতলোকের সন্ধান দিচ্ছে সেই এলমেলো আলেয়ার আলো।

দূর দিগন্তের অন্ধকারে সেই আলেয়ার আলোর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ধূর্ত এবং ভয়ঙ্কর অভিসন্ধির মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল সোদপুর গ্রামের একদা অবস্থাপন্ন জোতদার—নরেশ।

নরেশ ঘোষ। হাঁটু পর্যন্ত ময়লা, তালি দেওয়া ধুতি। একসময় যখন থলথলে ভুঁড়ি ছিল তখন সেই যে নাভির নিচে কাপড় পরতো, সাবেক সেই অভ্যাস এখনও রয়ে গিয়েছে। কিন্তু—

রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা। কেউ বলে প্রায়ই উপোষ করে করে চেহারার এই হাল হয়েছে পালানুর (পালানু—নরেশ ঘোষের ডাকনাম) আবার কেউ বলে শালা হাড় কঞ্জুস—ওর ঘরে বাঁশের খুঁটির ফোকরে ফোকরে তাড়াতাড়া নোটের গোছা গোল করে পেঁচিয়ে রাখা আছে।

পালানুর ছেলে। বড়ছেলে ভূতা (পোষাকী নাম—শিবেশ) অন্ধকারের জীব। সারাদিন তাকে দেখা যায় না। পড়ে পড়ে ঘুমোয়। গভীর রাত্রে ত্রিমোহিনীর বর্ডারে গিয়ে বাংলাদেশে চোরাচালান দেয় চিনি, কয়লা ইত্যাদি। একবার ধরা পড়ে তিনমাস হাজতে খেটে এসেছে।

মাঝে মাঝেই পুলিশ এসে গ্রামের এই বাড়িতে হানা দেয় বলে, ভূতা বাড়ি

ছেড়ে দিয়েছে! এখন শোনা যায়—

ধক করে জলে উঠল পালামুর ছোট ছোট চোখদুটো। অদূরে হাটখোলা ছাড়িয়ে বুড়াপুকুরের পাড়ে পাহান (সাঁওতাল-উরাওঁদের প্রায় সমগোত্রীয় আদিবাসী) দের পাড়ার নিকানো ঝকঝকে ঘরগুলোর দিকে। শালাদের দিনে দিনে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। মংলু পাহান—ছোটলোকের ব্যাটা আবার নতুন সাইকেল কিনেছে। শিবু পাহান তো জমির পর জমি কিনে চলেছে। কেমন করে যে এত টাকা পাচ্ছে—এদেরই পাড়ায় তার ছেলে ভূতা নাকি মাঝে মাঝে আসে। পাহানদের উঠতি বয়সের ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করে।

ইঁদুর খেকো—সাপ খেকো ওই পাহানরা তার ছেলেকে গুণমন্তর করেছে—নিশ্চয়ই তুকতাক করেছে। ওই মংলু বুড়ার বৌ—ওই ফুলমণি ডাইনী!

সেও শিক্ষা দেবে এমন—এমন ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবে আর সেই অভিসন্ধি নিয়েই সে রাতদুপুরে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। কিন্তু—

কি করবে সে পঞ্চুর মা মোক্ষবুড়ির কাছেই কি আগে যাবে? না—কি যাবে সাঁওতালপাড়ায় কাঁদনা সাঁওতালের কাছে। এদের দুইজনেরই দুই-রকমের অনিষ্ঠ করার বিস্ময়কর ক্ষমতা!

মোক্ষবুড়ি।

মাটিতে আঁক জোক করে কি মন্ত্র পড়ে কে জানে যার নামে মন্ত্র বলবে তার বাড়ির ডোলে কিম্বা গোলায় যত ধান থাকবে সব তুস হয়ে যাবে··· আবার—

আছে আর এক প্রক্রিয়া তাতে দুধেল গাইয়ের বাঁট শুকিয়ে একেবারে আমসী হয়ে যায়। ওলানে ঘা হবে—সেই ঘায়ের রক্তপুঁজে মাছি থুক থুক করবে। আর—

কাঁদনা।

সে সোদপুর—কাঁজিয়াল-জি বসন্তহার এবং এই তল্লাটের আরও দশটা গ্রামের ভেতরে সেরা ডাইনী। যার ক্ষতি করতে হবে—তার হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুস খুবলে খেয়ে নেয়—তারপর—

এখন থাক সেসব কথা। এখন যাবে না—কাঁদনার কাছে—কাঁদনা তার তুণের শেষ তীর! প্রয়োজন হলে যাবে—নিশ্চয়ই যাবে তার কাছে। কিন্তু—

এখন গোপনে জানতে হবে। ভূতা পাহানদের কোন মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে, সেই মেয়ের বাপ কে?

কে—কে—ওখানে? হঠাৎ চিৎকার করে উঠল পালান্নু। তার বড় সাধের শিবপুকুরের পাড়ে এক চিলতি আলোর দিকে তাকিয়ে আবার হেঁকে বলল—যে আমার পুকুরের মাছ চুরি করবে—তার কিন্তু ভালো হবে না—তার কথাগুলো রাতের নিস্তব্ধতার বুক চিরে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে—বহুদূরে গিয়ে ভূতকুঁড়ি পুকুরের উঁচু পাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

সেই রহস্যময় আলো দপ করে নিভে গেল অন্ধকারে। নিশ্চয়ই শালা ওই পাহান পাড়ার লোকই এসেছিল মাছ চুরি করতে—

না—শালাদের শিক্ষা দিতে হবে—! পিক করে একদলা থুথু মাটিতে ফেলে সে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল মোক্ষবুড়ির বাড়ির দিকে—

বাঁশের চাটাইয়ের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মোক্ষবুড়ি। মাথায় পুরুষদের মত ছোট ছোট করে ছাটা—যাকে বলে কদমছাট চুল। বয়সের ভারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে কি হবে—বেশ শক্ত সমর্থ মোটাসোটা চেহারা। পালান্নুর বৃত্তান্ত শুনে মোক্ষবুড়ি বলল, জওয়ান ছেলেটা মারা যাওয়ায় আমি এসব করি না রে পালান্নু—

না—না—দিদি, তার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, আমার ধান শুওর দিয়ে খাওয়ায়—আমার পুকুরের মাছ চুরি করে খায় ওই শালা পাহানরা—ওদের জ্বালায় আমি রাতে ঘুমাতে পারি না—দিদি—

পালান্নুর শেষের দিকের কথাগুলো কেমন কান্নার মত শোনালো। মোক্ষবুড়ির মনটা নরম হলো। বলল—আজ তো হবে না—সামনের অমাবস্যার রাত্রে আসবি—

খুব খুশি হয়ে চলে যাচ্ছিল পালান্নু।

এই শোন—চলে যাচ্ছিস যে বড়—গুণমন্তর যে করবো তার কোন জোগাড় লাগবে না?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—দিদি, খুব লজ্জা পেয়ে পালান্নু বলল, কি কি আনতে হবে বল—

একটা ভাঙ্গা কুলো, মুড়া ঝাঁটা। গোটা চারেক কড়ি। আর যার অনিষ্ট করতে চাস তার বাড়ির দুমুঠো ধান—একটু থামল মোক্ষবুড়ি। আবার বলল, যদি তার গরুর দুধ নষ্ট করতে চাস, তাহলে তার সেই গরুর গোবর—

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল পালান্নু। শিবু পাহানের বাড়ির ধান, তার গরুর গোবর কি করে জোগাড় করবে? সে ভেবে কুল পেল না। কিন্তু মোক্ষবুড়িকে কিছু বলল না।

ভোর হতে না হতে এল খুপুর কাছে। খুপুকে তাড়ি খাওয়ার জন্য দুটো টাকা হাতে দিলে সে না পারে হেন কাজ নেই।

পালাম্নু পাঁচ টাকা খুপুর হাতে দিল। অতিরিক্ত তাড়ি খেয়ে খেয়ে অনেকদিন আগে খুপুর যে চোখদুটো স্বাভাবিক রঙ হারিয়ে লাল টকটকে জবাফুলের মত হয়ে থাকে সেই চোখদুটো সাপের জিভের মত চিক চিক করে উঠল। ঘেজিয়ে হেসে বলল, তুমি ঘরে গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও পালান্নুদা—আমি অমাবস্যার আগেই শিবুর দুধেল গাইটার গোবর আর ওর বাড়ির দুমুঠো ধান নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি—

শোন—কাউকে যেন বলিস না, চারদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল পালান্নু—কেউ যেন টের না পায়—

অমাবস্যার রাত এল।

পালান্নু সব উপকরণ নিয়ে মোক্ষবুড়ির কাছে এল নিশিরাত্রে। মোক্ষবুড়ি কুপি জ্বালল।

জোড়াসনে বসে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইল সে। তারপর চকখড়ি দিয়ে শিবু পাহানের ধানের ডোলের মত একটা ডোল আঁকল মাটিতে। তার চারিদিকে চারটি কড়ি বসিয়ে দিল। ভাঙ্গা কুলোটা তার কোলের কাছে টেনে নিয়ে তাতে রাখল মুড়ো ঝাঁটা। শিবুর বাড়ির ধান ডানহাতের মুঠোর ভেতরে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করল মোক্ষবুড়ি।

উৎসুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে বসে রইল পালান্নু ঘোষ—ওরফে পালান্নু। সে যেন দেখতে পাচ্ছে শিবুর ডোল ভরা রাশি-রাশি ভরা ধান তুস হয়ে যাচ্ছে। তার বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজছে।

খাস—বাইরে শুকনো পাতার ওপরে কেউ হেঁটে গেলে যেমন শব্দ তেমনি খড়মড় আওয়াজ উঠল। ধক করে উঠল পালান্নুর বুকের ভেতরটা। এই রাতদুপুরে তার পিছনে কেউ ফেউ লাগিয়েছে না কি? পরক্ষণেই মনে হলো, —না! কোন জন্তুজানোয়ার নিশ্চয়ই পুকুরে জল খেতে যাচ্ছে।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই মোক্ষবুড়ির। সে মন্ত্র বলেই চলেছে। তার কাছে সরীসৃপের মত এগিয়ে এল পালান্নু।

মন্ত্র শেষ হলো। সেই মন্ত্রপূত ধান অতিসন্তর্পণে রাখল মোক্ষবুড়ি সেই ভাঙা কুলোর ওপরে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই শালা শিবুর ডুলির সব ধান তুস হয়ে গিয়েছে বাদবাকী কথাগুলো আর বলতে পারল না। পালান্নুর গলার ভেতরে ঘড় ঘড় শব্দ

উঠল। খুশির শব্দ।

কাঁ—কৃক—কাঁ—একটা রাতচরা পাখি কর্কশকণ্ঠে ডেকে উঠল।

এইবার শুরু হলো গরুর বাঁট শুকিয়ে দুধ নষ্ট করার ক্রিয়ানুষ্ঠান।

শিবুর সেই গরুর গোবর একদলা হাতে নিয়ে মন্ত্র বলতে শুরু করল মোক্ষবুড়ি। গোবর মন্ত্রপূত করার পর ছয়টা হাত তিনেক লম্বা পাতকাঠির মাথায় গোল করে গোবর দিয়ে ঘসি বা ঘুঁটে তৈরি করল।

এইবার খুব মন দিয়ে শোন পালানু—মোক্ষবুড়ি বলল, এই ছয়টা ঘুঁটে দিন দুয়েক রোদে দিয়ে আমি শুকিয়ে দেব—একটু থামল মোক্ষবুড়ি, ডানদিকের তিনটে ঘুঁটে যেমন করে হোক তোকে শিবু পাহানের বাড়িতে পাঠাতে হবে।

শুধু ওই তিনটে কেন?

ও মাঃ ওই তিনটেই মন্ত্রপূত গোবর দিয়ে তৈরি। ওই ঘুঁটেগুলো জ্বালালেই সেই গরুর দুধ একেবারে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে—

মোক্ষবুড়ির কথা শেষ হওয়ার আগেই অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ আর তাদের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। পাহানপাড়ার জনা চল্লিশেক পাহান শিবুর নেতৃত্বে মোক্ষবুড়ির কুঁড়েঘরটা ঘেরাও করল। তারা চেঁচিয়ে বলল, মোক্ষবুড়ি বেরিয়ে এস শীগগীর—তোমার সঙ্গে কথা আছে—

কিসের কথা রে রাতদুপুরে, বলতে বলতে কুপি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল মোক্ষবুড়ি তার পিছু পিছু এল পালানু। আর তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। পাহানদের মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখল, শিবু পাহানের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার ছেলে ভূতা!

তুমি আমার বাড়ি থেকে ধান আর আমার পাঁচসেরী দুধের গাইয়ের গোবর চুরি করে নিয়ে এসে গুণমন্তর করছো, শিবু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—বলো—স্বীকার করো—কথাটা ঠিক কিনা—

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

তুমুল কথা কাটাকাটির পর পাহানরা জোর করে মোক্ষবুড়ির ঘরে ঢুকে শিবুর বাড়ির ধান এবং গরুর গোবর পেয়েছিল। দেখেছিল মাটিতে আঁকা ধানের ডুলী, কড়ি ছয়টা, পাতকাঠিতে ঘুঁটে ইত্যাদি উপকরণ। আর জানাজানিও হয়ে গিয়েছিল, জোতদার পালানুর প্ররোচনায় মোক্ষবুড়ি এইসব ক্রিয়ানুষ্ঠান করেছে—আর পালানু যখন ঝেড়ে অস্বীকার করার চেষ্টা করছিল তখন সেই ভীড়ের ভেতর থেকে মাথা বের করে খুপু বলল, কেন মিছে কথা বলছো পালানুদা—তুমি আমার হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে শিবুর বাড়ির ধান—আর—

শালা—তোকে নগদ পাঁচ টাকা দিলাম আর তুই—পালান্থ চিৎকার করে বলতেই।

হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়ল খুপু। হাসির দমক কমলে বলল, কি করবো বলো পালান্থদা—শিবু পাহান যে দশটা টাকা আমাকে দিল। তারপর—

তারপর গ্রামে যা হয়।

পঞ্চায়েত বসেছিল কিনা, মোক্ষবুড়িকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল কিনা এবং পঞ্চায়েতে পালান্থ নিজের দোষ ঢেকে তার ছেলেকে পাহানেরা গুণমন্তর করেছে বলে তাদের ওপরে উল্টো দোষ চাপিয়েছিল কিনা—সেসব বৃত্তান্ত নিতান্তই গতানুগতিক। অবান্তর।

আর সত্যিই ধানের ডুলীর ছবি এঁকে তাতে কড়ি বসিয়ে বা গরুর (যার ক্ষতি করতে হবে) গোবরের ঘুঁটে দিয়ে ধানের এবং দুধের ক্ষতি করা যায় কিনা—সে বিষয়েও কিছু বলা যায় না। তবে—

বলা যায় আফ্রিকা এবং ইউরোপের মত ডাইনীবিদ্যার প্রতি অন্ধ অটুট বিশ্বাসই পালান্থকে প্রেরণা দিয়েছিল মোক্ষবুড়িকে দিয়ে এই ক্রিয়ানুষ্ঠান করাতে।

এই বিশ্বাসই জলজল করছিল বৃদ্ধ রামশরণ রামের চোখে। বাবু ডাইনীরা আমাকে ভয় পায়। ওই শালীরা যদি কাউকে কিছু খাইয়ে ক্ষতি করে—আমি সেই বিষ নামিয়ে দিতে পারি, বালুরঘাট বাসস্ট্যাণ্ডে মটরকালীর মন্দিরের বারান্দায় বসে কথা বলছিল নওগাঁর বিখ্যাত ওঝা রামশরণ। আদি বাস বিহারের ছাপরা জেলার বাথ গ্রামে। কিন্তু বাপ ঠাকুর্দা রাজসাহীর নওগাঁতে এসে গাঁজা চাষের ফার্মে চাকরি নিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। দেশভাগের পর রামশরণ সপরিবারে চলে এসেছে বালুরঘাটে।

আমি তখন মাত্র মাসদুয়েক হলো বালুরঘাটে এসেছি। রাত দুটোর সময় আমার ডাক এল। নাম ধাম বলতে পারবো না হুজুর, আপনি কেতাব লিখবেন, বলছেন তাই এসব বলছি। তা নাহলে আমরা কখনো কাউকে কিছু বলি না। থামল রামশরণ।

হাতদুটো কপালে মটরকালীকে প্রণাম করল। অদূরে খাড়ি ছাড়িয়ে অন্ধকার টাউনক্লাব মাঠের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে বলতে শুরু করল রামশরণ—

আমি গিয়ে দেখলাম—একটা জোওয়ান ছেলে যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে। তার বাবা বলল, গত তিনদিন থেকে এই অবস্থা! একটু শান্ত থাকে ভোরের দিকে।

বেশ আমি কাল খুব ভোরেই আসবো, তার বাবাকে বললাম আপনি শুধু এক গামলা বাসি জল রেখে দেবেন—

আমি অন্ধকার ঝুকঝুকি থাকতেই পৌছে গেলাম। ছেলেটাকে আমার কোলের কাছে বসিয়ে তার হাতদুটো গামলার জলে ধুইয়ে দিলাম। তারপর ছেলেটিকে বললাম—তুমি হাতদুটো গামলায় চুবিয়ে রাখবে—যতক্ষণ আমি মন্ত্র পড়বো—

ছেলেটি হাত চুবিয়ে বসে রইল। আমি মন্ত্র পড়তে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল গামলার জলে কালো কালো সরের মত কি যেন ভাসছে!

আমি থামলাম না। মন্ত্র বলেই যেতে লাগলাম। আর গামলার জলে আরও বেশি কালো কালো সর ভাসতে শুরু করল।

সূর্য উঠল। সমস্ত বিষ নেমে গেল! ছেলেটি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। থেমে গেল রামশরণ। আবার কিছুক্ষণ পর স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, পঞ্চাশ বছর আগের বিষ আমি মন্ত্র পড়ে নামাতে পারি হুজুর—নিবিড় বিশ্বাসের আলোয় রামশরণের চোখদুটো ঝকমক করতে লাগল।

সেই রাত্রে মটরকালীর বারান্দায় বসেই (২৫ শে অক্টোবর, ১৯৮৩) রামশরণের মত আর এক হোয়াইট উইচ, তুষ্টচরণ বৈরাগীর কথাগুলোও টেপে রেকর্ড করেছিলাম।

এক বাইশ তেইশ বছরের যুবতী মেয়ে ঘন ঘন ফিট হয়ে যায়। যতক্ষণ জেগে থাকে ঘরের ভেতরে জোরে জোরে পা ফেলে পায়চারি করে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য যে মেয়ে একবর্ণ ইংরাজী জানে না—সে ঝড়ের মত ইংরেজী বলে চলেছে—

আমি তার ঘরের সামনে যেতেই আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মেয়েটি। ছুটে এসে আমাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল। আমি ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চকখড়ি দিয়ে মেয়েটির ঘরের সামনে দাগ দিয়ে গণ্ডী কেটে দিলাম। মেয়েটি ঘরের ভেতরে লম্ফঝম্ফ করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই গণ্ডীর বাইরে আসতে পারল না। বুঝলাম—ওষুধ ধরেছে!

এইবার আমি একটানা ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরে নামকীর্তন শুরু করলাম—

হরে কৃষ্ণ হরে রাম—রাম—

আঃ! আমার কষ্ট হচ্ছে—যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মেয়েটিকে ভর করে প্রেতাত্মা বলল—হিন্দুর কীর্তন নয়—বাইবেল শোনাও—বাইবেল—

মেয়েটির বাবাকে ইসারা করতেই একটি পকেট—বাইবেল নিয়ে এলেন। বাংলায় লেখা। আমি জোর গলায় পড়তে শুরু করলাম—

যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয় আমার কাছে চলিয়া আসিয়া পান করুক—যে আমাকে বিশ্বাস করিবে তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে—শুনতে শুনতে মেয়েটি শান্ত হয়ে এল।

কেন মেয়েটিকে কষ্ট দিচ্ছিস?

আমার কবর নোংরা করেছে কেন? চিঁ চিঁ করে মেয়েটার মাধ্যমে প্রেতাত্মা বলল, বাড়ির বর্ষীয়সী স্ত্রী লোকেরা কেন ওকে শেখায়নি মেয়েদের অপবিত্র নোংরা বস্ত্র কবরে বা কোন পবিত্র স্থানে ফেলতে হয় না—

আমি কথা দিচ্ছি—ছেলেমানুষ। ভুল করে ফেলেছে—ও আর করবে না—

তা বললে হবে না। এই বাড়ির পিছনে বেলগাছের নিচে আমার কবরে পর পর সাত দিন ফুল দিতে হবে। বাইবেল পড়তে হবে। আর আমার সমাধিটা বহু বছরের বর্ষার জলে ঝড়ে ভেঙেছে। সেটাকে মেরামত করিয়ে দিতে হবে—

পর পর সাতদিন মেয়েটির বাড়ির লোকেরা প্রেতাত্মার নির্দেশ পালন করেছিল। শুনেছি—মেয়েটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছিল—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল তুষ্টচরণ।

২৫ শে অক্টোবর, ১৯৮৩ সালে যেদিন রাত্রে কথা বলেছিলাম তুষ্টচরণের সঙ্গে তার পরের দিন তাকে মটরকালার মন্দিরে আর দেখি নি। তারপরেও অনেক খোঁজ করেছি তার। কিন্তু আর তার সন্ধান পাই নি।

পরে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলাম—সাহেব কাছারীর বেণুইক সাহেবের (শোনা যায় ইনিই বালুরঘাট শহরের পত্তন করেছিলেন, একদা সাহেবকাছারীর বিশাল শালবন এই সাহেবেরই সৃষ্টি) সমাধি ছিল এই মেয়েটির বাড়ির ঠিক পেছনে। আরও—

জানলাম তুষ্টচরণের কথার প্রতিটি বর্ণ সত্যি। বলা দরকার, আপাত

অবাস্তব মনে হলেও, পরলোকগত কোন ব্যক্তির আত্মা জীবিত কোন লোকের দেহে প্রবেশ করতে পারে—তাকে বলে পরকায়া প্রবেশ। সুবিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ এবং থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী মাদাম ব্লাভট্স্কির লেখা ইসিস আনভেইল্ড সিক্রেট ডকট্রিন (Isise Unveiled Secret Doctrine) গ্রন্থ এই পরকায়া প্রবেশের অনেক ঘটনার বিবরণ আছে।

তিন রকম উপায়ে পরকায়া প্রবেশ ঘটতে পারে। (ক) নিদ্রিত অবস্থায় (খ) যোগ বলে (গ) বশীকরণ বিদ্যা বলে।

বশীকরণ বিদ্যার প্রভাবে মৃতব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করা যায় এবং তাকে আয়ত্তাধীনে এনে পীড়িত ব্যক্তিকে যেমন রোগমুক্ত করা যায় তেমনি সুস্থ মানুষের দেহে তাকে প্রবেশ করিয়ে তাকে অসুস্থও করা যেতে পারে।

তুষ্টচরণ বৈরাগী আত্মাকে বশে এনে তরুণী মেয়েটিকে সুস্থ করে তুলেছিল। সে কল্যাণকারী হোয়াইট উইচ। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, বশীকরণ—গুপ্তবিদ্যা বা ব্ল্যাক আর্টের অন্তর্গত। কারণ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসৎ উদ্দেশ্য বা যৌন বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই বশীকরণের স্মরণাপন্ন হয় ব্ল্যাক আর্টের কুশীলবরা। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে অক্সফোর্ডে ছাত্ররাও নেক্রোম্যানসি বা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করছিল শয়তানের পূজায় (Devil worhip) সিদ্ধিলাভের জন্য।

ডাইনীবিদ্যার গতিপ্রকৃতির সন্ধানে বেরিয়ে মোক্ষদা এবং তুষ্টচরণের মত আরো অনেক ব্ল্যাক উইচ এবং হোয়াইট উইচ দুই শ্রেণীরই কুশীলবের সন্ধান পেয়েছি। তাদের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে।

একুশ

ভারতীয় ডাইনীবিদ্যার বিদেশী গবেষক জানিয়েছেন, সাঁওতাল ডাইনীরা মানুষের বুক ফেঁড়ে ফেলে হৃদপিণ্ড আর পেট চিরে যকৃৎ বের করে ভক্ষণ করে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি—সত্যিই কি খায়?

তুমি ঘুমোচ্ছ কেন?

লাস্ট বেঞ্চির কোণের দিকের ছেলেটি তাড়াতাড়ি করে টান টান হয়ে বসল।

কী ব্যাপার বলো তো, শান্ত, গম্ভীর গলায় মাস্টারমশায় বললেন, আমি লক্ষ্য করেছি, প্রতিদিনই তুমি ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ো। তুমি রাত্তিরে ঘুমোও না?

ছেলেটি কোন কথা বলল না। মাথা গুঁজে বসে রইল।

কি হলো? কথা বলছ না কেন? এবার মাস্টারের গলার স্বরটা একটু ভারি শোনালো।

আমি কোনদিনই রাত্রে ঘুমাতে পারি না স্যার, ছেলেটি আস্তে আস্তে বলল, আমাকে—

রাত জাগতে হয়—

কেন—বাবা কি মার অসুখ?

না স্যার—

তাহলে?

রাত্রে ডাইনীদের নাচের সঙ্গে আমাকে ড্রাম বাজাতে হয়—

বাজ পড়ল ক্লাসঘরে।

একটা কথাও বলতে পারলেন না মাস্টারমশায়। হতভম্ব হয়ে আদিবাসী ছেলেটির নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনায়াসেই বলা যায়, হয়তো তাঁর মনে হয়েছে সাঁওতাল পরগণার এই পাহাড় আর জঙ্গলঘেরা গণ্ডগ্রাম নারায়ণপুরে প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারী করতে এসে বহুকাল বাস করলে কি হবে, ওই কৃষ্ণকায় আরণ্যক সন্তান এই আদিবাসীদের ধ্যানধারণা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না।

এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন ডবলিউ. জি. আর্চার (W. G. Archer)। ১৯৪৪ সালে আর্চার সাহেব সাঁওতাল পরগণার একটি শান্ত, নিভৃত গ্রাম

সুন্দরপাহাড়ীতে ক্যাম্প করেছিলেন। উদ্দেশ্য—সাধু ও মহৎ—ডাইনীবিদ্যা সম্বন্ধে সাঁওতালদের চিন্তাধারা, ডাইনীতত্ত্বে তাদের বিশ্বাস, তাদের বিচিত্র ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে গবেষণা। আর সেই রিচার্সের ফিল্ড স্টাডির জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাঁওতাল অধ্যুষিত সাঁওতাল পরগণা।

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮। চারবছর ধরে সাঁওতাল পরগণার গ্রামগ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে সাঁওতাল সমাজে ডাইনীবিদ্যার প্রভাব সম্বন্ধে আর্চার সাহেবের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত তাঁর নিজের জবানীতেই শুনুন—

নারায়ণপুর প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রটির বয়স চোদ্দ পনের। বুদ্ধিমান সরল। তাকে জেরা করে করে জানতে পারলাম—গভীর রাত্রে ডাইনীদের সভা বসে হয় মাঝিথানে (দেবতার থানে), না হয় কোন পাহাড়ের নির্জন উপত্যকায় কিম্বা গ্রামের শেষপ্রান্তে দুইটি রাস্তার সংযোগস্থলে কোন পোড়ো বাড়িতে। আর ডাইনীদের এই সমাবেশ হয় কখনো প্রত্যেকদিন রাত্রে আবার কখনো শুধু শনিবার এবং রবিবারের রাত্রে।

একদিন মাঝরাতে বহুদূর থেকে বাতাসে বাঁশীর শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল, ছেলেটি আমাকে বলতে শুরু করল, আমি জানালা দিয়ে দেখলাম, আমার দুই পিসী ঝড়ের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বড়দের মুখে কথাগুলো শুনেছিলাম আমার পিসীমারা ডাইনী। আমার কৌতুহল হলো। আমিও বেরিয়ে তাদের পিছু নিলাম। কিন্তু পিসীদের দিকে আমি তাকাতে পারলাম না। হাত দিয়ে আমাকে চোখ ঢাকতে হলো। কেননা তারা ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কোমরের চারিদিকে শুধু ঝাঁটার কাঠি ঝুলছে!

আমি লক্ষ্য করলাম, দূরে বনের মাথায় আকাশে আগুনের আভা। সেই রক্তাভ আকাশের দিকে লক্ষ্য করে পিসীমারা ঝড়ের বেগে চলেছে। আমিও গাছ গাছালির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমি পাহাড়ের নিচে ঝাপড়া একটা বুড়ো বটগাছের নিচে পৌছে গেলাম। আমার মনে হলো এই জায়গাটাই মাঝিথান। পিসীরাও এখানকার মাটিতে প্রণাম করে ছুটে চলে গেল কাছের একটা পোড়ো বাড়ির ভেতরে। সেখান থেকে বহু মেয়ের টুকরো টুকরো কথা আর হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

আমার মনে হলো, পোড়ো বাড়ির মধ্যে কি হচ্ছে দেখতে হবে। উঠে পড়লাম, বটগাছের একেবারে মগডালে। আর সেই পোড়ো বাড়ির ভেতরে

তাকাতেই আমার চোখদুটো একেবারে ধাঁধিয়ে গেল।

উঠোনের ঠিক মাঝখানে পাঁচ-ছয়ফিট উঁচু একটি গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় লাল, নীল, সবুজ, হলদে—নানারঙের পতাকা দুলছে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে শোভা পাচ্ছে পদ্মফুল, কোথাও বা পদ্মপাতা আর সবচেয়ে আশ্চর্য—প্রতিটি ফুল থেকে প্রতিটি পাতা থেকে তীব্র উজ্জ্বল সবুজ-লাল আলোর আভা ঠিকরে পড়ছে। আবার কোন ডালে ঝুলছে রাশি রাশি পদ্মকুঁড়ি। কুঁড়ির ভেতর থেকে নীলাভ আগুনের শিখা—বাইরে আছড়ে পড়েছে। আর নিচের দিকের ডালগুলো থেকে এক একটি সবুজ আলোর দীপশিখার মত দুলছে পদ্মের ডাঁটা।

সেই নানারঙের আলোয় উজ্জ্বল সেই গাছের নিচে স্ত্রীলোকের জমাট ভীড়ের ঠিক মুখোমুখি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে পুরুষরা। তাদের গায়ে রাজার মত সোনার কি রূপোর চুমকি বসানো ঝলমলে জামা। সেই জামার প্রতিটি চুমকি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর—

মেয়ে এবং পুরুষদের ঠিক মাঝখানে একটি উঁচু বেদী। বেদীর ওপরে একটা জ্যান্ত বাঘ। বাঘের পিঠে খুব মোটাসোটা আর লম্বা এক বুড়ো তার বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি। সাদা গোঁফ। ধবধবে সাদা চুল। তাঁর হাতে রাজদণ্ডের মত একটি দণ্ড। দণ্ডটি রক্তাভ আগুনের শিখার মত জলজল করছে। আমার মনে হলো—এই বুড়ো বুঝি ডাইনীদের দেবতা—বোঙা। হয় পরগণা বোঙা কি বুড়ো বোঙা। আমার বাপ চোদ্দপুরুষ সাঁওতাল সাহেব—আমি জানি—

আঃ তুমি কি করে ডাইনীদের বাজনদার হলে—আর ডাইনীদের সেই গ্যাদারিং-এ আর কি হলো—তুমি এইসব বলো, (আর্চার বললেন) তাকে বাধা দিয়ে আমাকেই সূত্র ধরিয়ে দিতে হলো।

হ্যাঁ স্যার—বলছি, ছেলেটি আবার বলতে আরম্ভ করল, কি বলবো স্যার—সেই রাত্রিরের কথা ভাবলে মনে হয়—স্বপ্ন—কতটুকু যে গুছিয়ে বলতে পারবো জানি না—থামল ছেলেটি। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, মেয়েপুরুষ একে একে সেই বোঙাকে প্রণাম করল। আর যেই প্রণামের পালা শেষ হলো অমনি ড্রাম বেজে উঠল, বেজে উঠল বাঁশী।

দুইটি পুরুষ আর দুইটি মেয়ে মিলে চারজন করে এক একটি গ্রুপ করে বাজনার তালে তালে নাচতে লাগল। সেই সঙ্গে শুরু হলো তাদের মিলিত গলার গান—এইসময় আমি একটা বোকামি করে ফেললাম স্যার—থামল

নারায়ণপুর প্রাইমারী স্কুলের সেই ছাত্রটি।

কি বোকামি?

এত সুন্দর নাচ গান আর বাজনা স্যার—আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম, আমি চুরি করে, লুকিয়ে ডাইনীদের এই কাণ্ডকারখানা দেখেছি। আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, বাজনার বোল—ধা—তিন—তা—

কে—কে—গাছে কে? বুড়ো বোঙ্গা চিৎকার করে উঠল। মুহূর্তে থেমে গেল গান-নাচ। বোঙ্গা হুকুম করল, এখুনি ধরে নিয়ে এস ওকে—

সে বলার আগেই পাঁচছয়জন পুরুষ ছুটে এসে বটগাছে উঠে আমাকে পাঁজাকোল করে ধরে নিয়ে এল আসরে। তারপরে আর কি—বুড়ো বোঙ্গা রেগে আগুন হয়ে বলল, তোকে এখুনি বাঘের মুখে দেব—

আমি ভয়ে কেঁদে ফেললাম। তার পাদুটো জড়িয়ে ধরে বললাম—আর কখনো এখানে আসবো না—

তা বললে হবে না। তোকে প্রত্যেকদিন রাত্রে আমাদের আসরে এসে ড্রাম বাজাতে হবে বুড়ো বোঙ্গা বলল, আর কখনো যদি বলবি কাউকে—বললে তোকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব—

সেই থেকে আমাকে ড্রাম বাজাতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হয় স্যার—একটু থেমে প্রাইমারী স্কুলের ক্লাস ফাইভের সেই ছাত্রটি আবার বলল, আমার মত আরও দুইটি ছেলে আছে স্যার যারা ডাইনীদের নাচের সময় ড্রাম বাজায়…

দীর্ঘকাল সাঁওতালদের জীবনে উইচক্র্যাফটের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করে আর্চার সাহেবের মনে হয়েছে—Santals have been thoroughly obsessed by the menace of Witchcraft—ডাইনীবিদ্যা বা ডাইনীর ভয়ে (তাদের তুকতাক এবং মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা ভয়ানক ক্ষতি করার ক্ষমতা) সাঁওতালদের জীবন আচ্ছন্ন থাকে।

গ্রামবৃদ্ধ কোলিয়াম হাড়াম আমাকে বলেছিল, আর্চার বলেছেন, আমাদের সাঁওতালদের একমাত্র দুঃখকষ্ট হলো—ডাইনীদের অত্যাচার। ডাইনী যদি না থাকতো, তাহলে আমরা কত সুখী হতাম…

ডাইনীর প্রসঙ্গে সাঁওতালরা কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সহ্য করে না কোন হাসিঠাট্টা বা বিদ্রূপ আর ডাইনীর প্রতি যে অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা করে

তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করতেও ইতস্ততঃ করে না—

আর্চারের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাবে ডাইনী সম্বন্ধে কত বিচিত্র অন্ধসংস্কার, কত আশ্চর্য বিশ্বাস নিয়ে যুগযুগান্তর ধরে সাঁওতালরা বাস করছে জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত সভ্যতার কাছাকাছি।

॥ ডাইনীবিদ্যায় দীক্ষা ॥

যে মেয়েটিকে দীক্ষা দেওয়া হবে নিশিরাত্রে তার বাড়িতে দল বেঁধে আসে বর্ষীয়ান ডাইনীরা।

ঠুন-ঠুন—দরজার কড়া বেজে ওঠে। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেই চমকে ওঠে তরুণী মেয়েটি। কুপির আলোয় কেমন বীভৎস দেখায় সারি সারি উলঙ্গ নারীমূর্তী। যেন মনে হয় অজানা প্রেতলোক থেকে নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধি নিয়ে দুষ্ট প্রেতিনীর দল।

চল—তোকে ডাইনী হতে হবে, চাপা গলায় বলে দলনেত্রী।

মেয়েটি কোন কথা বলে না।

তার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ে। বলে আমি পারবো না—

তোকে বাঘে খাবে, কড়া গলায় আর একজন বলে, তোকে এমন রোগে ধরবে যে তোকে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকতে হবে—কিম্বা তুই পাগল হয়ে যাবি—

অগত্যা রাজী হয়। তখন মেয়েটিকেও তাদের মত বিবসনা করে। কোমরের চারদিকে ঝুলিয়ে দেয় ঝাঁটার কাঠি। হাতে দেয় ভাঙ্গা একটা কুলো।

এইবার ঠিক হয়েছে, ডাইনীরা খুশি হয়। ঝড়ের মতো ছুটে যায় গভীর বনের দিকে। জঙ্গলের কাছে এসে মেয়েটিকে বলে যা জঙ্গলের ভেতরে যেয়ে বাঘ খুঁজে নিয়ে আয়—যা-যা—ভয় পাস না—ভয়ের কিছু নেই—

বাধ্য হয়ে জঙ্গলের ভেতরে মেয়েটিকে যেতেই হয়। বাঘ খোঁজার উদ্দেশ্য—আর কিছু নয় তার সাহস বাড়ানো। ভীতু হলে ডাইনী হওয়া যায় না।

কিছুক্ষণ পরে গাছের কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে বেরিয়ে আসে মেয়েটি। চল এবার বোঙ্গাদের থানে—দলনেত্রী বলে। ছোট বোঙ্গা, বড় বোঙ্গা, পরগণা বোঙ্গা—সমস্ত বোঙ্গাদের থানে নিয়ে যায় তাকে। তারপরে ছাত্রদের যেমন করে লেখাপড়া শেখানো হয়। তেমনি করে তাকে শেখানো হয়, এবং কোন বোঙ্গাকে কেমন করে ডাকতে হয়। শেখানো হয় ডাইনীদের যাদুমন্ত্র এবং ডাইনীদের গান। এইবার—দলের নেত্রী বলে ভয়ানক একটা কথা—

শোন এবার তুই তোর বাবাকে কি তোর ভাইকে খাবি—তুই একান্ত নিজের কাউকে যতক্ষণ না খেতে পারবি ততক্ষণ তুই পাকাপাকি ভাবে ডাইনী

হতে পারবি না—

না—না—এ তুমি কি বলছো! বনভূমি সচকিত করে আর্তনাদ করে ওঠে মেয়েটি। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

কিছুই কঠিন নয় বাছা, বুড়ি ডাইনী কঠিন রুক্ষ গলায় বলে, এই দেখ—কচুপাতায় জড়ানো কোন মানুষের হৃদপিণ্ড আর যকৃৎ তুলে ধরে মেয়েটির মুখের সামনে বলে, শোন এদুটো আমারই ছোট ভাইয়ের যকৃৎ আর হৃদপিণ্ড। গতরাত্রে বাজপাখির নখ দিয়ে তৈরি ছুরি দিয়ে আমার ছোট ভায়ের বুক আর পেট ফেঁড়ে হৃদপিণ্ড আর যকৃৎ বের করে নিয়েছি। এখন—এইখানে এইদুটো ভাতের সঙ্গে রান্না করে আমরা সবাই খাবো—তোকেও খাওয়াবো।

নতুন ডাইনী পাথর হয়ে বসে রইল।

মাটি খুঁড়ে উনান তৈরি হলো। বনের শুকনো পাতা আর ডালপালা জ্বালিয়ে শুরু হলো রান্না।

দাউ দাউ করে উনান জ্বলছে। টগবগ করে ফুটছে যকৃৎ আর হৃদপিণ্ড মেশানো ভাত। সেই অবসরে ডাইনীরা জ্বলন্ত চুল্লীর চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করল আর গান—

আমি কেটেছি কলাগাছের থোপ
আমি হয়েছি বিবসনা
হে বোঙা—হে বগুরু—হে জংরু (ওঝা)
আমি শিখেছি স্বামীকে দিতে কোপ

তাদের সমবেত গলার গানে নাচে মুখর হয়ে উঠল বনভূমি। ভাত নামানো হলো। আর এক ডাইনী সিদ্ধ করা সেই যকৃৎ আর হৃদপিণ্ড বেশ করে ধুয়ে মুছে ঝোল রান্না করল। সেই কারী আর ভাত দিয়ে তারা মহা উল্লাসে বনভোজন শেষ করল।

এইবার নতুন যে মেয়েটি সেই ঝোল বা ষ্টু খেল, তার ডাইনী দীক্ষা শেষ হলো। সাঁওতালদের আবহমানকালের অন্ধ বিশ্বাস—এই মেয়েটি আর কখনো ভুলবে না ডাইনীদের যাদুমন্ত্র—ভুলবে না ডাইনীদের গান! যা শেখানো হয়েছে ভুলতে পারবে না তার একটি বর্ণও। সে এইবার সুদক্ষ ডাইনী হয়ে উঠল—Who has eaten such a stew is completely proficient in Witchcraft and can never forget what she has learnt.

বড় বিচিত্র এই ডাইনী স্ত্রীলোক—আর্চার সাহেব বলেছেন, যেদিন থেকে সে ডাইনী হলো, সেইদিন থেকে তার ভেতর থেকে নারীত্বের কোমলতা মায়া মমতা সব নির্বাসিত হয়ে গেল। সে যদি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয় তাহলে

নিজের গর্ভজাত সন্তানের পিতাকেও সে বিনাদ্বিধায় ভক্ষণ করতে পারে। সে গ্রামে গ্রামে মৃত্যু আর মারাত্মক ব্যাধির বীজ ছড়িয়ে দেয়। সাঁওতালদের দৃঢ় বিশ্বাস, মাঝিথানের বটগাছের নিচে রোগের জীবাণু পুঁতে রাখা হয়। কিম্বা কখনও—কখনও কোন গ্রামের কুয়োর জলেও ব্যাধির বীজ সযত্নে লালন করা হয়। গভীর রাত্রে ডাইনীরা একে একে আসে এই কুয়ো থেকে রোগের জীবাণু নিতে। জীবাণু নিয়ে ডাইনীরা সযত্নে রেখে দেয় শামুকের খোলের কিম্বা মাটির হাঁড়ির ভেতরে। তারপর জীর্ণ দুটো মোষের গাড়িতে করে রওনা দেয়। চলে যায় সেই গ্রামে, যেখানে ব্যাধি আর মৃত্যুর বিষ ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই গ্রামের শেষপ্রান্তের রাস্তায় কিম্বা মাঝিথানের গাছের নিচে সেই বীজ পুঁতে রাখে তারপর—

তারপর সেই কাল-সময় যখন আসে তখন সারা গ্রামে সেই রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। আর ঘরে ঘরে রোগাক্রান্ত মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণার আর্তনাদ শোনা যায়। মানুষ পশুপাখি রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা যায়—People and animals of the village feel pain and died···এসব বলেই —আর্চার সাহেব বলেছেন, বলাবাহুল্য, ডাইনীদের এই মৃত্যুর বিষ বহন করার রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তের জন্ম সাঁওতালদের ডাইনীদের সম্বন্ধে স্মরণাতীত কালের অন্ধবিশ্বাস থেকে। জন্ম ও হয়েছে আরও একটি বিচিত্র লোককথার—

এক বালক পথ হারিয়ে ফেলল গভীর বনে। ধীরে ধীরে সন্ধে উতরে রাত গভীর হলো। ছেলেটি বাঘের ভয়ে বড় একটা গাছে উঠে বসে থাকল। সেই গাছের নিচে ডাইনীরা এসে জড়ো হলো। ডাইনীদের ভেতরে যে সবচেয়ে বুড়ি সে তাদের গুরু বা দলনেত্রী। সে মন্ত্র উচ্চারণ করল অমনি গাছ উড়তে শুরু করল। ছেলেটি ডালের সঙ্গে টিকটিকির মত লেপটে রইল। বুড়ি দ্বিতীয় মন্ত্র বলল। সঙ্গে সঙ্গে গাছটা বাঁকা হয়ে তারের মত সাঁ সাঁ করে বাতাস কেটে সমুদ্র পেরিয়ে পৌছে গেল বড় বোম্বার থানে। এই বোম্বার আছে একটি বড় দোকান। সেই দোকানে কিনতে পাওয়া যায় পৃথিবীর সব ব্যাধির জীবাণু। ডাইনীরা কোমরের ঝাঁটার কাঠির সঙ্গে ঝুলানো টাকার থলি বের করে গুনে গুনে দেখল, কত টাকা আছে—কোন রোগের জীবাণু তারা কিনতে পারে! তারা কেউ কিনল সর্দিকাশের, আবার কেউ কিনল মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার জীবাণু। কেনাকাটা শেষ হলে সেই গাছ আবার উড়িয়ে নিয়ে এসে তাদের পৌছে দিল তাদের গ্রামে। সেই জীবাণু গভীর রাতে প্রত্যেক বাড়ির দরজায় দরজায় পুতে রাখল। পরদিন—গ্রামে শুরু হলো মহামারী।

আর্চার সাহেব জানিয়েছেন, শুধু অসুখ বিসুখ নয়, ঝড় দুর্যোগ, যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এমন কি বন্যপশুর আক্রমণের জন্য সাঁওতালরা দায়ী করে ডাইনীকে।

গ্রামের নাম—ভুমডুমি।

মেয়েটির নাম—রেংতা কিসকু।

রেংতা কিসকুকে দুইদিক থেকে দুটো ভালুক আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করল। জংগুরুকে ডাকা হলো। জংগুরু অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে রেংতার রক্তাক্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে চোখ বুঁজে মন্ত্র বলতে লাগল। মন্ত্র বলা শেষ হলে জংগুরু বলল, রেংতার ছোট বোন রাক্ষীকে ডাইনীবিদ্যায় তালিম দিচ্ছে রেংতার বড় ননদ (তাঁর স্বামীর দিদি)। রাক্ষী তার ট্রেনিং শেষ করার আগে পাকা ডাইনী হওয়ার (ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়ের যকৃৎ আর হৃদপিণ্ড না খেলে কিছুতেই ওস্তাদ ডাইনী হওয়া যায় না) জন্য ভালুকের রূপ ধরে রাক্ষী তার দিদিকে খেতে এসেছিল। রাক্ষীকে বেদম প্রহার করা হলো। সে দোষ স্বীকার করে বলল, দিদিকে নয়, জামাইবাবুকেই খেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাকে পাইনি বলে দিদিকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু হৃদপিণ্ড আর যকৃৎ খাওয়াটা কি? সত্যিই কি ডাইনী তার একান্ত আপনার জনের বুক চিরে ফেলে যকৃৎ আর পেট ফেড়ে ফেলে হৃদপিণ্ড বের করে? মনে ঘনিয়ে আসবে এই প্রশ্নটি।

আর এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে রাজপোনা গ্রামের কৃষক জুনা হেমব্রমের বিচিত্র ঘটনায়—

জুনার দুই মেয়ে। ছোট মেয়েটিকে তার দুই কাকীমা ডাইনী তৈরি করার জন্যে একটি সাংঘাতিক প্রস্তাব করল তার বাবাকে তারা খুন করবে এবং যকৃৎ ও হৃদপিণ্ড বের করবে। কিন্তু সেই মাংস খেতে হবে জুনার মেয়েকে। মেয়ে কেঁদে ফেলল! কাকীমার ধমকে বলল, না খেলে তোর কঠিন অসুখ হবে—তুই পাগল হয়ে যাবি। ভয়ে রাজী হলো। তারপর পরিকল্পনা মত কাজ হলো।

জুনা কাঁধে হাল নিয়ে চাষ করতে যাচ্ছিল। তাকে কুড়ালের বাঁট দিয়ে এমন করে মাথায় আঘাত করা হলো যে সে মাটিতে পড়ে গেল। দুই ডাইনী তার যকৃৎ আর হৃদপিণ্ড বের করে নিয়ে চলে গেল একটা পোড়ো বাড়ির পিছনে। সেখানে নিরিবিলি বসে তারা জুনার হৃদপিণ্ড আর যকৃৎ খেল এবং ছোট মেয়েকেও দিল। মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই বাপের যকৃৎ আর হৃদপিণ্ড খেতে পারল না।

সে একটা পাথরের নিচে লুকিয়ে থাকল। কাকীমারা জানতে পারল না।
কিছুদিন পরে জুনার অসুখ হলো। জংগুরু এল। অসুখের লক্ষণ দেখেই ওঝা ছোট মেয়েকে ডাকল। কাকীমারা যা যা করেছে সব বলল মেয়েটি। জংগুরু নিঃসন্দেহ হলো মেয়েটি যা বলেছে সব ঠিক। জংগুরু তাকে ওষুধ দিল। জুনা সুস্থ হয়ে উঠল। অতএব—

ডাইনীদের হৃদপিণ্ড আর যকৃৎ ভক্ষণ মন্ত্রে। বাস্তবে নয়—

মানুষের যকৃৎ আর হৃদপিণ্ড খেয়ে ফেলা কাজটা কিন্তু সহজ নয়। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। বোঙ্গার অনুমতি ছাড়া ডাইনী মানুষ খেতে পারে না। কেননা মানুষ খেতে পারলে বোঙ্গার যাদুকরি শক্তি ডাইনী পেয়ে যায়। তাই বোঙ্গার সম্মতি একান্ত প্রয়োজন।

রাজদহ গ্রামের জেমান মারাণ্ডি পুত্রবধুর শ্লীলতাহানি করেছিল। জেমান জানতো না তার ছেলের বৌ ডাইনী। শ্বশুরের ওপরে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলো পুত্রবধু। সে আর দুই ডাইনীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল, শ্বশুরকে খেয়ে ফেলবে। গভীর রাত্রে তারা তিনজন ঘুমন্ত জেমানকে খাটিয়া শুদ্ধ তুলে নিয়ে প্রথমে গেল পরগণা বোঙ্গা মাঝি হাড়ামের কাছে। মাঝি তাকে অনুমতি দিল না। তখন আবার তাকে নিয়ে গেল তাদের মাঝিথানে। মাঝিথানের পর বোঙ্গা বলল, আমি তো অনুমতি দিতে পারি না—তুমি বরং চলে যাও এই গ্রামের একেবারে শেষদিকের পুকুরে—সেখানে আছে আটো বোঙ্গা (জলের দেবতা)। আটো বোঙ্গা সানন্দে অনুমতি দিল। তারপর আর কি গ্রামের এক জনবিরল জায়গায় জেমানের বুকচিরে হৃদপিণ্ড বের করে আম এবং কাঁঠালের ভেতরে রেখে খেয়ে ফেলল ডাইনী পুত্রবধু এবং আর ডাইনীরা।

কাউকে হত্যা করতে হলে তার ফ্যামিলিতে অন্তত একজন ডাইনী থাকতে হবে। তা না হলে খুন করা যায় না।

মোহনপুরের মংলা সরেনের দুই মেয়ে। একজনের বয়স দশ আর এক-জনের আট। দুই বুড়ি এবং দুই তরুণী ডাইনীর প্রবল বাসনা হলো—মংলার ছোট মেয়েটির কচি মাংস খাওয়ার। কিন্তু মংলার পরিবারে কেউ ডাইনী নেই। তাহলে উপায়? ডাইনীরা মংলার বড় মেয়েকে ডাইনীতে দীক্ষিত করে বলল, তুই শুধু তোর ছোট বোনকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে থাকবি—তারপর আমরা যা করার—করবো।

একদিন গভীর রাত্রে ছোট বোনের পিঠ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে রইল বড় মেয়েটি। ডাইনীরা ছোট মেয়েটির হৃদপিণ্ড বের করে একটি পাত্রে ঝোল রান্না করে খেল।

পরদিনই দারুণ অসুস্থ হয়ে মংলার ছোট মেয়ে মারা গেল।

পাঠক, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, হাজার হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেশিয়ার ডাইনী পুনে, নেটসেম্নি আর টটসাভানি যেমন করে ঠিক তেমনি সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে নৈশ অভিযানে যায় সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল রমণী। দুই দেশেরই ডাইনীদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিষ্ঠুর বীভৎসতা প্রায় একই রকম। আফ্রিকার নেটসেম্নি যেমন কুমিরের হৃদপিণ্ড, বিষাক্ত সাপের চামড়ার চূর্ণ এবং গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি মরণ ওষুধ খাইয়ে শত্রুকে করে নিধন, তেমনি সাঁওতাল ডাইনী মন্ত্রবলে যকৃৎ আর হৃদপিণ্ড খেয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু কেন? কেমন করে রোডেশিয়ার পুনে আর সাঁওতাল পরগণার রাক্ষীরা দেশকালের ব্যবধান এড়িয়ে একরকম হয়ে যায়? এই প্রশ্ন নিয়ে গবেষনা করুন ডাইনীবিদ্যার বিশেষজ্ঞরা।

আরও আশ্চর্য দেখুন, ইংল্যাণ্ডের হপকিনস যেমন মেয়েদের গায়ে সূঁচ ফুটিয়ে কিম্বা নির্জন ঘরে মেয়েটিকে আটকে রেখে জানালা দরজা খুলে রেখে মাছির গতিবিধি দেখে ঠিক করতো মেয়েটি ডাইনী কিনা—প্রায় যুক্তিহীন এক অন্ধসংস্কারের শিকার হয়ে সাঁওতালরাও করে ডাইনী নির্ধারণ।

রাত নামে নারায়ণপুর গ্রামে। গ্রামের ভেতরে বড় রাস্তা ধরে নিঃশব্দে চলে চার ছায়ামূর্তি। গ্রামপ্রধান এবং তার তিনজন বিশ্বস্ত অনুচর। প্রধানের হাতে জ্বলন্ত মশাল। তারা সাঁওতাল পাড়ার প্রতিটি দরজায় এসে থামে। চাপাগলায় চিৎকার করে বলে শোন—হোপা হেমব্রমের বড় মেয়ে সোনামণির পেটের ব্যামো হ—য়ে—ছে—যদি ভালো হয়ে যায়—তাহলে ভালো কিন্তু যদি ভালো না হয়—তাহলে তোমাদের এই বাড়ির ভেতরে কে ডাইনী আছো বুলবে—এ—এ—এ—এ—

বলাবাহুল্য কোন বাড়ি থেকেই কোন সাড়া আসে না। কিন্তু এই ব্যবস্থা হলো থ্রেট আ্যাট র‍্যাণ্ডাম Threat at Random। তারপরের স্টেপ।

গ্রামপ্রধান জংগুরুকে ডাকে। জংগুরু রোগী পরীক্ষা করে। রোগের-লক্ষণ দেখে বলে দেয় কোন বাড়ির কোন ডাইনী এই কাজ করেছে—তারপর ডাকে আর এক ওঝা। সেই ওঝাও যদি সেই একই নাম বলে তাহলে

বুঝতে হবে সেই নামের স্ত্রীলোক সত্যিই ডাইনী। কিন্তু—যদি তৃতীয় ওঝা এসে বা অন্য কোন দ্বিতীয় মহিলার নাম বলে তখুনি হয় গ্রামপ্রধানের মহাসমস্যা। তখন গ্রামপ্রধান তার সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে যায় গ্রামের পুকুরের পাড়ে। যেসব পরিবারে স্ত্রীলোকের নাম ওঝা বলেছে সেইসব ফ্যামিলির প্রত্যেকের নামে নামে এক একটি করে গাছের ডাল পুকুরের জলের ধারে লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে গ্রামপ্রধান এসে দেখে কোন ডালের পাতা শুকিয়ে গিয়েছে কি না। যদি কোন ডাল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তাহলে যার নামে ডাল—সে নিশ্চিত ডাইনী। কিন্তু—

যদি পরদিন দেখা যায় কোন ডালের কোন পাতাই শুকিয়ে যায় নি। এতটুকু হলুদের ছোপ পড়েনি কোথাও—ঝকঝকে ঘন সবুজ পাতায় সকালের রোদ ঠিকরে পড়ছে! তখন চিন্তার ছায়া পড়ে গ্রামবৃদ্ধের চোখে। আবার প্রতিটি ডাল ভাল করে পরীক্ষা করেই প্রতিটি পাতায় তেল-সিঁদুর মাখিয়ে দেয়; দেয় চাল ছিটিয়ে। তারপর মাথার ওপরে বিশাল আকাশের দিকে হাত দুটো তুলে আকুল হয়ে প্রার্থনা করে বড় বোঙ্গার কাছে—বড় বোঙ্গা আমার মুখের দিকে তাকাও—আমি গ্রামের মাথা। কে ডাইনী আমাকে বের করতেই হবে—বড় বোঙ্গা কোন ডাল শুকিয়ে দিয়ে—তুমি দোষী বের করে দাও—তারপর প্রত্যেক গাছের কাছে গিয়ে এই কথাগুলো বলেই প্রার্থনা জানায় মোড়ল। এইভাবে কিন্তু একদিন নয়—

দিনের পর দিন তারা পরীক্ষা চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না দেখছে ডাল শুকিয়ে কে ডাইনী ঘোষণা করছে! এক জায়গায় নয়। বারে বারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সীমানার ভেতরে কোন জলাশয়ের ধারে গাছের ডাল পুঁতে রেখে তারা এই পরীক্ষা করে। তাতেও যদি কিছু সুরাহা না হয় তাহলে আবার পঞ্চায়েত বসে। সেই সভায় ঠিক হয় কোন গ্রামের কোন 'জন' বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন গুরুদেবের কাছে যেতে হবে। তাঁর কাছে গ্রামের কে কে যাবে—(সেই জন বলে দেবেন—কে ডাইনী ?)—সেসব সেই সভায় গ্রামপ্রধান ঠিক করে দেন।

জন।

আর্চার সাহেব বলেছেন, এই 'জন' হলো সাঁওতাল সমাজের হাইকোর্ট। জন যোগবলে ডাইনীর নাম জানতে পারবে—যার নাম তিনি বলবেন তাঁর ওপরে আর কোন কথা চলবে না। এই হাইকোর্টে কোন আপীল কখনো চলে না।

এইবার শুরু হয়—ডাইনী কে—কে তাদের গ্রামের জীবন বিষাক্ত করে দিয়েছে সেই পিশাচীকে জানতে যাওয়ার অভিযান। গ্রাম প্রধানের মনোনীত* ব্যক্তিরা দল বেঁধে রওনা হয়—সেই মোড়লের নির্বাচিত গুরুদেব বা জনের গ্রামে! কিন্তু—

হুট্ করে গিয়ে সেই জনকে বললেই হবে না। অনেক বিধি নিষেধ আছে! আর তাঁর কাছে সরাসরি যাওয়া যায় না। প্রথমত জনের গ্রামে পৌছানোর পর তারা সেই গ্রামের সীমানায় কোন গাছের নিচে ডেরা বাঁধে। ভিনগাঁয়ের লোক দেখে কৌতূহল হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের কিন্তু কিছুই বলে না তারা। আর বললেও সত্যি কথা বলে না। নিজেরাও পরস্পরকে চোখে চোখে রাখে—কেউ যেন দলছুট হয়ে গিয়ে জনকে ব্যাপারটা জানিয়ে না দেয়। তারপর তারা দল বেঁধে যায় গ্রামের প্রধানের কাছে—জানায় আবেদন—জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। প্রধানের কাছে উদ্দেশ্যটাও বলে। প্রধান জানিয়ে দেয়—সুপারী, কিছু আতপ চাল, সরিষার তেল, সিঁদুর, শালগাছের নির্ধাস থেকে তৈরি ধুনো আর বেলপাতা—এই জিনিসগুলো না দিলে জনের ভর হবে না বা ধ্যানে বসবে না। বলাবাহুল্য সঙ্গে সঙ্গেই এসব জিনিস দিয়ে দেয়; এবং জনের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগও হয়ে যায়।

জন দেবতার মহিমায় বিরাজ করেন গ্রামে। তিনি ধ্যানে বসেন। তাঁর ওপরে দেবতার ভর হয়। তখন তিনি প্রকৃত ডাইনীর নামটি বলে দেন। খুশি হয়ে ফিরে যায় নিজের গ্রামে! কিন্তু—

ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বড়হড়াতে ডিবিয়া হেমব্রমের ছেলের অসুখ করল। বড়হড়ার বাসিন্দারা ডিবিয়ার স্ত্রীকে নিয়ে গেল ভিনগাঁয়ের 'জন' বা বড় ওঝার কাছে। জনের ভর হলো। তিনি বলে দিলেন—ছেলের মা—ছেলেকে খেয়েছে—

কী বলছেন! রুখে উঠল ডিবিয়ার বৌ। গ্রামের লোকও প্রতিবাদ করে বলল—ডিবিয়ার বৌয়ের চালচলন খুব ভাল। সে ডাইনী হতে পারে না—

না ছেলের মা ঠিক খায়নি। বোজাকে দিয়ে খাইয়েছে।

*ডাইনীর তুকতাকের জন্য অসুস্থ লোকটির কয়েকজন আত্মীয় আর যে স্ত্রীলোককে ডাইনী বলে সন্দেহ করা হয়েছে যে স্ত্রীলোককে তার স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষ আত্মীয় পরিজন এবং গ্রামের অধিবাসী ছয়জন সাক্ষী হিসেবে—সাধারণতঃ মনোনীত করা হতো।

গ্রামের লোক আরও ক্রুদ্ধ হলো। বলল, আপনি বাজে কথা বলছেন—

স্থানীয় লোকরা ভাবল, জনের ধ্যান বা ভরের ভেতরে নিশ্চয়ই কোন ভেজাল আছে। তারা জনকে বলল, আপনার কথার ভেতরে ওরা কথা বলতে কি করে সাহস পায়?

গুরুদেব বা জন দেখল তার চালাকি ধরা পড়ে গিয়েছে সেই রাত্রেই গুরুগিরির পাট চুকিয়ে অন্য গ্রামে চলে যায়।

ডাইনীর মন্ত্রে এবং তুকতাকে অসুস্থ হলে তার যেমন প্রতিকার তেমনি আছে ডাইনী বা শয়তানের সহচরী হয়ে মানুষের অনিষ্ঠসাধন থেকে নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা আছে।

গ্রামের নাম—গোরবন্দ। ডাইনীর শয়তানীতে অসুস্থ মানুষটির নাম—মংলু হেমব্রম। মংলুর সারা গায়ে গুটি বসন্ত বেরিয়ে গেল। জংগুরু এল। বলল, এই গ্রামেরই পাঁচজন ডাইনী করেছে এই সর্বনাশ। পাঁচজনেরই নাম বলল না। তাদের বাড়ির বিবরণ দিল। গ্রামের লোক সেই পাঁচটি বাড়িতে গিয়ে সন্দেহভাজন পাঁচজন যুবতীকে নিয়ে চলে এল মাঝিথানে। পাঁচ বাড়ির পাঁচ তরুণীকে বেদম প্রহার করতেই তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করল। গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট লোক এবং গ্রাম প্রধানকে নিয়ে তারা এল দুটো রাস্তার ক্রসিং-এ একটা পুকুরের ধারে। পুকুরের পাড়ের মাটি খুঁড়ে তারা বের করল একটা টিনের কৌটা। কৌটার গায়ে তেল সিঁদুর মাথানো। তার ঢাকনি খুলতেই বেরিয়ে এল স্ত্রীলোকের মাথার লম্বা চুল দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা এক টুকরো মাটির দলা—বলাবাহুল্য এটাই এই মন্ত্রপূত মাটির গুটিবসন্তের বীজ। মহাউল্লাসে গ্রামবাসীরা সেই সর্বনাশা বীজ আগুনে পুড়িয়ে দিল। পঞ্চায়েতের বিচারে ডাইনীদের প্রত্যেকের চার টাকা করে জরিমানা হলো। সেই বিশ টাকায় ডাইনীরা কিনে নিয়ে এল, একটি শুয়োর, একটি ছাগল, একটি ভেড়া, একটি কবুতর এবং চারটি মুরগী বোঙার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলি দিল।

মংলু হেমব্রম সুস্থ হয়ে উঠল।

এখানে বলা দরকার, প্রাকৃতিক নিয়মেও রোগের প্রকোপ কমে গিয়ে মংলু সুস্থ হতে পারে। কিন্তু সাঁওতালদের যুগযুগান্তরের দৃঢ়বিশ্বাস—উপরোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্যই মংলু আরোগ্য হয়েছে। তেমনি—

শত শত শতাব্দীর ব্যবধানে এসেও এতটুকু চিড় খায়নি—ডাইনীসংক্রান্ত এসব অন্ধবিশ্বাসে—ডাইনীরা বোঙার কাছ থেকে পায় অলৌকিক ক্ষমতা।

পায় মানুষের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করার বিস্ময়কর শক্তি। আর বোঙ্গার কাছে ভয়ানক অপবিত্র হলো মানুষের বিষ্ঠা এবং প্রস্রাব। এই দুটো বস্তু মিশিয়ে ডাইনীকে খাইয়ে দিলে বোঙ্গা তাকে চিরকালের মত ত্যাগ করে, এবং ডাইনী তার যাদুকরী শক্তি হারিয়ে ফেলে। Let her drink the mixture of human excrement and Urine, Bonga will not touch her and Witch will loose her magical power.

দুমকার খারা হাসদাকের বৌ বার বার ডাইনী বলে চিহ্নিত হচ্ছিল। তাকে গ্রামপ্রধান ডেকে নিয়ে এল মাঝিথানে পঞ্চায়েতের সভায়। গ্রামবাসীরা তাকে বলল, তুমি ডাইনীগিরি ছাড়বে কি না।

হ্যাঁ—আর আমি এপথে যাবো না, কারো অনিষ্ট করবো না, ঘোমটার আড়াল থেকেই বলল অনেক অপঘটনার নায়িকা—হাসদাকের তরুণী স্ত্রী—

বেশ—তোমাকে পরগণা বোঙ্গার থান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—তুমি আর কারো ক্ষতি করবে না—গ্রামের লোক একসঙ্গে বলল। আরো বলল, থান ছুঁয়ে তোমাকে আরও বলতে হবে—আবারও তোমার ডাইনীবিদ্যার ফলে কেউ অসুস্থ হয়েছে বা কারো মৃত্যু হয়েছে জানতে পারলে, তোমাকে এই গ্রাম ছেড়ে বাপের বাড়ির গ্রামে চলে যেতে হবে—

বেশ—পরগণা বোঙ্গার থান ছুঁয়েই বলবো—

না—না—তোমার জরিমানা হলো আড়াই টাকা। এই টাকায় একটা হাঁস কিনে তুমি বোঙ্গার পুজোর আয়োজন করো—যখন পূজা হবে—তুমি—প্রতিজ্ঞা করে বলবে—

গ্রামপ্রধানের নির্দেশমত কাজ করল হাসদাকের স্ত্রী।

সেদিন থেকে ডাইনীদের তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়ে গেল।

আরও অনেক ঘটনা, অনেক বিচিত্র বিশ্বাসের সূত্র ধরে সাঁওতালদের আরও অনেক অদ্ভুত ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন আর্চার সাহেব তাঁর প্রবন্ধে। সেসব ঘটনার ভেতরে একটি সত্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—ডাইনীর মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকের দ্বারা বীভৎস শয়তানী কার্যক্রমে তাদের অপরিমেয় নিবিড় বিশ্বাস। অনায়াসেই বলা যায়, শুধু সাঁওতাল নয়, উরাও, পাহান, কোল, ভীল সমগ্র এই উপমহাদেশের আদিবাসীদের সমাজ জীবনেরই ভয়াবহ অভিশাপ হলো ডাইনী! মনে হয়, সমাজের সবচাইতে নিচের তলায় পড়ে থাকে, ব্রাত্য এবং অবহেলিত বলেই ধর্মের ওপরে (বোঙ্গা বোঙ্গী) তাদের আস্থাটা অত্যন্ত বেশি। শূদ্রশক্তির বলিষ্ঠ সহজ সংস্কারে একবার যাকে মেনে নিয়েছে, সভাসমাজের যুক্তিতর্ক আর প্রবল অবিশ্বাসের চূড়ান্ত আঘাতেও তাকে এখনও এতটুকু ছাড়তে পারে নি। হয়তো কোনদিনই পারবে না।

বাইশ

শুধু ডুমকার সাঁওতাল পল্লীতে নয়। এই উপ-মহাদেশের বহু গ্রামে-গঞ্জেই চলছে ডাইনীবিদ্যার বিচিত্র রোমাঞ্চকর চর্চা।

সাঁওতাল পরগণার একদা 'দামনি কো'। (সাঁওতালী ভাষা—অর্থ পাহাড়ী-পরিষদ) নামে পরিচিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাঁওতালদের বা এই অঞ্চলের আদি-বাসীদের ডাইনীবিদ্যার প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং বীভৎস ক্রিয়াপ্রকরণের একটি অকাট্য যুক্তি আছে। তারা সাঁওতাল।

সভ্যভারত তাদের অবহেলা করে 'আদিবাসী' অ্যাখা দিয়ে আধুনিক জীবনচর্যা থেকে অনেক—অনেক দূরে গিরিবহুল অরণ্যের নিভৃতে নির্বাসিত করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের রেকর্ডে আছে—আদি-বাসীদের ধর্ম হলো—Animisim। অ্যানিমিজিমের অর্থ জড়োপসনা বা ভূতপূজা বা প্রেতবাদ। কিন্তু বর্ণহিন্দুরাও জড় মাটির পুতুলের পূজা করে এবং বিয়ে অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধের ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের বৈদিকমন্ত্রে প্রেতপূজার স্তোত্র এখনও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অথচ হিন্দুদের ধর্ম—'অ্যানিমিজম' বলা হয় নি। এবং উদার হিন্দুধর্মের বিস্তীর্ণ পরিসরে যেখানে একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী থেকে শুরু করে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব তান্ত্রিক, প্রেতপূজক পর্যন্ত সবারই স্থান আছে, সেখানে এই ভারত ভূখণ্ডেরই আদিম অধিবাসীদের (aborigins) স্থান হয় নি।

তাই অনায়াসেই বলা যায় সমাজতাত্বিক পরিভাষার আখ্যা 'আদিবাসী' লেবেল দিয়ে এবং জড়োপাসাক বলে যাদের পর্বতসমাকীর্ণ গভীর বনে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে তারা আদিম অরণ্যের কালো অন্ধকারে—খুব স্বাভাবিকভাবেই, প্রাথমিক জীবন যাপন করবে। তারা একতাল মাটির গায়ে তেলসিঁদুর মাখিয়ে বোঙা বলে পূজো করবে। বিনাদ্বিধায় স্ত্রী তার নিজের স্বামীর পেট চিরে ফেলে মন্ত্রবলে যকৃৎ খেয়ে ফেলবে, খাবে হৃদপিণ্ড। আবার জলাশয়ের ধারে গাছের ডাল বসিয়ে তার পাতার রঙ দেখে ডাইনী বের করবে। কিন্তু—

শুধু সাঁওতাল কেন? আর্চার সাহেব যেমন ডুমকায় ডেরা বেঁধে সাঁওতালদের তেমনি কোন মফস্বল শহরের প্রান্তে (জনবহুল ভারতীয় শহরে

ডাইনীবিদ্যার চর্চায় অনেক অসুবিধা) ক্যাম্প করে থাকলেও প্রত্যক্ষ করতে পারতেন—সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বর্ণহিন্দুদের ভেতরেও এখনও ডাইনীতন্ত্রে বিশ্বাস কত প্রবল। এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত বালুরঘাটের উপকণ্ঠে হোসেনপুরের ইটখোলার মালিক সুরেশ চৌধুরীর স্ত্রী তরঙ্গিণী যিনি খাদিমপুরের শ্মশানের পিশাচসিদ্ধ ভৈরবীর কাছে তার মেয়ের প্রেমিককে অসুস্থ করে দেওয়ার সর্বনাশা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তিনিও সম্ভ্রান্ত হিন্দুঘরের মহিলা। অতএব জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এদেশের সর্বস্তরের মানুষের ডাইনীবিদ্যার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বীভৎস ক্রিয়াকলাপের আরও নজির —আরও উদাহরণ না দিয়ে নিশ্চয়ই বলা দরকার, যত দিন যাচ্ছে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সওয়ার হয়ে সভ্যতা জোর কদমে ছুটছে আর তার আগ্রাসী বিস্তারে নির্জন নিভৃত অরণ্য (ডাইনীদের গোপনসমাবেশ ও সাধনভজনের স্থান) নির্মূল হচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের উপত্যকায় জনবিরল গ্রাম ততই শিথিল হয়ে আসছে ডাইনীতন্ত্রে বিশ্বাস, এবং ডাইনীবিদ্যার অনুশীলনও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসছে।

এই তথ্যটি পৃথিবীর সর্বত্র যেমন সত্য, তেমনি কত সত্য দেখুন আর্চার বর্ণিত সেই সাঁওতাল সমাজেও। তবে বলে রাখা দরকার, ১৯৪৪-৪৭ সালেরও নয় এবং সাঁওতাল পরগণারও সাঁওতাল নয় তারা। তাহলে—

কোথাকার? স্থান কাল পরে বলছি, আগে ঘটনাটা বলি বর্তমান গ্রন্থের উপাদান খুঁজতে বেরিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ফুলমণি।

সাঁওতাল যুবতী। বেশ হাসিখুশী। সরল। আমার প্রশ্ন—শুনেই খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। পড়ন্ত বিকেলের সোনার আলোয় তার হাস্যোচ্ছল প্রদীপ্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলাম। এরা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের স্বজাতি নয়? এরা কি ডাইনীবিদ্যার কোন খোঁজখবরই রাখে না।

হাসছো কেন?

কোন কথা বলল না ফুলমণি। কেন যেন ক্ষনকাল আগের সেই হাসির আলোয় উজ্জ্বল মুখখানা জুড়ে বিষণ্ণতার ছায়া থম থম করতে লাগল।

কিছু মনে করবেন না আপনি। বর্তমান গ্রন্থের মালমশলা জোগাড়ে আমার প্রধান সহায়তাকারী, স্থানীয় ছেলে প্রভাস হঠাৎ আমার কানের

* বালুরঘাটের উপকণ্ঠে কালিকাপুর গ্রাম।

কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, ওর লাইফে একটা ট্র্যাজেডি আছে—

দাদা, ডাইনী খুঁজতে এসেছেন, মৃদু কিন্তু কঠোর গলায় বলল ফুলমণি, জানতে এসেছেন, আমাদের এই গ্রামের আমার স্বজাতি সাঁওতালেরা ডাইনীবিদ্যার চর্চা করে কি না?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ফুলমণি, আমি উদগ্রীব হয়ে বললাম।

ডাইনী দেখতে চান দাদা, ভেতরে ভেতরে নিদারুণ যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে যেতে যেতে বলল, আমাকে দেখুন—আমাকে ভাল করে দেখুন—জানেন—ওরা আমাকে ডাইনী বলে—মেরে ফেলবে বলে শাসায় বলতে বলতে কেমন হিংস্র হয়ে উঠল। আগুনঝরা বড় বড় দুটো চোখে জল চিক চিক করছে।

কী ব্যাপার?

ফুলমণি অসঙ্কোচে বলেছিল তার জীবনের বৃত্তান্ত—এই গাঁয়েরই ছেলে হোপা মুরমুর সঙ্গে ভাবভালবাসা করে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু হোপা দিনরাত হাঁড়িয়া খায়। দারুণ অলস। কিছুতেই কাজে বেরোতে চায় না। এই নিয়ে ভীষণ অশান্তি চলতো। একদিন যখন সে খুব বকাবকি করছিল হঠাৎ হোপা তাকে বলল—তু আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যা—

ব্যস।

ফুলমণি একবস্ত্রে বেরিয়ে এল। হোপার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন রটিয়ে দিল সে—ডাইনী। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল ফুলমণি। চোখদুটো সরু করে বড় একটা ফাঁকা মাঠের প্রান্তে একটা দোকানের (মুদির না চায়ের দোকান দূর থেকে বুঝতে পারলাম না) বাঁশের মাচায় একদল সাঁওতাল যুবকের জটলার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওদের ভেতরে ওই শয়তানটাও আছে—সবকটা সমান। দিনরাত 'পচাই' গিলবে আর বসে থাকবে! ওরা—ওই ওরাই আমাকে 'ডাইনী' বলে—একটু থেমে আবার বলল, জেনে রাখবেন দাদা, ডাইনীর জন্ম হয় ওদের মত অলস শয়তান মানুষের মনে—

আমার বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে প্রভাস বলেছিল ফুলমণি ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের স্কুলে পড়াশুনা করেছে, দস্তুরমত ক্লাশ সিকস পাশ করেছে। এখন এখানকার এস. পি. সাহেবের বাড়িতে আয়ার কাজ করে—

রীতিমত ইস্ত্রী করা লাল টকটকে ব্লাউজের সঙ্গে ম্যাচ করানো লালপেড়ে শাড়ি পরা ফুলমণির* ভেতরে সাঁওতাল পরগণার ডুমডুমি গ্রামের রেংতা

১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে বালুরঘাট শহরের আত্রাই নদীর পারে আদিবাসী অধ্যুষিত এক গণ্ডগ্রামে ফুলমণির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

কিসকু কি রাহ্মীর কোন আভাসই পাওয়া গেল না। কিন্তু—

শুধু ফুলমণি নয়। একটু খোঁজখবর করলে দেখা যাবে, শুধু বালুরঘাটের উপকণ্ঠে সাঁওতাল তরুণী ফুলমণি কেন, ঠিক আধুনিককালের ভারতীয়দের (সমস্ত জাতি সমস্ত গোষ্ঠী) মতই সমগ্র আদিবাসী সমাজের ভেতরেও খুব দ্রুত সাংস্কৃতিক উত্থানপতন ও পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তাদের কোন গোষ্ঠীর ভেতরে কেউ সুপ্রাচীনকালের বিশ্বাস আর অন্ধসংস্কারকে যথের মত সর্তক প্রহরায় আগলে রেখে সাবেক জীবনধারার ভেতরে অনড় হয়ে আছে আবার কেউ বা সংস্কার এবং আজগুবি বিশ্বাসের অন্ধকার দুর্গ থেকে বেরিয়ে আধুনিক সমাজের জীবনচর্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছে।

ফুলমণির প্রসঙ্গে এত কথার অবতারনা করতে হলো, তার কারণ, হোপার (ফুলমণির ভূতপূর্ব স্বামী) বন্ধুরা এবং গ্রামের লোক যাকে ডাইনী বলে— সেই ডাইনীর পরিণতিটাও দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। অবশ্যই দেখেছিলাম একেবারেই আকস্মিক !

ফুলমণির সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়ের দিন দশেক পর। বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সংলগ্ন বিমলের হোটেলে বসে আছি। হোটেলটির চেহারা একেবারেই শ্রীহীন। মাটির মেঝে। তাও আবার এখানে সেখানে হাড়লগর্ত—কোথাও ইঁদুর মাটি তুলে স্তূপ করে রেখেছে। গোটা চারেক হাইবেঞ্চের ওপরে কলাইকরা স্টিলের থালা পাতাই আছে। প্রতিটি বেঞ্চে একটি করে কুপি জ্বলছে। কিন্তু—

এই চেহারার হোটেলেই দূর দূরান্তরের গ্রাম থেকে যেমন তেমনি শহরের লোকও আসে। গ্রামের লোক হাসপাতালে রোগী ভর্তি করে দিয়ে এখানে রাত্রিবাস করে। খায়। আর শহুরে মানুষের অধিকাংশই আসে কারণ ভূতের ওঝা বিমল। আর তার গা ছমছম করা ভূতের রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে অনেকে আসে বলা বাহুল্য আমিও গিয়েছিলাম যদি ডাইনী সম্বন্ধে কিছু নতুন কোন খোঁজখবর দিতে পারে।

মাঝবয়সী বিমল ডাকসাইটে ভূতের ওঝা। নদীর ওপারে বাড়ি। রাত দুটোর সময় সে আত্রাই নদী পেরিয়ে তার বাড়িতে যায়। যায় হনুমানজীর মন্দিরের কাছ ঘেসে হাসপাতালের বেওয়ারিশ মড়া যেখানে পুঁতে রাখা যেখানে বড় বড় লালচোখের মড়াখেকো কুকুর ঘুরে বেড়ায় সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটার ওপর দিয়ে।

দাদা ডাইনী বলুন আর প্রেতিনী বলুন—দুই সমান। টাকার এপিঠ আর

ওপিঠ—কেরোসিনের ডিবের ধোঁয়া ওঠা শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিমল যেন মনের গভীরে ডুব দিয়ে আস্তে আস্তে বলে, মানুষের ক্ষতি করা ছাড়া ওরা আর কিছু জানে না—একটু থেমে আবার বলল আমার কাছে বাবা কারো জারিজুরি খাটবে না—আমার পাল্লায় পড়লে একেবারে ঢিট করে দেব—

কি রকম? উপস্থিত সকলের চোখ জলজল করতে লাগল।

দাদা কলকাতা থেকে এসেছেন প্রভাস বলল, আপনার কিছু অভিজ্ঞতা বলুন না—ডাইনী নিয়ে বই লিখবেন—

বই! একেবারে কেঁচো হয়ে গেল বিমল। হাত জোড় করে করুণ গলায় বলল, আমি আকাঠ মুখ্যু মানুষ দাদা—আমি—কি—

কিছুতেই বলতে চায় না। প্রভাস তার বোকামির জন্য লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল। আমি বহু অনুরোধ করার পর বিমল বলতে শুরু করল—ডাইনী কি জানেন—জ্যান্ত পেত্নী। কালো কুচ্ছিৎ বুড়িথুড়ি কি বাঁজা রাঁড় মেয়েমানুষ ছাড়া ডাইনী হয় না দাদা।

কেন বলুন তো?

মনের ভেতরে থাকে বিছুটি লাগার মত জলুনি। জলুনির চোটে রাতদুপুরে ধুমধুম ন্যাংটো হয়ে বেরিয়ে পড়ে যার সর্বনাশ করতে হবে তার—

আপনি নিজে কোন ডাইনীকে কি শায়েস্তা করেছেন বলেছিলেন সেই ঘটনাটা—আমি বললাম—

ও—হ্যাঁ, আমাদের ডাকরায় এক বুড়ি ছিল, কুপির ছায়াকাঁপা আলোয় দেখা যায়, বিমলের কাঁচামাটির রাস্তার মত এবড়ো থেবড়ো মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই মাগী স্বামীকে খেয়েছিল বহুদিন আগে, জওয়ান দুটো ব্যাটাও খেয়ে বসেছিল। সে কেমন করে ব্যাটার মায়ের সুখ আহ্লাদ সহ্য করবে? সে করতো কি—যার ক্ষতি করতে হবে তার মাথার চুল কোন ভাবে জোগাড় করে—সেটা একটা লোহার শিকের সঙ্গে পেঁচিয়ে সেই শত্রুর বাড়ির ঈশান কোণে পুঁতে রাখত একটু থেমে আবার বলল, অবশ্যই সেই লোহার গায়ে তেলসিঁদুর মাখিয়ে তবে—

কিন্তু এসব করে কি সত্যিই মানুষের ক্ষতি করা যায়?

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না বহুদর্শী ওঝা বিমল মহান্ত, বলল, দাদা, ডাকরার সেই বুড়ি ডাইনীকে কেমন করে নাকানি চোবানি খাইয়েছিলাম—শুনুন তাহলে—

বনবিহারী মহান্তর বাইশ-তেইশ বছরের জওয়ান ছেলেটার জ্বর নেই নাড়ি

নেই—হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল।

বনবিহারী আমারই জ্ঞাতি ভাই। বোনোর ছেলেমানুষ বৌটা আমার পায়ে এসে কেঁদে পড়ল। আমি বললাম বৌমা—মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে—এটা ভূত পেত্নীর কাজ নয়—সাংঘাতিক সেই ডাইনী মাগীর কাজ, থেমে গেল বিমল। বলল আবার, বৌমাকে আর কিছু বললাম না। আমার মাথায় ফন্দী এসে গেল—থেমে গেল বিমল।

থামতে হলো। পতিরাম থেকে রোগী নিয়ে চলে এল চারজন খদ্দের। খাবে। থাকবে। তার ছেলে নীলুকে রান্না করে তাদের খাইয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়ে আবার এসে বসল তার ভাঙা ক্যাশবাকসটা ঠেস দিয়ে।

তারপর বিশদ করে যে বিবরণ দিয়েছিল তা যেমন দীর্ঘ, তেমনি অসংলগ্ন এবং অনেক কিছু অবান্তরও তার ভেতরে যেটুকু ডাইনী সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক, শুধু সংক্ষেপে সেটুকুই বলা হলো—

গভীর রাত্রে একেবারে উলঙ্গ ডাইনীকে যদি কেউ দেখে ফেলে এবং তাদের সর্বনাশা ক্রিয়ানুষ্ঠান হাতেনাতে ধরতে পারে তাহলে জীবন্ত প্রেতিনীদের বিষদাঁত ভেঙ্গে যায়।

বিমল রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে উঁচু একটা আমগাছের মগডালে বসে রইল। ওপারে বালুরঘাট ট্রেজারীর ঘড়িতে—ঢং—ঢং—করে রাত দুটো বাজল। ঘণ্টার ধাতব শব্দটা নদীর শাঁ শাঁ বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল বহুদূরে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল দূরে বহুদূরে বড় রাস্তা দিয়ে একটা আলোর দৈত্য যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। কী ব্যাপার! ও—কলকাতার বাস! কিন্তু—

চারিদিকের জমাট ঘুটঘুটি অন্ধকারে তো সেই ডাইনীর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ নজরে পড়ল, সুনীল খাঁদের বাঁশের ঝোপের জমাট অন্ধকারে টিম টিম করছে আলোর বিন্দু। সেই আলোর ফুটকি ক্রমশ কাছে আসতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল ঘন জমাট অন্ধকারে আরো একছোপ সেই নিকষ কালো ছায়ার মত কদাকার বৃদ্ধার উলঙ্গ মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল বিমল। ডাইনীর প্রাণেও তো ভয় আছে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বেদম প্রহার দিয়ে বলল, বল—বোনোর ব্যাটাকে কি গুণমন্তর করেছিস।

ডাইনী দোষ কবুল করল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মানুষের বিষ্ঠা খাইয়ে দেওয়া হলো। রোগী আস্তে আস্তে ভাল হলো—ডাইনীর অলৌকিক ক্ষমতা লুপ্ত

হয়ে গেল—

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল বিমল মহান্ত।

এখনও কি বালুরঘাটে কোন ডাইনী আছে, আমি বললাম, যদি তার সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে দিতে পারেন।

কোন কথা বলল না বিমল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, এখন আর এসব কেউ করে বলে জানি না—

সাতদিন পর।

আবার একদিন বিমলের হোটেলে গিয়েছি। সেখানে বসে ডাইনী প্রসঙ্গেই আলোচনা করছি। তখন বিকেল চারটে হবে! হঠাৎ বিমলের ছেলে নীলু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, জানো বাবা একটা সাঁওতাল মেয়েকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে—তার কাছে না কি পিস্তল পাওয়া গেছে—

সাঁওতাল মেয়ে!

পিস্তল।

আমি একটু অবাক হলাম। কিন্তু কেন যেন হঠাৎ চোখের সামনে কালিকাপুরের ফুলমণির চেহারা ভেসে উঠল। তাড়াতাড়ি করে থানার দিকে গেলাম। কিন্তু—

যেতে হলো না। বিমলের দোকান থেকে বেরিয়ে কয়েক পা যেতেই থমকে দাঁড়ালো আমার হৃদস্পন্দন।

কালিকাপুরের হোপা সরেনের স্ত্রী—সেই 'ফুলমণি' সমস্ত গ্রাম যাকে বলে—ডাইনী!

সেই ডাইনীরই কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে চলেছে পুলিশ।

বালুরঘাট থানার সদর পুলিশ ইন্সপেকটারের কাছে জেনেছিলাম ফুলমণির বৃত্তান্ত—

যদিও সেই বিবরণ ফুলমনি এবং হোপার একান্তই ব্যক্তিগত। তবুও বলা দরকার অবশ্যই যেটুকু ইন্সপেক্টারের কাছে শুনেছিলাম—

হোপা নাকি ফুলমণির কাছে প্রায়ই আসতো। আসতো মদ বা তাড়ি খাওয়ার জন্য টাকা নিতে। ছাড়াছাড়ি হলেও ফুলমণি প্রথম প্রথম নাকি যা পারতো দিত। দিত—তার কারণ একদিন তো সে হোপাকে ভালবাসতো কিন্তু যত দিন যেতে লাগল—ততই হোপা খুব ঘন ঘন ফুলমণিকে বিরক্ত করতে

শুরু করল। একদিন—

ফুলমণি আপত্তি করল। হোপা রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল—তুই ডাইনী! তোকে দেখে নেব—

পরদিনই হোপা তার একদল বন্ধু নিয়ে ফুলমণির ঘরে চড়াও হয়েছিল। নিজে আত্মরক্ষার জন্য কাটারি দিয়ে তার পিঠ কেটে দিয়েছিল। পিস্তলটা রটনা।

খুনের চার্জে ফুলমণিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মনে রাখা দরকার—ফুলমণি যেমন সাঁওতালের মেয়ে হয়েও কিছুটা আলোকপ্রাপ্ত তেমনি আজও শুধু সাঁওতাল পরগণায় নয়, বালুরঘাটে নয়—এই উপমহাদেশের গ্রামে গঞ্জে এবং অনেক শহরেও খুব তন্ন তন্ন করে খুঁজলে এখনও দেখা যাবে—বহু উচ্চ শিক্ষিত মেয়েপুরুষও মানুষের অনিষ্ঠ করার জন্য শয়তানী সাধনা বা Black Mass (অবশ্যই তার প্রক্রিয়া বা ক্রিয়াপ্রকরণ অন্যরকম) করে চলেছে আজও—

তেইশ

শিক্ষিত, অভিজাত গৃহস্থঘরের বধূও ডাইনীবিদ্যার কবলে পড়ে। আর সেই অভিশপ্ত চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে কি?

বালুরঘাট শহরের দিকে দিকে জেগেছিল তীব্র চাঞ্চল্য।

বছর পঁয়ত্রিশেক আগেকার কথা। স্টেটব্যাঙ্কের পাড়া অর্থাৎ চকভবানীতে শুরু হয়েছিল ডাইনীর নিরবিচ্ছিন্ন অত্যাচার। তাহলে বলতে হয় একেবারে গোড়া থেকে—

কালীবাড়ি থেকে কাঁচামাটির যে রাস্তাটি গার্লস স্কুলের পিছন দিক দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে আত্রাই নদীর ঘাটে—সেই রাস্তার ডানদিকেই বালুরঘাটের অসামান্য জনপ্রিয় জননেত্রী লক্ষ্মী বৌয়ের বাড়ি।

লক্ষ্মী বৌ। বিচিত্র এই নামটুকুর আছে এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস। একবার তার ভারী অসুখ করেছিল। তীব্র জ্বর আর বুকে ব্যথা। বিছানা থেকে উঠতে পারে না। শহরের বড় বড় ডাক্তার এল। কেউই আর রোগ ধরতে পারে না। কত রকমের ঔষধ খাওয়ানো হলো। কিছুতেই জ্বর আর ছাড়ে না। ইতিমধ্যে হঠাৎ—

একটি কাণ্ড ঘটে গেল। একদিন শেষরাত্রে দেখা গেল বিছানায় নেই লক্ষ্মী বৌ। সে কী! যে মানুষ তক্তাপোষ থেকে উঠতে পারে না সে গেল কোথায়—কোথায় যেতে পারে?

বাড়ির ছেলেরা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল তাঁকে খুঁজতে। দেখা গেল বাড়ির পিছনে বাঁশবনের জঙ্গলের অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তির মত ঘুরছে লক্ষ্মী বৌ। ছেলেরা চিৎকার করে ডাকল—কাকীমা—কাকীমা—

কেমন অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতর থেকে অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল লক্ষ্মী বৌ—ও যে আমাকে ডাকল! বলতে না বলতেই সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে এলে আস্তে আস্তে বলল, একটা খুব রূপবতী মেয়ে স্বপ্নের ভেতরে এসে বলল, আমি তো সেই থেকে বাইরে বাইরে ঘুরছি—আমাকে তোর বাড়িতে প্রতিষ্ঠা কর—একটু থেমেই আবার অস্ফুট আর্তনাদ করে বলল, মা লক্ষ্মী—মা লক্ষ্মীই ছোটমেয়ের রূপ ধরে এসেছিল—তাঁর খোঁজেই

আমি বাঁশবনের দিকে গিয়েছিলাম.তোমরা তাঁকে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করো—

পরদিন মহাসমারোহে মা লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল—লক্ষ্মী বৌ।

লক্ষ্মী বৌয়ের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। বছর দশ বারো আগে কোলে একমাত্র পুত্র সন্তোষকে নিয়ে বিধবা হয়েছে সে। সন্তোষ তার চোখের মণি। বুকের ভেতরে প্রাণের ধুকধুকির মত। একদণ্ড চোখের আড়াল করে না সন্তোষকে। এমন কি খাড়িপারে মহিলা সমিতির মিটিং-এ গেলেও সন্তোষকে সঙ্গে নিয়ে যেত।

আর লক্ষ্মী বৌকে ছাড়া মহিলা সমিতি চলতোও না। তাঁতঘরে তাঁত বসবে। তদ্বির তদারকি করবে কে? লক্ষ্মী বৌ; মেয়েদের সেলাই শেখানোর ক্লাস বসবে। দেখাশোনা করবে কে? লক্ষ্মী বৌ! বালুরঘাট মহিলা সমিতির যাবতীয় কর্মযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক হলো—লক্ষ্মী বৌ!

লক্ষ্মী বৌয়ের কাছে অনেক মহিলাই আসতো নানা সমস্যা নিয়ে। মুনিও এসেছিল। মুনি ওরফে মণিদীপা চ্যাটার্জী। বালুরঘাটের প্রবীন উকিল, দুঃখহরণ চক্রবর্তীর বড় মেয়ে। লক্ষ্মী বৌয়ের বয়সীই হবে। পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ের মা। স্বামী রমনীবল্লভ স্কুলমাস্টার। বড় কষ্ট করে চলে তার সংসার। নিত্যদিন তেল আনতে নুন ফুরায়।

লক্ষ্মী বৌ, তুই আমার বড় মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করে দে, কেঁদে পড়ল মুনি লক্ষ্মী বৌয়ের পায়ে।

আরে—আরে করিস কি—কি করতে হবে বল?

নার্সিং ট্রেনিং-এ মেয়েদের নিচ্ছে—তুই একটু সুপারিশ করে দিলেই হয়ে যাবে—

আচ্ছা কোন পর্যন্ত পড়েছে তোর মেয়ে—

স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে—থার্ড ডিভিসন—

পাশ করেছে! বাঃ তুই ওর একটা দরখাস্ত নিয়ে আসিস—

খুশির আলো জলজল করতে লাগল মুনির মুখে। হঠাৎ সে লক্ষ্মী বৌয়ের খুব কাছে এসে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, সে কী রে—মাথাটাকে কি করে রেখেছিস—কী সুন্দর চুল—বলেই চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে দ্রুত হাতে গম্বুজ খোপা বেঁধে দিল মুনি। আবার তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্মী বৌয়ের হাত পা-র দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ইস্ কী বড় বড় নখ তোর! তুই শরীরের এতটুকু যত্ন নিস না। বলতে বলতেই নরুন দিয়ে তার নখ কাটতে শুরু করল মুনি!

খুশির উচ্ছ্বাসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে মুনি। মেয়েকে নার্সিং ট্রেনিং-এ লক্ষ্মী বৌ দিতে পারবে জেনে মুনি তাকে (লক্ষ্মী বৌ) নিয়ে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। লক্ষ্মী বৌয়ের পিঠে, বুকে হাত দিয়ে বলল, ইস তোর গায়ে কী ময়লা। বলেই ডলে ডলে কিছু ময়লা তুলে দেখিয়ে দিল মুনি। বলল, তুই সাবান দিয়ে স্নান করিস না?

বিধবা মানুষ—আমি, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল লক্ষ্মী বৌ—আমার আবার অত—

ওমা! বিধবা বলে কি তুই মানুষ না? আরও কিছুক্ষণ বক বক করে চলে গেল মুনি। যাওয়ার সময় বলে গেল, মেয়ের দরখাস্ত নিয়ে খুব শীগগীরই আসবে—

সেই দিনই নিশিরাত্রে লক্ষ্মী বৌয়ের বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটে গেল—

মধ্যরাত্রে সারা পৃথিবী যখন সুষুপ্ত, যখন রাশি রাশি তারা আর নক্ষত্রের ঝাঁক বুকে নিয়ে দোল খাচ্ছে অদূরে আত্রাই নদীর জল, যখন বালুরঘাট ট্রেজারীর পেটা ঘড়িতে ঢং—ঢং করে রাত্রি দুটো বাজল আর তার শব্দটা বাতাসের সওয়ার হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল দূরে ডাকরা, বেলান ছাড়িয়ে চকচন্দন চকভৃগুর দিকে ঠিক তখন—

তখন লক্ষ্মী বৌয়ের ঘর থেকে ভেসে এল একটা আর্তচিৎকার—কে ওখানে? —কে—কে—কে?

বাড়ির ছেলেরা ছুটে এল। কি ব্যাপার—কি হয়েছে? লক্ষ্মী বৌ জানালো একটা ছায়ামূর্তি না কি তার জানালার নিচ দিয়ে ছুটে চলে গেল। লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। কাউকেই দেখা গেল না।

•

মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট প্রভাবতীদেবী সব বৃত্তান্ত শুনে বললেন, তোমার যদি কেউ ক্ষতি করে আমরা ছেড়ে কথা কবো না—

রাত্রে মহিলা সমিতির দুইজন বর্ষীয়ান মহিলা লক্ষ্মী বৌয়ের ঘরে থাকল—যদি সেই ছায়ামূর্তির রহস্যের সমাধান করা যায়!

সেদিন রাত্রে আর কাউকেই দেখা গেল না। তার দিনতিনেক পরেই সন্তোষের জ্বর এল। দিনে দিনে জ্বর বাড়তে লাগল। শহরের সবচেয়ে নামজাদা ডাক্তার সুনীল চ্যাটার্জী এলেন। অনেকক্ষণ ধরে রোগী পরীক্ষা করে অনেক ভেবে চিন্তে ওষুধ দিলেন। কিছুই হলো না। জ্বর কমল না!

বরং বেড়েই চলল। প্রভাবতীদেবী নিউটাউনের জেনারেল হসপিট্যাল থেকে সিভিল সার্জেনকে কল দিয়ে নিয়ে এলেন—তিনি রোগীর জিভ দেখেই বললেন—জ্বরটা টাইফয়েডে টার্ণ নিয়েছে—শুরু করলেন টাইফয়েডের চিকিৎসা।

কিন্তু সিভিল সার্জেনের ওষুধেও জ্বরের উপশম হলো না। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল লক্ষ্মী বৌ। খায় না। স্নান করে না। অষ্টপ্রহর ছেলের মাথার কাছে বসে থাকে। আর আকুল হয়ে কাঁদে। দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা।

দীর্ঘদিনের অনশন এবং অনিয়ম অত্যাচারে আবার একদিন লক্ষ্মী বৌয়ের সংজ্ঞা লোপ পেল। অচৈতন্য অবস্থায় অস্ফুটস্বরে বলতে শুরু করল—আমার ছেলের অসুখ হবে না—হবেই তো—মা-র এক ছেলের ওপরে যে ওদের খুব রোখ—দেখবে গেটের ডানদিকে রাক্ষসী মাটিতে পুঁতে রেখেছে—নখ, চুল, গায়ের ময়লা আর একটা লোহার শিক ও একটি জবা ফুল—একটু থেমে আবার বলে—মাটি খুঁড়ে ওইসব জিনিস বের করে তার ওপর প্রস্রাব করলে তবে তার দ্রব্যগুণ নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমার সন্তোষ ভাল হয়ে উঠবে—

বাড়িতে উপস্থিত সকলেই মনে করল, অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বকছে লক্ষ্মী বৌ। কিন্তু কেউ আর সাহস করে ডাইনীর জিনিস খুঁড়ে বের করতে চায় না। সাহসও পায় না মূত্রত্যাগ করতে।

এদিকে সন্তোষের অসুখ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। একশো পাঁচ ডিগ্রী থেকে জ্বর আর নামছে না। লক্ষ্মী বৌ অঝোরে কাঁদছে। মহিলা সমিতির সদস্যরা তাকে ঘিরে বসে রয়েছে এবং সান্ত্বনা দিচ্ছে। এবং তাদের কেউ কেউ সন্তোষের মাথায় জল দিয়ে চলেছে।

সিভিল সার্জেন নানারকমের ওষুধ দিয়ে চলেছেন। আর বলছেন, টাইফয়েডেরও তো তেমন কোন পজিটিভ ফাইডিংস পাচ্ছি না—একটু ভেবে আবার যেন নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বললেন, আর দুদিন দেখে পেশেন্টকে কলকাতা পাঠাতে হবে।

ব্যথার ছায়া থম থম করতে লাগল লক্ষ্মী বৌয়ের মুখে।

প্রভাবতীদেবী তাঁর সমিতির মহিলাদের বললেন, লক্ষ্মী বৌ অজ্ঞান অবস্থায় যা বলছিল তা একবার ভেরিফাই করলে হতো না?

কিন্তু কেউই যে গেটের ডানদিকের মাটি খুঁড়তে চায় না দিদি—

তাই বলে ছেলেটা মরে যাবে? নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বললেন, ডাইনীবিদ্যা কি তুকতাকে যে কোন ফলই হয় না তা তো নয়—

আপনি খুঁড়তে বলছেন দিদি, পাশের বাড়ির ধনা ওরফে ধনগোপাল বলল, আমি খুঁড়ে দিতে পারি—কিন্তু প্রস্রাব করতে পারবো না—

বেশ খুঁড়েই দাও—বললেন প্রভাবতীদেবী, একটু হেসে আবার বললেন, তারপরের কাজটা কে করে দেখবো—

ধনা খুঁড়তে শুরু করল। সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ল লক্ষ্মী বৌয়ের বাড়িতে। থানা থেকে ডি. এস. পি সাহেবও কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে চলে এলেন।

দেখিস—নিশ্চয়ই ডাইনীর গুণমন্তের জিনিস পাওয়া যাবে—

আরে—না—না—লক্ষ্মী বৌ অজ্ঞান অবস্থায় কি বলতে কি বলেছেন—

দেখবি, সবই ভাঁওতাবাজি—কিছু না ব্যাপারটা—

জনতার মৃদু গুঞ্জন বচসায় পরিণত হয়। এমন সময় ধনা উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে—পেয়েছি-পেয়েছি—ওই তো নোংরা কাপড়ে জড়ানো কি ওটা?

পুঁটলী খুলে ফেল—খুলে ফেল—বলছে সবাই। কিন্তু কেউ আর এগিয়ে এসে খুলতে সাহস করে না। প্রত্যেকেরই মনের ভেতরে আজন্ম কালের কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বাবা—ডাইনীর জিনিস—স্পর্শ করলেই যদি কোন অমঙ্গল হয়—

বেলা বাড়তে লাগল, সেই সঙ্গে লক্ষ্মী বৌয়ের বাড়িতে ভীড়ও বাড়তে লাগল। ওদিকে সন্তোষের জ্বরও বেড়ে চলেছে। এইরকম যখন অচল অবস্থা তখুনি একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

জমাট ভীড়ের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে বললেন আশীবছরের বৃদ্ধ—শশীভূষণ সেন, আমার তিনকাল পেরিয়ে এককালে ঠেকেছে—যদি মা লক্ষ্মীরা আপত্তি না করেন—তাহলে আমি প্রস্রাব করতে পারি—

ভালো—ভালো খুব ভালো, জনতা সমস্বরে বলে উঠল।

জয়—শশীবাবুর জয় হোক—জয়ধ্বনি উঠল শশীবাবুর নামে।

শশীবাবু। পাকা বাঁশের মত দীর্ঘ ঋজু চেহারা। যৌবনে ছিলেন ওস্তাদ শিকারী। খুব উঁচু কাঁঠাল গাছের মগডালে পেঁচিয়ে থাকা দাঁড়াস সাপকে নিচ থেকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারতেন। চিরকালই অত্যন্ত বেপরোয়া। ডাকাবুকো ধরনের মানুষ!

পুঁটলী খুলে পাওয়া গেল—নখ, চুল, একটা লোহার শিক এবং একটি জবাফুল। শশীবাবু ডাইনীর সেইসব জিনিসের পুঁটলীর ওপরে প্রস্রাব করলেন।

সন্তোষের জ্বর নামতে শুরু করল। সেই ভেজা পুঁটলীটায় আগুন জেলে

পোড়ানো হলো।

সুস্থ হয়ে উঠল সন্তোষ।

তোমার কাকে সন্দেহ হয় বলো লক্ষ্মীদি, বললেন প্রভাবতীদেবী। লক্ষ্মী বৌ সেই গভীর রাত্রে ছায়ামূর্তি থেকে শুরু করে মুনির সেই তার দাঁত—নখ—চুল নিয়ে বিচিত্র কার্যকলাপের কথা সব বলল।

প্রভাবতীদেবী থানা থেকে পুলিশ নিয়ে যেয়ে ঘেরাও করল মুনির বাড়ি। থানার বড়বাবু মুনিকে জেরা করলেন—কী ব্যাপার, আপনি লক্ষ্মী বৌয়ের বাড়ির গেটের ডানদিকে নখ—চুল—লোহার শিক জবা ফুল সব রেখেছেন?

কোন কথা বলে না মুনি।

শুধু আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—অস্ফুটস্বরে—হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?—কেন? বাজখাই গলায় গর্জন করে উঠলেন বড়বাবু—ওনার (লক্ষ্মী বৌ) ক্ষতি করে আপনার লাভ?

একটা কথাও বলল না মুনি। শুধু কে জানে, কিসের যন্ত্রণায় আর কান্নার ইঙ্গিতে তার ধারালো ছোট্ট মুখখানা কেমন কুৎসিত হয়ে উঠল। তার চোখদুটো ফেটে জল এসে পড়ল। এই সর্বনাশা বিদ্যা শেখার পর কোথাও প্রয়োগ করতে না পারলে সে শান্তি পায় না।—এই কথাগুলো তো কাউকে বলে বোঝানো যায় না। তাই—

তাই নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল মুনি ওরফে মনিদীপা চট্টোপাধ্যায়।

মুনি ডাইনী।

বালুরঘাটের দিকে দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল—দুঃখহরণের বড় মেয়ে এবং হাইস্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক রমনীবল্লভের স্ত্রী মুনি ডাইনী।

রমনীবল্লভ একটা কথাও বলে না স্ত্রীর সঙ্গে। আর বলবেই বা কি? তিনি দস্তুর মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর এম. এ.! যেমন অগাধ জ্ঞান তেমনি শিক্ষকতায় তার সুনাম আছে প্রচুর। ছাত্রদের মনে তিনি বিরাজ করেন সম্রাটের মহিমায়।

সেদিন সকালে নিবিড় মনযোগে শেলীর কবিতাসমগ্র পড়ছিলেন রমনীবল্লভ। সামনে গন্ধধূপ জ্বলছে। ধূপের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। চারিদিকে একটা আরাত্রিক পবিত্রতা বিরাজ করছে—

তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন গো? রমনীবল্লভের পিঠ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কিশোরী প্রেমিকার মত অভিমান করে বলল মুনি।

কোন কথা বললেন না রমনীবল্লভ। স্থির দৃষ্টিতে বইয়ের দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

আঃ কেন বিরক্ত করছো বলো তো ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়ালেন রমনীবল্লভ। দাঁতে দাঁত ঘসে চিবিয়ে বললেন, একটা ডাইনীর সঙ্গে আবার কি কথা বলবো?

একটা কথাও বলল না মুনি। শুধু হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত বিষাক্ত চোখে একবার রমনীবল্লভের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

দিন যায়। সপ্তাহ যায়। যায় মাসও। রমনীবল্লভ স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। তার সঙ্গে এক শয্যায় থাকেন না। এমন কি মুনির হাতের রান্না পর্যন্ত খান না!

আত্রাই নদীর বাঁধের ওপরে উকিল দুঃখহরণের বাড়ি অর্থাৎ মুনির বাপের বাড়ি। মুনির বাবা মারা গেছেন কয়েক বছর হলো। ভাইদের সংসারে বাস করেন মা।

ডাইনীবিদ্যার গুরু তার মায়ের পায়ের ওপর কেঁদে পড়ল মুনি। কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, কী বিদ্যাই শিখিয়েছ মা—কেউ কথা বলে না। সবাই ভয়ের চোখে তাকায়—

কি হয়েছে—কি? বাঁশ ফাটার আওয়াজের মত কর্কশ কণ্ঠে বলল দুঃখহরণের স্ত্রী নগনন্দিনী।

মুনি কাঁদতে কাঁদতে বলল রমনীবল্লভের নিরুত্তাপ ব্যবহারের কথা, তার হাতে না খাওয়া—এক শয্যায় না থাকা—সব বৃত্তান্তই বিস্তারিত এবং খোলাখুলি বলল মাকে।

নগনন্দিনী কোন কথা বলল না। শুধু তার চোয়ালদুটো খিলের মত শক্ত হয়ে এঁটে বসল তার গালে। অস্ফুটস্বরে শুধু মেয়েকে বলল, কিছু ভাবিস না। তুই যা তোর বাড়িতে—আমি তোর ব্যবস্থা করছি—

কি ব্যবস্থা—করবে মা?

এমন করে দেব—রমনী তোর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়বে। ওর বিষদাঁত ভেঙ্গে যাবে—

বলো কি মা? আনন্দে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল মুনি।

কি ব্যবস্থা করবে মা—কি এমন ব্যবস্থা হতে পারে! সে—তো তারই শিষ্যা। পুরোপুরি ডাইনী। তাকে তো বলতে পারতো মা! আবার

মনে হলো, কোন তুকতাক কি গুণমন্ত্র করতে গিয়ে ওর জীবনহানি হবে না তো? আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে।

মার নির্দেশানুযায়ী একদিন জোর করেই রান্না করল মুনি। রমনীবল্লভও স্টোভে ভাত চাপিয়ে দিলেন। রান্নার পর খাওয়ার ঘরে চমৎকার করে আসন পাতল মুনি। ডানদিকে জলের গ্লাস দিয়ে ডাকতে এল স্বামীকে।

তোমার হাতে আমি খাবো না—খেতে পারি না—গম্ভীর আর কঠোর গলায় বললেন রমনীবল্লভ। তবুও তার নিষেধ শুনল না মুনি। জোর করে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে রমনীবল্লভকে আসনে বসালো।

রমনীবল্লভ বসলেন। কিন্তু যেই থালায় ভাত দিল মুনি—অমনি থালাটাকে কৃষ্ণের সুদর্শনচক্রের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন উঠানে। আর উঠে চলে গেলেন জুতো মসমসিয়ে স্কুলে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুনি ওরফে মনিদীপা চট্টোপাধ্যায়। কেন যে সে ডাইনী হতে গেল—কেন যে এই সর্বনাশ আত্মঘাতী বিদ্যা তার মা—তাকে শেখাতে গেল!

ভরদুপুরে সেইদিনই মুনি গেল মার কাছে। খেতে বসে থালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার বিশদ বিবরণ শুনল নগনন্দিনী। নিজের মনেই বলল, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

কি বলছো মা?

কিছু না—

রমনী রাত্রে কটার সময় শুতে যায়?

রাত দশটায়।

সকালে কখন খেয়ে স্কুলে বেরোয়?

সাড়ে দশটা থেকে সকাল এগারটার মধ্যে বেরিয়ে যায় মা, কেমন উৎসুক আর উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে মুনি—তুমি কেন অত খোঁজ নিচ্ছ মা—

তোর জানার দরকার নেই—তুই শুধু একবার সন্ধের সময় আসিস—

স্কুলের টিচার্স হলে প্রসঙ্গ তুলল সংস্কৃতের পণ্ডিত হেরম্ব ভটাচার্য—কী ব্যাপার রমনীবাবু আপনি না কি স্ত্রীকে ডিভোর্স করছেন?

সেসব একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার—আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না, কঠোর গলায় বলল রমনীবল্লভ।

কিন্তু স্ত্রী যদি সত্যিই ডাইনী হয়, তাহলে বাংলার টিচার, উপেনবাবু বললেন, তাহলে রমণীবাবু আর কি করে ঘর করবেন—

কোন কথা বলল না রমনীবল্লভ। যারা তার চোখের সামনে দাঁড়াতে পারে না—আজ তাদেরই উপহাসের পাত্র হয়েছে সে।

সবই কপাল। এম. এ. বি. এল প্রীডার দুঃখহরণ চক্রবর্তী ছিলেন যেমন বিদ্বান তেমনি সুপুরুষ। সুদর্শন। তাকে দেখেই সে তার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রদীপের তলায় যে এত অন্ধকার থাকতে পারে তা কল্পনাও করতে পারে নি সে। মণিদীপা যে শুধু লেখাপড়া জানে না—তা নয়—কুৎসিত ডাইনীবিদ্যার চর্চা করে সে। ছোটলোকের মত।

কেমন করে সে তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দেবে?

দুটো টিউশনি শেষ করে একটু বেশি রাত্রে বাড়িতে ফিরে এল রমনীবল্লভ। উঠোনে পা দিতেই তার নজরে পড়ল, দূরে রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। ল্যাম্পের আলোর রক্তাভ শিখায় দেখা যায়, রমনীবল্লভের ভাত বেড়ে নিয়ে একটা ছবির মত বসে রয়েছে মণিদীপা!

রমনীর পায়ের শব্দ পেয়েই উঠে দাঁড়ালো মুনি। খরচোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জরিপ করতে চেষ্টা করল, কিছু বুঝতে পেরেছে কি না?

না। বেশ হাসি হাসি মুখ। ভেতরে ভেতরে খুশির ফোয়ারা যেন নিঃশব্দে ঝরে ঝরে পড়ছে। বাব্বাঃ কে জানে কার মুখ দেখে সে উঠেছিল বিছানা থেকে।

রমনী রান্নাঘরের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে শোয়ার ঘরে গেল জামা কাপড় ছাড়তে। ভাতের থালা সাজিয়ে নিয়ে অধীর আগ্রহে তারই প্রতীক্ষা করতে দেখে বুকের ভেতরটা তার মুচড়ে উঠেছে। মুনি লেখাপড়া জানে না। বিদ্যায় সংস্কৃতিতে তার সঙ্গে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান। কোনদিনই সে তার মনের সঙ্গিনী হতে পারবে না। না পারুক। তবুও তো সে তার স্ত্রী। মহাকবি সেকসপীয়রের স্ত্রী অ্যানাও লেখাপড়া জানতেন না। হোক মুনি নিরক্ষর। সে মহাকবি শেলীর সেই Eaternal Light বা শাশ্বত আলোর মত তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তাকে উদ্ধার করবে--নোংরা ডাইনীবিদ্যার কারাগার থেকে।

বেশ খুশি মন নিয়ে খেতে বসল রমনীবল্লভ। বলল মুনিকে—তোমাকে আজ কটা কথা বলবো—

এখুনি বল না গো?

এখন নয় বলবোক্ষণ—

তীব্র আনন্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে মুনির ভেতরটা।

রাত্রে বিছানায় এসেই তীক্ষ্ণ চোখে মুনি লক্ষ্য করল, সব ঠিক আছে কি না?

সব ঠিক! কোথাও এতটুকু উঁচু নীচু নেই। নিপাট শয্যা! মুনিকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বলল রমনী, জানো—বালুরঘাট বাজারে, নদীরঘাটে, স্কুলের টিচার্স কমনরুমে সর্বত্র তোমার আলোচনা—তুমি না কি ডাইনী—আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

কোন কথা বলে না মুনি।

আমার মাথা স্পর্শ করে তোমাকে দিব্যি করতে হবে—তুমি আর কখনও ডাইনীবিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে না—কারো অনিষ্ঠ করবে না—

একটা কথাও বলল না মুনি। শুধু রমনীর কবোষ্ণ সান্নিধ্যে বর্ষার কদম ফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্বামীর বুকে মাথা ঘসতে ঘসতে বলল, এই দিব্যি করে বলছি—যে কাজ তুমি পছন্দ করো না—সে কাজ কখনো করবো না আমি—

বাইরে প্রগাঢ় নিস্তব্ধ নিশিরাত মধুর সুখে যেন আবিষ্ট হয়ে গেল।

পরদিনই তীব্র আনন্দে যেন পাখির মত ডানা মেলে উড়ে এল মুনি তার মায়ের কাছে। বলল, মা তোমার ওষুধ ধরেছে। আমাকে খুব ভালবাসছে—

—খবরদার—চুপ—এত জোরে কথা বলছিস কেন? জানবি দেওয়ালেরও কান থাকে—বলেই মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল কতগুলো কথা—

তার উত্তরে মুনি শুধু বলল, আরও সাতদিন?

হ্যাঁ, ডাইনীবিদ্যার গুরু বৃদ্ধা—মুনির মা বলল—পুরো এক সপ্তাহ না কাটলে কিছু বলা যায় না—

কিন্তু সেইদিনই স্কুল থেকে রমনী বাড়িতে ফিরে আসার পরই কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেল। একটা খুব প্রয়োজনীয় নোট খাতা খুঁজতে খুঁজতে বিছানার তোষক তুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা কাগজের প্যাকেট!

চমকে উঠল রমনী। এটা কি—কি হতে পারে? প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল রঙের একটা নতুন গামছা! গামছাটা আবার কেমন ভেজা ভেজা।

আহত বাঘের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রমনী। মুনির হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল—বলো কিসের গামছা? বলো আমার কী সর্বনাশ করার চেষ্টা করেছিলে?

কোন কথা বলে না মুনি। কি-ই বা বলবে আর কেমন করেই বা বলবে—তাকে বশ করার জন্য এবং বিশ্বস্ত কুকুরের মত মনিবের পায়ে পড়ে থাকবে এই আশায় মা মন্ত্রপূত গামছা তার বিছানার নিচে রাখতে বলেছিল।

কী চুপ করে আছো কেন? খোঁচা খাওয়া হিংস্র জন্তুর মত চিৎকার করে বলল রমনী, কিসের গামছা ওটা?

হ্যাঁ গো—সত্যি কথা বললে, তুমি কি আর বিশ্বাস করবে আমাকে, করুণ আর ক্লান্ত গলায় বলল মুনি, তোমাকে আরও কাছে পাবো বলে, তুমি আমাকে আরও বেশি করে ভালবাসবে বলে মা মন্ত্রপূত ওই গামছা রেখেছিলেন তোমার বিছানার নিচে—

সুপারস্টিশাচ্—ব্রুট—তীক্ষ্ণ অস্ফুটস্বরে যেন নিজের মনেই বলল রমনীবল্লভ—আরে তুমি ভাল ব্যবহার করলেই অটোমেটিক ভাল ব্যবহার করবো—ব্যবহারটা রেসিপ্রোক্যাল।

শোনো—তোমাকে আমি একটা ভালো কথা বলছি—বেশ শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল রমনীবল্লভ, এরপর তোমরা কোন উদ্দেশ্যে যে আমাকে বিষ দেবে না—তার গ্যারান্টি কি?

কি বলছো তুমি : অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মুনি।

আমি স্টুডেন্ট হোষ্টেলে থাকবো, যদি কোনদিন এবং কখনও তোমাদের স্বভাব পালটাতে পারো—তাহলে আসবো—বিচারকের রায়ের মত গম্ভীর ও কঠোর গলায় বলল রমনী।

তোমার পায়ে পড়ি গো—কান্না ভরা অস্পষ্ট গলায় বলল মুনি, আমাকে এতবড় আঘাত তুমি দিও না—আমি শপথ করে বলছি—আমি মার কোন কথা শুনবো না—তুমি যেও না গো—বলতে বলতেই রমনীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল মুনি!

সেদিনও তো আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ করেছিলে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রমনীবল্লভ, তোমার এই প্রতিজ্ঞার মূল্য কি?

এইবার—শেষবারের মত আমার কথা শোনো, কান্না জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল মুনি, কোন মেয়ে কি এমন কোন কাজ করতে পারে—যাতে তার স্বামীর অকল্যাণ হয়? একটু থামল, আবার বলল, যা করেছি—যেটুকু করেছি তোমাকে কাছে—আরও কাছে পাবো বলে সেই আশায় করেছি বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মুনি।

তার কান্না থরোথরো মূর্তির দিকে তাকিয়ে রমনীর মায়া হলো।

অশিক্ষিত। মেয়েমানুষ। অনায়াসেই মার মদতে কুসংস্কারের খপ্পরে পড়ে যায়। আবার মনে হলো, এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়া মানে তো—এসকেপ—পালানো—অর্থাৎ ডাইনীবিদ্যার অজানা সেই রহস্যময় অন্ধকারের কাছে হেরে যাওয়া—ওকে কি (মুনি) কখনোই গুপ্তবিদ্যার সেই অন্ধকার নিগড় থেকে উদ্ধার করতে পারব না!

হয়েছে—হয়েছে—আর কাঁদতে হবে না—ওঠো, বলল রমনী। তুমি নাকে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করো—আর কখনও মার কাছে যাবে না—

যাবো না—যাবো না—আর কখনও যাবো না—এই তিনসত্যি, বলেই মাটিতে একহাত পরিমান জায়গায় নাকে খত দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুনি। চোখের জলে হাসির আলোয় মাটি লেপা তার মুখখানা অপরূপ হয়ে উঠল। কিন্তু—

রমনী যেই টিউশানিতে বেরিয়ে গেল, অমনি মুনি এক দুর্নিবার নেশায় ছুটল মার কাছে। সব বৃত্তান্ত বলল।

সব শুনে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল নগনন্দিনী, কী তোকে রেখে দিয়ে হোষ্টেলে চলে যেতে চায়? আর কোন কথা বলল না সে। মুনির পাঁচ পাঁচটা ছেলেমেয়ে হওয়ার পরও তার মনে হলো, খুব বেশি শিক্ষিত ছেলের হাতে ওকে দেওয়াটা ঠিক হয় নি! শিক্ষার গর্ব, বিদ্যার গর্ব ওকে প্রচণ্ড দেমাকী করে তুলেছে—ও (রমনীবল্লভ) আমার মেয়েকে দিয়ে নাকে খত দেওয়ায়?

কি ভাবছ মা?

কিছু না। একটু ভেবে আবার বলল, তুই আজ বাড়ি যা—

আমি একটু ভাবি—কী করতে পারি?

যেমন করে হোক—ওর (রমনীর) গর্ব চুরমার করে দিতে হবে—ভাবতে ভাবতেই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল—কাল কি বার রে?

শনিবার, মুনি বলল।

চারিদিকে সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে বলল নগনন্দিনী, তুই একটু গোরচনা নিয়ে আসবি ঠিক সন্ধের মুখে—

গোরচনা দিয়ে কী করবে মা?

তোমার অত কথা জানতে হবে না, ধমকে উঠলেন নগনন্দিনী।

পরদিন বেশ একটু রাত করেই টিউশানি থেকে বাড়ি ফিরল রমনীবল্লভ। মুনি তাড়াতাড়ি ছুটে যেয়ে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, কেন এত রাত

হলো গো?

ছেলেদের পরীক্ষা এসে গিয়েছে—কেউই আর ছাড়তে চায় না—একটু থেমে বলল, ফাঁকিবাজির যুগ পড়েছে—কেউ তো আর সারা বছর পড়ে না—

খেতে বসে অত্যন্ত প্রসন্ন কণ্ঠে বলল রমনী। একী করেছো মুনি—কপির তরকারি, ঝিঙে পোস্ত আবার পোস্তর বড়া—ঠিক যা—যা আমি ভালবাসি!

যে রকম পরিশ্রম করো, তার তুলনায় তো কিছুই খেতে দিতে পারি না—আবেগে মুনির গলা রুদ্ধ হয়ে এল। রমনীবল্লভ চোখদুটো তুলে তাকালো স্ত্রীর মুখের দিকে। কী লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে—কিন্তু—শাশুড়ীমাতা ঠাকুরানী যে কী অভিশাপের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বলল—মার কাছে যাও নি তো?

না—বেমালুম মিথ্যে বলল মুনি। তার বুকের ভেতরে ভয়ের ধুকুপুক। পারবে তো সে!

রাত্রেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। স্বামীর পাশে শয্যায় শুয়ে বলল মুনি—আমি আর মার কাছে যাচ্ছি না বাবা—

কোন কথা বলল না রমনীবল্লভ।

জানো—কী কুৎসিত আর কী সর্বনাশা এই বিদ্যা—প্রয়োগ না করতে পারা পর্যন্ত অস্থির লাগে—

তাহলে এই বিদ্যা আত্রাই নদীতে বিসর্জন দিয়ে আসাই ভাল—বলল রমনীবল্লভ।

তাই দিয়েছি গো—তাই দিয়েছি—তুমি খুশী তো। রমনীর বুকে মাথা ঘসতে ঘসতে বলল মুনি! হঠাৎ উঠে বসে বলল, আচ্ছা কয়দিন থেকে লক্ষ্য করছি তোমার বাঁ চোখটা কেমন লাল লাল—কাজল পরবে?

রমনীবল্লভ কিছু বলার আগেই মুনি মন্ত্র পড়তে শুরু করল—ও নমো মহাযক্ষিণী রমনীং মে বশমানয়ং স্বাহা……এই মন্ত্র বার বার বলতেবলতেই একটা টিনের কৌটো থেকে একটা মলমের মত বের করে রমনীর দুচোখে মাখিয়ে দিল।

এ কী!—এ তুমি কি করলে! আর্তনাদ করে উঠল রমণী। আমার চোখদুটো জ্বলে যাচ্ছে—জ্বলে যাচ্ছে—উঃ—

প্রতিবেশীরা ছুটে এল। তারা ডাক্তার নিয়ে এল।

কি দিয়েছিলেন কাজলে? ডাক্তার প্রশ্ন করল মুনিকে।

আমি ঠিক জানি না ডাক্তারবাবু, সরল এবং অকপটে বলল মণিদীপা, শুনেছি মার কাছে—প্যাচার হৃদপিণ্ড, ঘৃতকুমারীর পাতা ও গোরচনা দিয়ে

কাজল তৈরি করেছিলেন তিনি—

এই কাজলে কি হয়?

মা বলেছেন—এই কাজল যার চোখে মাখানো হয়—সে বশীভূত হয়—

শেম—শেম! সমবেত উপস্থিত জনতা ধিক্কার দিয়ে উঠল। সেই রাত্রেই কালীবাড়িতে পঞ্চায়েতের মিটিং বসল—মণিদীপা এবং তার মাকে ডাইনীবিদ্যার চর্চার জন্য সমাজবিরোধী এবং সুস্থ-সভ্য নাগরিক জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক সাব্যস্ত করে তাদের চুল কেটে মাথায় ঘোল ঢেলে নদীর ওপারে নির্বাসিত করে দেয়—

এসব পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু এখনও ডাইনী মুনি আর তার মা নগনন্দিনীর নাম শুনলে শিউরে ওঠে বালুরঘাটের লোক।

চব্বিশ

ডাইন বা ডাইনী শব্দটি ব্যবহৃত হয় অমোঘ অস্ত্রের মত।

খাসপুর থেকে যে রাস্তাটা লাল মেটে সাপের মত এঁকেবেঁকে দেবীপুর বিলপাড়া ছাড়িয়ে সোদপুর বসন্তহার দিয়ে চলে গিয়েছে সেই চোদ্দহাত কালীখ্যাত বোল্লায়, সেই রাস্তার দুধারে দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেত। যতদূর চোখ যায় দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সবুজের সমুদ্র! তার ভেতরে কোথাও কোথাও এক একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত। সেইসব গাছের নিচ দিয়ে দূরে বহুদূরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলে দেখা যাবে কাশীপুকুরের কি বদলপুরের ঝাপড়া গাছ দিয়ে ঘেরা শিবপুকুর বা বুড়াপুকুর সবুজ সমুদ্রের বুকে অনেকটা জায়গা জুড়ে নীলাভ স্যাঁতসেতে ছায়া ফেলেছে।

এই রাস্তা ধরে যেতে যেতে যেই আপনি নাগেশ্বরবাবুর বাগানবাড়ির কোণে আসবেন এবং বকুলগাছটার নিচে আসবেন তখুনি আপনাকে থমকে দাঁড়াতে হবে। হলপ করে বলতে পারি, আপনার নজরে পড়বেই—পড়বে—দূরে ভূতকুঁড়ির দিকে নিঃস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে কালো রঙের আভাস দিয়ে উঁচু ধানগাছগুলো বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে!

বলাবাহুল্য আপনি কৌতুহলী হবেন এবং এগিয়ে যাবেন। আর আপনার বিস্মিত চোখদুটোর দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে যাবে—বেশ কয়েকটা খটু (ধানক্ষেতের ভেতরে আল তুলে দিয়ে ভাগ করা এক একটি অংশ) জুড়ে যুবতী দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের মত নধর ধানগাছ মাথায় কালো ধানের শীষের ঐশ্বর্য নিয়ে বাতাসে ডাইনে বাঁয়ে দুলছে।

এমন সুন্দর আবাদ কার?

আপনি এ তল্লাটে নতুন। তাই এই প্রশ্ন করছেন। কিন্তু এই অঞ্চলের লোক কখনও জিজ্ঞাসা করে না—জমি কার—আবাদ কার? এখানকার একটা দশবছরের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেও বলে দেবে—কার আবার—মংলু বুড়ার!

মংলু বুড়া!

বিচিত্র মানুষ এই মংলু বুড়া! চার ফুট আটইঞ্চি মত লম্বা! পেটানো লোহার মত স্বাস্থ্যের গড়ন। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। গোলমুখে ছোট ছোট দুটো কুঞ্চিত চোখ। কখনো বুঝতে পারা যায় না, কোনদিকে তাকাচ্ছে মংলু বুড়া! মাথায় গামছার পাগড়ি। আর পরণে নেংটির মত করে পরা একফালি কাপড়!

এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আবাদী মংলু বুড়া! পাঁচ পাঁচটা ছেলেমেয়ে আর নাতিপুতি নিয়ে আখড়ার বকুলতলায় তার জমজমাট সংসার!

সেদিন মংলু বুড়া বকুলতলায় বসেই একটা হাঁক দিল—হাঁ রে মতলু, ধরমা, করমা—সু—রিন—তোমরা সব এদিক আসেন—

ছেলেরা সব গুটি গুটি এগিয়ে এল। মংলু গম্ভীর হয়ে বলল, বর্ষা পড়ি গেল—জমিত (জমিতে) তো হাল দিবা হোবে—

ছেলেরা কোন কথা বলল না।

ধরমা, তু যাবো উত্তর পাথারোত (ক্ষেতে); করমাতু যাবু ভূতকুঁড়ির পাথারোত, মতুল যাবু বদিহারের পাথারোত—একটু থামল মংলু। কে কোথায় চাষ করবে তার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তারপরেই মংলু চোখদুটো কুঞ্চিত করে—দূরে—বহুদূরে রোদজ্বলা ভূতকুঁরির জমির দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর আখড়ার বকুলতলার মাটি কিছুটা খাবলা দিয়ে তুলে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে দেখল, বাতাসের গতিকে কোনদিকে। একটু পরে আবার বলল, পৈছা (পশ্চিমা বাতাস) উঠিছে রে—বৃস্টি হোবে রে—

তু ইরকম—নিদান হাঁকিস না তো বাপ, বড়ছেলে মতলু বলল, উত্তরপাড়ার শিবু বোনোরা তোক ডাইন বলে।

ডাইন! হো হো করে হেসে উঠল মংলু বুড়া। হাসির রেশ টেনে টেনে আবার বলল, ঠিক কথা—হক কথা বলি—'ডাইন' হয়ে যায়? একটু থেমে বলল, পৈছা উঠলি যে দেওয়া (আকাশ) কালো মেঘে ঢেকে যায়—বিষ্টি আসে—ইসব উয়ারা জানে?

মংলু বুড়া ডাইন হোক কি না হোক; পরদিন ভোর হতে না হতে কিন্তু আকাশ ভেঙ্গে সত্যিই বৃষ্টি নামল।

উঃ ডাইন বুড়া যখন একবার বলিছে বিষ্টি হোবে তখন নির্ঘাত বিষ্টি তো হোবে—শিবু বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলল, ডাইন ছাড়া আর কে বলবে? বলেই নেচে নেচে ছড়া কাটল—

ডাইন আছে মংলু বুড়া।
কথা বলে কড়া কড়া॥
নিদান হাঁকে মংলু বুড়া।
তার হাতে মরার খাঁড়া॥

মংলুর দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। বন্য হিংসায় তার গোল মুখখানা শক্ত হয়ে অমানবিক হয়ে উঠল। ছেলেরা বলল, চল—চল বাপ—ঘরোত (ঘরে) চল, বলেই বাবাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে এল।

বৃষ্টি ধরে এলে ছেলেরা যে যার হাল নিয়ে জমিতে নামল। মংলু বুড়াও এল। হেঁকে বলল, তোরা দেখমেন রে—জমির মাটি হোবে মাখনের মত মিহি রে—

কয়েক মাস পর। যতদূর চোখ যায় মংলুর জমিতে সবুজ ধানগাছ বাতাসে মাথা দোলায়। ধানগাছগুলোকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মংলু বিড় বিড় করে বলে, হামাদের প্রত্যেকের ঘাম আর অক্ত আছে (রক্ত) তোদের দেহে —

সেদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল হঠাৎ।

কিন্তু তার আগে বলা দরকার—ধানগাছের গোছা যখন বেশ পুষ্ট হয় আর নওলী যুবতীর মত তর তর করে বড় হয়ে ওঠে এবং ধানের মঞ্জরীর ভারে নুয়ে পড়ে—সেই সময় চাষীরা রাত জেগে ক্ষেত পাহারা দেয়। কে যে কখন গরু, কি মোষ কিম্বা শুয়োর নামিয়ে দেবে আর ধান খেয়ে একেবারে তছনছ করে দেবে জমি। তখন জমির দিকে তাকিয়ে কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

প্রতিদিনের মত সেদিনও রাত গভীর হয়েছিল। দূরে—বহুদূরে—বসন্তাহারের পাথারে প্রেতলোকের সন্ধান দিয়ে এলমেলো আলেয়ার আলো এক একবার দপ করে জ্বলে উঠেই অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে! অতন্দ্র প্রহরীর মত মংলু বুড়া ভূতকুঁড়ির জমি পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, চারিদিকের তরল অন্ধকারে কতগুলো দলা দলা কালো ছায়া যেন নড়াচড়া করছে—মংলুর বুকের ভেতরে রক্তের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ল। নিশ্চয়ই শালা শিবুরা শুয়োর ছাড়ি দিছে—বলেই লাঠি নিয়ে ছুটে গেল মংলু—যা—যা শালা—ভাগ—বিকট আওয়াজ করে শুয়োর তাড়াতে লাগল সে। ঠিক—

সেই সময় দূরে একটা ছায়ামূর্তি—অন্ধকারে একবার দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। ওদিকে মংলু শুয়োরগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে বসতে না

বসতেই আবার কোথায় থেকে এল দুটো ষাঁড়। মস মস করে কচি ধানের গোছা খেতে শুরু করল। ধু-র-ধু-র যা—যা ভাগ—যা—লাঠি দিয়ে তাড়া করল মংলু। ষাঁড় দুটো পালালো!

এবার তার জমিতে এল কয়েকটা ছাগল। ছাগলের একটাকে লাঠি পেটা করল মংলু। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই রহস্যময় ছায়াদেহ অর্থাৎ শিবুর ছোটভাই বোনো লাফ দিয়ে এসে হিংস্র বাঘের মত এসে দাঁড়ালো মংলুর সামনে।

এ ডাইনি—ক্যান তু মোর (আমার) ছাগলেকে মারলু? উঃ তো তোমার জমিত যায়নি—?

আলবৎ—হামার জমির ধানেতে মুখ দিছে—

তুই শালা ডাইনি আছিস—মিছা কথা কছিস—

এই মুখ সামাল করে কথা বলবি। মংলু বুড়া গর্জন করে বলে উঠল। আমি তোর বাপের বয়সী।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এসে পড়ল মতলু, সুরেন, ধরমা, করমা। বাবাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে এল। বলল বাপ, তুই বুড়া হইছুস—ক্যান তুই ঝুট ঝামেলার ভিতরে যাস বাপ—কুনদিন তোকে খুন করে ফেলাবে!

পরদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ভোরে উঠেই মংলু দেখল একটা অদ্ভুত ব্যাপার—তার বড় ঘরের দরজার সামনে মাটিতে একটা ধানের ডোলের ছবি চকখড়ি দিয়ে আঁকা। তার চারিদিকে চারটি কড়ি। আর ডুলির সেই ছবির ঠিক মাঝখানে একটা ভাঙ্গা কুলোয় কিছু ধান এবং একটা মুড়ো ঝাঁটা—

কেউ নিশ্চয়—গুণমন্তর করিছে রে, আর্তনাদ করে উঠল মংলু।

ছুটে এল মতলু, এল ধরমা, করমা এবং সুরেন। মাথায় খুন চেপে গেল মতলুর। চিৎকার করে বলল, যি এই গুণমন্তর করিছে, হামরা তার মাথা লিবো—ও—কিন্তু—

সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেল। মংলুর ডোলের সব ধান পাতান পাতা হয়ে গেল এক রাত্রে। দুহাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল মংলু—যা সর্বনাশ হয়ি গেল মোর—বলেই সে ছুটল গ্রামের মাতব্বর যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে। তার পায়ে কেঁদে পড়ে বলল বাবু—দেখে যান আমার কী সব্বোনাশ হয়েছে—

যজ্ঞেশ্বর এল। উবু হয়ে বসে চকখড়ি দিয়ে আঁকা ডোলের ছবিটা

অনেকক্ষণ ধরে দেখে আস্তে আস্তে বলল, ডানদিক থেকে বাঁদিকে এঁকেছে ছবিটা—একটু থামল। আবার যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, ডানদিক অর্থাৎ উত্তরপাড়ার দিক থেকে কেউ আসতে পারে—একটু পরেই উঠে দাঁড়াল যজ্ঞেশ্বর। বলল, তোরা এক কাজ কর রাত পাহারা বসা। হাতে নাতে ধরতে চেষ্টা কর ডাইনকে—বলেই চলে গেল সে।

রাত্রি নেমেছে গভীর হয়ে। আকাশে তারার রোশনাই জ্বলছে না। লঘু বিচ্ছিন্ন মেঘ তাদের ওপর দিয়ে আবরণ টেনে দিয়েছে। হু হু করে বয়ে যাচ্ছে গরম বাতাস। দিনের প্রখর উত্তাপের রেশটা এখনও মিলিয়ে যায় নি। শেষরাত্রে বোধহয় বৃষ্টি বাদল কিছু হবে—বহু—বহুদূরের দিগন্তে মাঝে মাঝে চমকাচ্ছে বিদ্যুতের রক্তদীপ্তি! মংলুর বাড়ির চারিদিকে নিচ্ছেদ স্তব্ধতা।

সে রাত্রে কাউকেই দেখা গেল না! দেখতে পাওয়া গেল না পরের রাত্রে। বলাবাহুল্য নৈশপ্রহরা বা রাতপাহারা শিথিল হয়ে এল। মতলু নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, আর আসবি না যা হৈ চৈ করিছি—কিন্তু।

পরদিনই মংলু ঘুম থেকে উঠেই চিৎকার করে উঠল কে করিছে—কে করিছে—যে করিছে তার মুণ্ডু নিমু—কী ব্যাপার?

মংলুর ঘরের সামনে মাটিতে পোঁতা তিনটি ঝাঁটার কাঠি। তার সঙ্গে প্যাঁচানো রয়েছে তিনটি লম্বা চুল (মেয়েদের) আর তিনটি ঝাঁটার কাঠির সমান্তরালে সাজানো রয়েছে তিনটি পাতকাঠির ডগায় ঘুঁটে। অবিকল সেই রকম তিনটি ঘুঁটে গোয়াল ঘরের দেওয়ালে আটকানো।

এইবার মোর গরুর দুধ বন্ধ হবি রে বাপ—এমন সব্বনাশ আমার কে করল রে বাপ—

সত্যি—সত্যি মংলুর গরুর দুধ বন্ধ হয়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মংলু। গ্রামের মাতব্বর যজ্ঞেশ্বর এল—তার ওই এক কথা—তোমরা ডাইনী ধর—পরে সব ব্যবস্থা হবি—

শুরু হলো আবার বহু তোড়জোড় করে রাতপাহারা। কিন্তু কোনদিনই আর সন্দেহজনক কিছু দেখা যায় না। মংলুরা হতাশ হয়ে যায়। কিন্তু—সকলের চোখের আড়ালে থেকে তার এত বড় সর্বনাশ কে করছে!

এসে পড়ল অগ্রহায়ণ মাস। বাতাসে পাকা ধানের গন্ধ। মংলুর প্রতিটি জমিতে ধান উপচে পড়ছে। যতদূর চোখ যায়—মনে হয় যেন মাঠের পর মাঠ জুড়ে ভূমিলক্ষ্মী সোনার স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে।

শিবু বোনোদের চোখ টাটায়। বলে মংলু গুণমন্তর করি ধান গাড়িছে—ও বুড়া ডাইনি আছে—ওর জমিত ধান তো হবিই—

মংলুর কানে পড়ে এসব কথা। কিছু বলে না। ধান বোনার সময় থেকে ধান পাকা পর্যন্ত যে পরিশ্রম তার কোন মূল্য নেই? শুধু গুণমন্তর করলেই কি এমন ধান হয়! আশ্চর্য!

আর তার বাড়িতে যে দিনের পর দিন ডাইনের অত্যাচার চলছে—তার ডোলের সব ধান পাতান হয়ে গেল; বন্ধ হয়ে গেল গরুর দুধ!—কৈ এসব নিয়ে তো গ্রামের কেউ প্রতিবাদ করে না—

শিবুর ছেলেটার তেড়ে জ্বর এল। জ্বর আর কিছুতেই নামে না। শিবু গ্রামে রটিয়ে দিল, মংলুবুড়া গুণমন্তর করিছে—তাই মোর ছাওয়াল ভাল হচ্ছে না—

গ্রামের মাতব্বর যজ্ঞেশ্বরকে বলল শিবু সব বৃত্তান্ত। সে পঞ্চায়েতের সভা ডাকল বকুলতলায়। কিন্তু যেদিন সন্ধ্যায় বকুলতলায় পঞ্চায়েতের মজলিস বসবে তার আগের দিন রাত্রে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল—

সেদিনও গভীর রাত্রে প্রতিদিনের মত অতন্দ্রপ্রহরীর সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিচ্ছিল মংলু। সঙ্গে ছিল মতলু আর সুরেন—দুই জওয়ান ছেলে। মংলু বিড়বিড় করে বলল, কাল হামার বিচার হোবে—বিনা দোষে হামাক ডাইনি বলে সাজা পাবা হবি—একটু থেমে ঘন অন্ধকারের দিকে চোখ দুটো জ্বালিয়ে নিয়ে বলল, তার আগে হামার বাড়ির ডাইনীকে ধরবাই হোবে—বলতে বলতে মংলুর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

পাতলা অন্ধকারে এক টুকরো কালোছায়া তর তর করে এগিয়ে আসছে! হ্যাঁ—ঠিক থেমে গেল তার দরজার সামনে। মংলু, মতলু আর সুরেন—তিনজন—তিনদিক থেকে এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই রহস্যময় ছায়ামূর্তির ওপর! সে ককিয়ে মেয়েলী গলায় আর্তনাদ করে উঠল—উঃ—মা-গো—তার গলা টিপে ধরে তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল মংলু। তার হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলে রাখল ঘরের এক কোণে।

বকুলতায় পঞ্চায়েতের সভা বসল। সভায় যজ্ঞেশ্বর বলল, রাত দুটোর সময় মংলুকে মাঠে মাঠে ভূতের মত ঘুরতে দেখা যায়—এ ডাইনি আছে—

হামি মাঠ পাহারা দেই বাবু—কিরা কেটে (দিব্যি) বলবা পারি গুণমন্তরের আমি কিছু জানি না, বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল মংলু।

ডাইন—ডাইন! তুমি ডাইন আছো, গ্রামের লোকের সমবেত কোলাহলের ভেতরে ডুবে গেল মংলুর কণ্ঠস্বর।

তাই আমি বলছি। যজ্ঞেশ্বর গলা চড়িয়ে রায় দিল গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের মত হচ্ছে মংলু বুড়া এবং তার পরিবারকে একঘরে করা হোক—সে ডাইন আছে—

বেশ বাবু তোমার বিচার শেষ তো? বলল মংলু, এইবার মতলুকে—কি যেন ইঙ্গিত করল। মতলু বাড়ির ভেতর থেকে টানতে টানতে ছেঁচড়ে নিয়ে এল কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা একটা মেয়ে মানুষকে!

বাবু—গলা চড়িয়ে মংলু বলল, তুদিন আগে গুণমন্তর করে আমার এক ডোল ধান পাতান করি দিছে। হামার গরুর দুধ শুকায়ে দিছে—কাল আতোত (রাত্রি) হামরা হাতে নাতে ধরেছি—বাবু—এর বিচার কে করবে?

কে? কে? মেয়েমানুষটা কে!!! জনতা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। মংলুর বৌ এসে জোর করে তার ঘোমটা খুলল। আর পঞ্চায়েতের সভায় যেন বাজ পড়ল।

আর যজ্ঞেশ্বর, শিবু প্রমুখ সভার উদ্যোক্তারা যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে, একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। ডাইনী—

মংলু নয়।

শিবুর বুড়ি মা!

পঁচিশ

BLACK MAGIC IS NOT A THING OF PAST—ডাইনীবিদ্যা সুদূর অতীতের কিছু রহস্য নয়।

ওপরের ইংরেজী উদ্ধৃতিটি Witch Craft today গ্রন্থের লেখক পিটার হানিং-এর এবং আরও বলেছেন, পৃথিবীর সর্বত্রই আজও চলেছে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা ডাইনীবিদ্যার নিরবিচ্ছিন্ন অনুশীলন। আর অনিবার্য ভাবেই সর্বস্তরের নারী-পুরুষের সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে! কিন্তু—

ডাইনীবিদ্যার চর্চা করছে আজও কারা? স্বভাবতই এই প্রশ্নটি ঘনিয়ে আসে মনে। আর তা জানতে হলেই আবার সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যেতে হবে লণ্ডনে। এখানে এখনও পুরোদমে ব্ল্যাক ম্যাজিকের অনুশীলন করে চলেছে এক সুন্দরী তরুণী—

ম্যাগড্যালিন।

ম্যাগড্যালিন ছিলেন অ্যালিয়েস্টার ক্রাউলি নামে এক প্রবীন পুরোহিতের ঘনিষ্ঠ শিষ্যা।

ব্ল্যাক ম্যাজিকের পুরোহিত ক্রাউলি নিজেই স্বীকার করেছেন—তিনি ডাইনীবিদ্যার চর্চা করেছেন—Self Confessed priest of Black Magic.

ম্যাগডালিন অ্যালিয়েস্টারের প্রভাবে এসেছিল বহুদিন আগে। এবং পুরোপুরি তাকে ডাইনী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন!

এইবার বলা যেতে পারে, কেমন করে ম্যাগডালিন মানুষের অনিষ্টসাধন করতো—সেই বিশদ এবং বিচিত্র বৃত্তান্ত এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

প্রথমেই বলা দরকার, ম্যাগডালিন ছিলেন অসামান্য সুন্দরী এবং সুযৌবনা। তাই বলাবাহুল্য বেশ কয়েকজন প্রণয়ী জুটে গিয়েছিল। কিন্তু যে যুবকটির সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গিয়েছিল, সেই তরুণটিকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। জানা যায়, পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে সে নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। তার বিছানায় বালিশের নিচে পাওয়া গিয়েছিল একটা চিঠি—

আমার মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ম্যাগডালিন। তার রূপযৌবন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভালবেসেছিলাম পাগলের মত। কিন্তু পরে জানতে

পেরেছিলাম সে—

ডাইনী !

কিন্তু ম্যাগডালিনের অন্যান্য প্রেমিকরা এই চিঠি আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। কেউ জানতে পারল না কেন হতভাগ্য যুবকটিকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। আর—

যে-কোন কারণেই হোক ম্যাগডালিন ছিল অসাধারণ জনপ্রিয় এবং সুন্দরী ও উচ্চশিক্ষিতা। তাই পুলিশ তরুণটির সুইসাইড কেস নিয়ে কোন তদন্তই করল না। ধীরে ধীরে ম্যাগডালিনের ভাবী স্বামী, সেই সুদর্শন যুবকটির আত্মহত্যার কথা লণ্ডনের জনসাধারণের স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে গেল।

আর এক যুবক গিলবার্ট (ম্যাগডালিনের প্রেমিকদের একজন) ধীরে ধীরে ম্যাগডালিনের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কখনো ম্যাগডালিনের সুদৃশ্য কোয়ার্টারের বেডরুমে, আবার কখনো বা লণ্ডনের কোন অভিজাত হোটেলে তারা রাত্রিবাসও করতে লাগল। কিন্তু—

ছেলেটির ধৈর্যের বাঁধ ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে ম্যাগডালিনের কাছে তার যেতে ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে তার অভিভাবকদের অমতে বিয়ে করতে। একদিন খোলাখুলি বলল গিলবার্ট, আচ্ছা তুমি বিয়ে করছো না কেন বলো তো ?

কোন কথা বলল না ম্যাগডালিন।

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি দুটো শর্তে—প্রথমেই তোমার মার জন্য অন্য একটা বাড়ি ভাড়া করবে। সেখানে তিনি থাকবেন একা—

কেন ? বিস্ময়ে ছটফট করে উঠল গিলবার্টের চোখদুটো।

তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ম্যাগডালিন বলল, আমার আর একটা শর্ত শোনো—কখনো আমার কথার অবাধ্য হবে না—যখন যা করতে বলবো—তাই করবে—

বলো কি ? খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গিলবার্ট, তোমাকে এত ভালবাসি—আমি—

না না। আর কোন কথা নয়, হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করে ম্যাগডালিন বলল, সত্যিই তুমি তোমার কাজে প্রমাণ করবে—যে তুমি আমাকে ভালবাসো—

বিয়ে হলো।

শুরু হলো তাদের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু ম্যাগডালিনকে যত বেশি করে কাছে পেতে চায় গিলবার্ট ততই সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

গভীর হয়ে রাত্রি নেমেছে। নিষুতি হয়ে গিয়েছে লণ্ডনের রাজপথ।

সেদিন গিলবার্ট ম্যাগডালিনের প্রবল অনিচ্ছা এবং স্পষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও স্ত্রীকে বিবস্ত্র করল। ম্যাগডালিনের দীর্ঘ সুঠাম তনু, দৃঢ় কঠিন দুটো উন্নত স্তনভাণ্ড গিলবার্টের স্নায়ুকে মাতাল করে তুলল। কিন্তু—

আশ্চর্য! ম্যাগডালিন কেন যেন পাষাণের প্রতিমার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সুন্দরী যৌবনবতী নারীর নিরাবরণ দেহের দিকে তাকিয়ে কোন পুরুষ স্থির হয়ে থাকতে পারে?

পারল না গিলবার্টও। লোলুপ উল্লাসে ম্যাগডালিনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বাঘিনীর মত হিংস্র আক্রোশে চিৎকার করে উঠল দস্তুরমত সেণ্টপলস ক্যাথিড্রালের বর্ষীয়ান বিশপের পৌরহিত্যে বিয়ে করা স্ত্রী—

ম্যাগডালিন।

শুধু তাই নয়—গিলবার্টকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মেঝেতে! ডিভানের কোণায় লেগে গিলবার্টের কপাল কেটে দর দর করে রক্ত ঝরল। সেই রক্তে ভেসে গেল মেঝে! কিন্তু—

আশ্চর্য! কেন যেন এতটুকু বিচলিত হলো না ম্যাগডালিন। ছুটে পাশের ঘরে যেয়ে নিয়ে এল চিজেল (পবিত্র পাত্র)। সেই প্লেটে খানিকটা রক্ত নিয়ে নিল সে। আর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েই ছিল গিলবার্ট। অতএব তার শুক্র পেতেও অসুবিধা হলো না। পরদিন তার সঙ্গে বাদুড়ের এবং ব্যাঙের শুকনো রক্ত মিশিয়ে তৈরি করল মায়াশরবত। এবং সেই শরবত স্বামীকে খেতে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ম্যাগডালিন, তুমি এটা খেয়ে নাও—আমার ওপরে তোমার আকর্ষণ আরও বাড়বে—

তাই না কি? গিলবার্ট খুশি হয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল সেই শরবত। তার দুইদিন পরেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল সে। ব্ল্যাক ম্যাজিক টুডে গ্রন্থের—লেখক বলেছেন এই প্রসঙ্গে So that a man of brilliant education and talent became unfit for anything.

আর এক যুবক এল ম্যাগডালিনের জীবনে।

তৃতীয় প্রেমিক—লরেন্স। লরেন্সকেও বিয়ে করল সে। বছর দুইয়েক

পরে একটি পুত্রসন্তান হলো। ফুলের মত সুন্দর। দুইজনেই খুশি। কিন্তু একদিন—

ঘটে গেল একটা আশ্চর্য কাণ্ড। সেদিন রাত্রে তারা দুইজনেই ড্রিঙ্ক করেছিল। কেন যেন ম্যাগডালিন খুব বেশি মাত্রায় মদ খাইয়েছিল লরেন্সকে। আর রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু—

শেষ রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে সে দেখল—বাচ্চা বিছানায় নেই, নেই ম্যাগডালিনও। তাড়াতাড়ি টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো লরেন্স। পাশের ঘর থেকে অস্ফুট কথাবার্তার আওয়াজ কানে এল। সেই ঘরের কি-হোলের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য—

টেবিলের ওপরে জ্বলছে কালো একটা মোমবাতি। প্লেটে সামান্য রক্তের ভেতরে একটুকরো কালো পাঁউরুটি। (শয়তানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবদ্য)। আর তার সামনেই তারই শিশুপুত্রের শবদেহ। সেই শবদেহের ওপরে হাত রেখে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে ব্ল্যাকমাসের পুরোহিত এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। মন্ত্র বলা শেষ হলে তিনি ফিসফিস করে বললেন ম্যাগডালিনকে—তুমি এতটুকু বিচলিত হবে না—কাল সকালেই দেখবে লরেন্স তার বিছানায় মরে পড়ে রয়েছে !

কথাটা শুনেই থর থর করে কেঁপে উঠল লরেন্স ! তার দুই বছরের দাম্পত্য-জীবনের স্মৃতির ভেতরে বহুকষ্টে তুরপুণ চালিয়ে দিতেই মনে পড়ে গেল, ম্যাগডালিন অনেকদিন থেকেই পীড়াপীড়ি করছে—ফ্ল্যাটটা এবং ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট তার নামে করে দিতে। কিন্তু—

নেশার ঘোরে ঝাপসা হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। মাথার ভেতরটা টলমল করে উঠল। দুলতে লাগল তার বহুদিনের পরিচিত এবং প্রিয় ফ্ল্যাটটা। সাঁইত্রিশ বছরের জীবনের সুখ ও দুঃখের প্রতিটি ঘটনা তার চোখের সামনে যেন মিছিল করে চলে যেতে লাগল। খরযৌবনা ও অসামান্য সুন্দরী ম্যাগডালিনের রূপে মুগ্ধ হয়ে ভালবেসে বিয়ে করার অনেক পরে জানতে পেরেছিল, তার নববিবাহিত স্ত্রী সম্মোহন বিদ্যা বা বশীকরণ জানে ! হয়তো কেন নিশ্চয়ই বিষাক্ত ব্রাণ্ডির সঙ্গে কোন গাছের শিকড়বাকড় মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মিষ্টি ও তীব্র ঝাঁঝালো এবং বিচিত্র স্বাদের সেই মদ অনেকটা পরিমাণে খাওয়ার পরেই নেশার ঘোরে একেবারে ভুলে গিয়েছিল শেষ রাতের ছায়া-ছায়া অন্ধকার ঘরে কালো মোমবাতির ছায়া কাঁপা আলোয় টেবিলে শোয়ানো নিজের ঔরসজাত শিশুপুত্রের শবদেহের সেই রহস্যময় ও দুঃসহ দৃশ্যের কথা !

উইচক্রাফট টুডের লেখক এবং আধুনিককালের ডাইনীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ পিটার হ্যানিং উচ্চশিক্ষিতা ও সুন্দরী যুবতী ম্যাগডালিনের আরও বহু কুকীর্তির বিবরণ দিয়েছেন। বলাবাহুল্য সেসব এখানে অবান্তর। কেননা, একদা ডার্ক কনটিনেণ্ট নামে পরিচিত সেই সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত রোডেশিয়ার ডাইনী (আধুনিককালের) থেকে শুরু করে প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, শিল্প আর বাণিজ্যে উন্নত বড় বড় শহর লণ্ডন, প্যারিস বার্লিনের শহরতলী এবং আরও অনেক জায়গার অনিষ্টকারী ভয়াবহ ডাইনী বা ব্ল্যাক উইচদের বীভৎস ক্রিয়াপ্রকরণের কথা বলা হয়েছে যেমন, তেমনি বলা হয়েছে আদিকালের বৃটেনের ড্রুইড সম্প্রদায়ভুক্ত, মেজরকার হোয়াইট এবং ব্ল্যাক দুই শ্রেণীরই ডাইনীদের কথা। এবং সুদূর স্কটল্যাণ্ডের কোন প্রাচীন শহরের উইচক্রাফট মিউজিয়ামের কিউরেটার এবং নৃতত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিত ডক্টর গার্ডেনার যে আধুনিককালের ডাইনীদের কলাকৌশল বা ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং গভীর রাত্রে ডাইনীদের ধর্মীয় সমাবেশে বা স্যাবেথে সমান সংখ্যক বা জোড়া জোড়া স্ত্রীপুরুষের উপস্থিতির নিয়ম চালু করেছিলেন—এই তথ্যটিও ডাইনী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তবে বলা দরকার—নিশিরাতের 'স্যাবেথে' জোড়া-জোড়া মেয়েপুরুষে (তারা স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা বাগদত্তা—বা যাই হোক না কেন) থাকার ক্রিয়ানুষ্ঠান চালু করে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন গার্ডেনার! কেননা তিনি তার একটি বক্তৃতায় প্রকাশ্যে ঘোষনা করেছিলেন স্যাবেথে জোড়া জোড়া মেয়েপুরুষ থাকলে আর কিছু না হোক—কিছুটা আনন্দ তো পায় তথাকথিত ডাইনীরা! বলাবাহুল্য—

আধুনিককালের ডাইনীবিদ্যা বা উইচক্রাফটের রূপকার ডক্টর গার্ডেনার অসামান্য জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

লণ্ডনের সুন্দরী তরুণী ম্যাগডালিন প্রসঙ্গেই গার্ডেনারের কথা বলতে হলো—তার কারণ—

ম্যাগডালিন ছিলেন লণ্ডনের বি. বি. সির ব্রডকাস্টার। তাই বলে হোয়াইট উইচ নেই?

একালেও আছে হোয়াইট উইচ—শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কল্যাণময়ী ডাইনী!

ছাব্বিশ

আমি ডাইনী নই—

—ডক্টর ক্যাথারিণ অ্যানে পোর্টার

জ্বালাও আলো!
উজ্জ্বল করে তোলো তাকে
দেখবে তার রঙ লাল।
তোমারই কামনার রঙ

এই কথাগুলো সে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে চিৎকার করে বলেই আগুন জ্বালে। তার ভেতরে কিসের যেন একটুকরো শিকড় ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। সেই লেলিহান আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে তার চোখেমুখে হিংস্র একটা হাসির আভাস ফুটে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলে, দেখুন—দেখুন আগুন নয়। আপনাদেরই মনের কুৎসিত এবং সর্বনাশা কামনাবাসনাগুলো আগুনের শিখার রূপ নিয়ে লকলক করছে—হা-হা-হা—তার প্রচণ্ড অট্টহাসি চারিদিকের বিস্মিত জনতাকে সচকিত করে দিয়ে বয়ে যায় লহরে লহরে।

হাসির রেশ কমিয়ে নিজেকে সংযত ও শান্ত করে আস্তে আস্তে বলল, দেখুন যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ভেলকি বা ইভিলস্পিরিট মুড, ভূত পেত্নী এসব কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না—

কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে—আছে একটা মহাজাগতিক শক্তি বা নিউক্লিয়ার এনারজি কিম্বা পাওয়ার যাই বলুন, আপনারা—

সমবেত শ্রোতারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তাদের চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়ে। একটা কথা বলে না।

বলতে পারে না। ভাবে, এই সুন্দরী তরুণী, দস্তুরমত উগ্র আধুনিকা আবার কেমন ডাইনী রে বাবা! শ্রোতাদের ভেতরে কেউ কেউ সঙ্গীদের বলেই ফেলে—এই চল—চল রে—এখুনি হয়তো সারা আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ দেখা দেবে—একটু একটু করে রাস্তার ওপরে শ্রোতাদের জমজমাট ভীড় পাতলা হতে থাকে—

কেউ কেউ আবার মধু খাওয়া মৌমাছির মত ঝিম করে দাঁড়িয়ে থাকে আর কেমন অপলক চোখে ভাটিয়ালী গানের সুরের মত দীর্ঘ তন্বী সুন্দরী সেই ডাইনীর দিকে তাকিয়ে থাকে!

শ্রোতাদের ভেতরে ছেলেছোকরাদের পক্ষে এই দৃষ্টি খুব অস্বাভাবিক নয়। কেন?

তাহলেই অনেক—অনেকগুলো শতাব্দী পেরিয়ে চলে যেতে হবে—চলে যেতে হবে—সেই মেজরকার ড্রুইড সম্প্রদায়ের ডাইনী, ডেভিডের স্ত্রী অ্যানিটার প্রসঙ্গে। নিশ্চয়ই বলা প্রয়োজন, সে প্রসঙ্গ অবান্তর। কিন্তু—

ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস এবং স্ত্রী ডেনমার্কের রাজকন্যার প্রসঙ্গটি কিন্তু হয়তো দূর আকাশে ঘন কালো মেঘের দুঃস্বপ্নের মত অবাস্তব কুয়াশা নয়। তার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে হলে চলে যেতে হবে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানে। বোধ করি, বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—এই বিষয়টি বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু নয়। ষোড়শ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার উইলিয়ম সেক্সপীয়রের প্রতিটি নাটকের শুরুতে আছে—দূরে আকাশের প্রান্তে ঘন কালো ঝড়ো মেঘের দিকে তাকিয়ে চুল এলো করে ডাইনীদের উন্মত্ত নৃত্য।

এখন বলা দরকার নিউইয়র্কের রাজপথে সত্যি—সত্যি আগুন জ্বালিয়ে বা প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশান দিয়ে বক্তৃতারত ডাইনীর আসল নাম—

একেবারেই বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি নিউইয়র্ক ইউনিভারসিটির উইচক্র্যাফটের ডক্টরেট নাম বলা সম্ভব না হলেও যেমন খুশি একটা নাম (যে কোন উন্নত দেশ) কল্পনা করা যেতে পারে—কারণ, প্রাচীন পৃথিবীতে উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে এক গোলার্দ্ধ থেকে আর এক গোলার্দ্ধে অবিরাম প্রবাহিত হয়ে যেতে নরবংশের স্রোত। আর ইংরেজরা যে বহুযুগ আগে আমেরিকায় বসতি করেছিল—এই তথ্যটি তো কারোই আজ আর অজানা নয়! কিন্তু—

নিশ্চয়ই বলা দরকার—আধুনিকা ডাইনীর বক্তৃতার একেবারে শেষের কথাগুলো—

নো—নো—ইমপসিবল।

এখন নিশ্চয়ই বলা প্রয়োজন—

মধ্যযুগে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে ডাইনীদের বীভৎস ক্রিয়াপ্রকরণ এবং বাধাবন্ধনহীন যৌন অনাচারে ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিত ও খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের সক্রিয় সমর্থন। ঠিক তেমনি ভারতীয় ডাইনীদের সেই শ্মশানের অঙ্গার, পেচকের রক্ত ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে মানুষের অনিষ্টসাধনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে বেদের বহু পরে রচিত ব্রহ্মপুরাণে, সিদ্ধ নাগার্জুন কক্ষপুটে, ষট কর্মদীপিকায় এবং আরও প্রাচীন গ্রন্থে—এখানে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য—উইচক্রাফট অর্থাৎ ক্রাফট অফ দি ওয়াইজ অর্থাৎ জ্ঞানীগুণীদের কলাকৌশল।

———